KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title [illegible]	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৮/৭ ৪৮/৮ ৪৮/৯ ৪৮/১০ ৪৮/১১	Year of Publication : Nov 1987 Dec 1987 Jan 1988 Feb 1988 March 1988
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

জানুআরি ১৯৮৮

বিনয়কুমার সরকার জন্মেছিলেন 'এক অর্থে যথা-সময়ের পরে, আর অন্য এক অর্থে আগে।' "বিশ্বজ্ঞানী" এই মনীষীর জন্মশতবর্ষে প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড০ ভবতোষ দত্তের মূল্যায়ন □ ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অতিসাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রচিন্তা নিয়ে গৌরী আইয়ুবের অনুসন্ধিৎসু সন্দর্ভঃ "হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঃ রবীন্দ্রনাথের চোখে" □ কন্নাডা উপন্যাসের ইতিহাস, বিষয় এবং আঙ্গিক নিয়ে ড০ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষক বিবরণ □ সাম্প্রতিক কালে ভারতে শেকসপিয়ার-চর্চা নিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার দাশগুপ্তের চিন্তা-উদ্দীপক আলোচনা □ নোবেল বিজয়ী নির্বাসিত রুশ কবি যোশেফ ব্রডস্কির জীবন ও কাব্যভাবনা নিয়ে প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য □ শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লব ও বামপন্থী সাহিত্য সম্পর্কে একটি তর্কসাপেক্ষ অভিমত □ পিতাকে পণপ্রথার অসহনীয় দায় থেকে মুক্ত করতে ৭৪ বছর আগে এক বাঙালি কিশোরী আত্মঘাতিনী হয়। এই ঘটনায় সেদিন সারা বাঙলায় যে আলোড়ন উঠেছিল তার তথ্যভিত্তিক বর্ণনা □ জাতীয় নাট্যোৎসবের প্রতিবেদন।

মাসিক চতুরঙ্গ / জানুআরি ১৯৮৮ / পৌষ ১৩৯৪

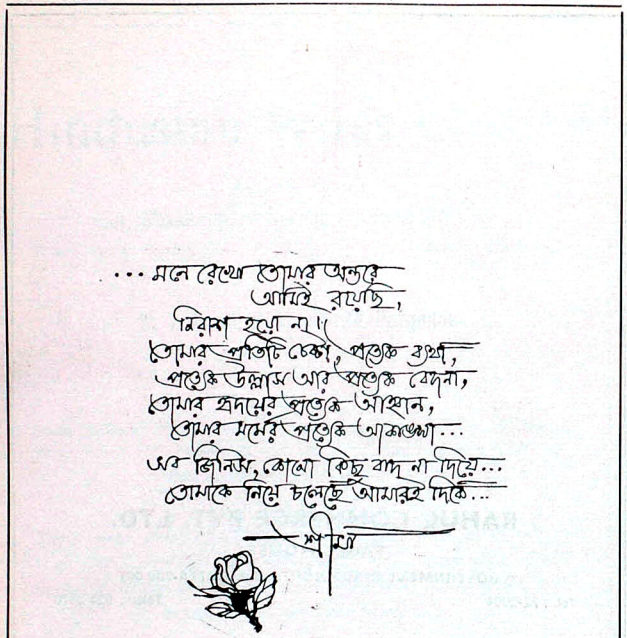

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৯
জানুআরি ১৯৮৮
পৌষ ১৩৯৪

বিনয়কুমার সরকার ১৯৮৭ ভবতোষ দত্ত ৭৫১
হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে গৌরী আইয়ুব ৭৭৭
কন্নাডা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৮০২

বিধ্বস্ত নগরীর স্তম্ভত্রয় লোকনাথ ভট্টাচার্য ৭৫৯

সাজ জুলফিকার মতিন ৭৬৪
তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৭৯১

গ্রন্থসমালোচনা ৮১৩
অরুণকুমার দাশগুপ্ত, আবদুর রউফ, জয়কৃষ্ণ কয়াল

সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ ৮৩৬
স্নেহলতার মৃত্যু : একটি আন্দোলনের জন্ম সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিতর্ক ৮৪২
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও বামপন্থী সাহিত্যচেতনা পুলকনারায়ণ ধর

বিশ্বসাহিত্য ৮৪৭
যোসেফ ব্রডস্কি অভিজিৎ করগুপ্ত

চিত্রকলা ৮৫৩
সময় ও সমকালের চিত্রকলা হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

59B CHOWRINGHEE ROAD, CALCUTTA
Phone : 43-3093

বিনয়কুমার সরকার ১৯৮৭

ভবতোষ দত্ত

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বুক ঠুকে বলতেন, 'আমি ১৯০৫'। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর ধ্যানধারণার উৎপত্তি। একদিকে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক উৎসাহী তরুণদল নানা বিষয় চর্চা করছেন এবং ভারতের সমস্যাবলী নতুন চোখে দেখবার চেষ্টা করছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের ছুটি খণ্ড বেরিয়েছে ১৯০২ এবং ১৯০৪-এ। তারও আগে, ১৯০১-এ প্রকাশিত হয়েছে দাদাভাই নওরোজির "পভার্টি অ্যানড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইনডিয়া"। এবং সে বছরেই লেখা হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক নাম নিয়ে উইলিয়াম ডিগবি-র "প্রসপারাস ব্রিটিশ ইনডিয়া"। ১৯০৪-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন দিগ্‌দর্শন উপস্থিত করেছেন "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে। ১৯০১ থেকে ১৯০৫ বিনয়কুমার প্রেসিডেনসি কলেজে প্রাক্‌স্নাতক ক্লাসের ছাত্র। কলেজে যা শিখছেন তার চেয়ে বেশি শিখছেন চারদিকে চোখ-কান খোলা রেখে। পড়েছেন অনেক, কিন্তু নিজের স্বাধীন মতও তৈরি হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগের মধ্যেও বস্তুনিষ্ঠা ছাড়েন নি। চারদিকে অনেক সমস্যা, সবই তাঁর কাছে জীবন্ত প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বি. এ. পাশ করেছেন ১৯০৫-এ, ইংরেজি আর ইতিহাসে 'ডাবল অনার্স' নিয়ে এবং সে বছরই এম. এ. ইতিহাসে। অর্থনীতি শিখেছেন নিজের চেষ্টায়।

১৯০৫-এ আঠারো-উনিশ বছর বয়স থেকে বাষট্টি বছর বয়সে ১৯৪৯-এ মৃত্যু পর্যন্ত লিখেছেন রাশি-রাশি—ইংরেজি, বাঙলা আর জারমানে। তাঁর সমস্ত বই আর প্রবন্ধের একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা প্রায় অসম্ভব—আর এখন তো তাঁর অধিকাংশ বই পাওয়াই যায় না। লেখার বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান সবই ছিল তাঁর পরিধির অন্তর্ভুক্ত। কখনো-কখনো উচ্ছল আবেগে কবিতাও লিখেছেন। হয়তো কবিস্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে একটা জোরালো সমাজচেতনা ছিল, যে সমাজচেতনা আরো দৃঢ়ভাবে দেখা দিয়েছিল তাঁর গদ্যরচনায়। একটা নিজস্ব ভাষাশৈলী আবিষ্কার করেছিলেন —বলেছিলেন লেখার ভাষাকে পুরোপুরি গুরুচণ্ডালী করে আনতে পারলেই তিনি নিজেকে সফল মনে করবেন। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের "ত্যাঁদড়ের দর্শন" নাম দেওয়া সে যুগে তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর সম্ভব ছিল জোর গলায় প্রতিবাদ। যখন সব ভারতীয় অর্থনীতিবিদ একযোগে চাইছেন বিদেশী কাপড়, চিনি, দেশলাই, ইস্পাতের উপরে চড়া হারে আমদানি শুল্ক বসিয়ে দেশীয় শিল্পের "সংরক্ষণ", তখন বিনয়কুমার প্রতিবাদ জানিয়েছেন ক্রেতার স্বার্থে।

এবং এই ক্রেতার স্বার্থেই তিনি ১৮-পেন্স বনাম ১৬-পেন্স বিতর্কে জোয়ারের বিপরীত দিকে গিয়ে টাকার দাম ১৮-পেন্স করার পক্ষে সবল যুক্তি দিয়েছিলেন।

বিনয়কুমার যেভাবে জারমান "ইতিহাসপন্থী" অর্থনীতির ভাবধারাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি ফ্রিড্‌রিশ্‌ লিস্‌ট্‌-এর নতুন শিল্পোদ্যোগকে সংরক্ষণ করার নীতি সমর্থন করবেন। কিন্তু করেন নি, যদিও লিস্‌টের বইয়ের একটি অংশ তিনি বাঙলায় অনুবাদও করেছিলেন। বড়ো শিল্পের উন্নয়ন তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু শিল্পপতিদের এবং তাঁদের পক্ষের অর্থনীতিবিদ্‌দের টাকার দাম ১৬ পেন্স করার বিরুদ্ধে তিনি খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছিলেন। আর বলেছিলেন যে ক্রেতার স্বার্থ অবহেলা করে শিল্পনীতি প্রণয়ন অসঙ্গত। ছয় দশক পরে বোঝা যায় যে, বিনয় সরকারের নিজস্ব যুক্তিতে কতটা দূরদৃষ্টি ছিল। তাৎক্ষণিক বা সাময়িক ভাবধারাতে ভেসে যেতে তিনি পারেন নি। আর যখন ভুল সিদ্ধান্তে এসেছেন, পরে সেটা সহজ মনে স্বীকার করেছেন। হিটলার আর ম্যুসোলিনির কর্মকুশলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল ত্রিশের দশকে, কিন্তু ফাশিস্‌ম্‌-এর স্বরূপ যখন দেখলেন তখন তাঁর ভুল অকপটে সংশোধন করেন। আর সর্বদাই তিনি সব প্রশ্নের সব দিক একসঙ্গে দেখতেন, তাই কখনো কখনো সমর্থন আর প্রতিবাদ একসঙ্গেই করেছেন। মার্কস দর্শন সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'বহুৎ আচ্ছা, চাই এসব—যেমন কুকুর তেমন মুগুর'। আবার দেখিয়েছেন 'অদ্বৈত-নিষ্ঠ আর্থিকতার ভুলচুক ও অসম্পূর্ণতা'।

আজ যদি বিনয়কুমার বেঁচে থাকতেন—তাঁর যৌবনের উদ্যম নিয়ে—তাহলে কি বলতেন "আমি ১৯৮৭"! আজকাল আমাদের উপরের তলার কারো-কারো কথা শুনে মনে হয় যে তাঁরা বলছেন "আমি ২০০১"। একবিংশ শতাব্দী এখনো কিছুটা দূরে আছে, কিন্তু ১৯৮৭-তে বিনয়কুমারের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর অর্থনৈতিক মতামতের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। অবশ্য, কোনো অতীত যুগের মনীষীকে যে বর্তমান যুগের চোখে প্রাসঙ্গিক হতেই হবে, তার কোনো অর্থ নেই। শ্রীচৈতন্য, বা এমন-কি প্রাক-আধুনিক যুগের রামকৃষ্ণ পরমহংস এখনকার সমাজের পটভূমিকায় কতটা প্রাসঙ্গিক? সহজেই বলা যায় যে এঁদের প্রদর্শিত পথ এখনো কাম্য, কিন্তু সে পথে তাঁরা যেসব বাধাবিঘ্ন দেখেছিলেন, এখন তার ব্যাপ্তি এবং জটিলতা বেড়েছে। এঁদের তুলনায় বিনয়কুমার আমাদের অনেক কাছাকাছি। আশি বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচলে (তাঁর দেহ ছিল বলিষ্ঠ) তিনি স্বাধীন ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর যুগ পর্যন্ত দেখে যেতেন। যেটুকু দেখেছিলেন সেটা সামান্যই। ১৯৪৯-এ ভারত স্বাধীন, কিন্তু খণ্ডিত। নতুন আশায় উজ্জীবিত, কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্তে হত্যাকাণ্ড ও শরণার্থীর জনারণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারত সম্বন্ধে বিনয়কুমার কী ভাবতে পারতেন এটাই হয়তো আলোচনা করতে পারা যায়, কী ভেবেছিলেন সেটা জানা যায় না।

আলোচনার ভিত্তি হবে তাঁর রচনা-সমগ্র। তাঁর বিরাট রচনারাশির অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য এবং এখন অল্প কিছু যা পাওয়া যাচ্ছে তাও আর কয়েক বছর পরে পাওয়া যাবে না। তবে একটা সুবিধা আছে। বিনয়কুমারের অর্থনীতি-সংক্রান্ত মতামত প্রায় পুরোপুরি বিধৃত আছে তাঁর "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" বইটিতে। ১৯৩২-এ প্রকাশিত এই বই-এর দুটি খণ্ডে প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠাতে সংকলিত আছে অজস্র প্রবন্ধ আর বক্তৃতার অনুলিপি। দু-একটি পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তিকাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে—যেমন "বাড়তির পথে বাঙ্গালী"। বইটির ভূমিকাতে তাঁর পূর্বতন অন্যান্য রচনারও একটি বিবরণ আছে—যাঁরা গ্রন্থপঞ্জী তৈরি করবেন তাঁদের কাজে লাগবে। অন্যতম প্রধান বই—"বর্তমান জগৎ", বা বারোখানা আলাদা বইয়ের যে সমষ্টিকে তিনি বলতেন "বর্তমান জগৎ গ্রন্থাবলী" তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না

(হয়তো কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে)। দুষ্প্রাপ্য হলেও দু-একটি কপি পাওয়া যায় তাঁর শিষ্যদের সংকলিত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" নামের দুই খণ্ডের কথোপকথন। এই বৈঠকের কালব্যাপ্তি অগস্ট ১৯৪২ থেকে মে ১৯৪৫। মৃত্যুর আগের বছর কটিতে তিনি নানা বিষয়ে কী ভাবতেন তার একটা মূল্যবান ছবি এ বইটিতে পাওয়া যায়। বিনয়কুমারের শতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে এই দুই-খণ্ড বইটির পুনরমুদ্রণ।

"নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" বইটিতে যেসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল তা থেকে কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে বিনয়কুমার কী মত পোষণ করতেন, সেটা জানা যায়। তাঁর মতে, আর্থিক উন্নতির প্রধান সোপান যন্ত্রশিল্পের প্রসার। আমাদের বর্তমানকালের পরিকল্পনাতেও শিল্পায়নের উপরেই জোর পড়েছে বেশি—কৃষি উন্নয়নে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল ততটা দেওয়া হয় নি। কুড়ির দশকের ভারতীয় অর্থনীতির আলোচনাতে বিদেশী মূলধন ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল প্রচণ্ড প্রতিবাদ। বিনয়কুমার জোর গলায় বিদেশী মূলধন আমদানি সমর্থন করতেন। বলতেন, শিল্পোন্নয়নই যদি কাম্য হয় তাহলে সেটাকে দ্রুততম এবং আধুনিকতম করা উচিত। স্বদেশী মূলধনে সেটা সম্ভব না হলে, বিদেশ থেকে মূলধন আনাই প্রয়োজন। বলেছিলেন—'ভারতের স্বদেশ-লেখকরা বলিতেছে—বিদেশী মূলধন আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। আমি জোরসে তার উল্টো বলিতেছি। আমি বলিতেছি, বিদেশী পুঁজি-ই সম্প্রতি আরও কিছুকাল ভারতের উন্নতির একমাত্র না হোক, একটা মস্ত বড় উপায়।' ষাট বছর পরে আমরা এখন দেখছি যে বিদেশী মূলধন পাবার জন্য আমরা কতটা ব্যগ্র। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিদেশী ঋণ নেওয়া হচ্ছে, তার সুদের এবং পরিশোধের কিস্তির কথা বিবেচনা করা হচ্ছে না। বিনয়কুমার যখন এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন তখন অবশ্য প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ খুব কম ছিল। আর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের দাপটও ছিল না।

তখনকার দিনে ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে ভালো আলোচনা ছিল না। দাদাভাই নওরোজি প্রমুখ কয়েকজনের দেওয়া বিচ্ছিন্ন হিসাবই গৃহীত হত। এবং বলা হত যে ভারতের দারিদ্র্য বাড়ছে। বিনয়কুমার বললেন, 'ভারতভূমি ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতর হইতেছে, কষ্টাৎ কষ্টতর গতা, একথা প্রমাণ করা বড় সোজা কথা নয়'। ইডেন হিন্দু হসটেলে ১৯২৬-এ প্রদত্ত বক্তৃতা "ত্যাদড়ের দর্শন"-এ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের অনেক পল্লী-শহরেই ফী বৎসর নতুন নতুন নিরেট বাড়ীঘর দু'চারখানা করিয়া মাথা তুলিতেছে। কাপড়চোপড়ের আকার-প্রকার সমাজ সুদ্ধ বাড়িয়া চলিয়াছে।...যদি দেখি আগে আমরা যতখানি চিঠি লেখালেখি করিতাম, যত লোক রেলে নৌকায় গরুর গাড়ীতে চড়িতাম, থিয়েটারে যাইতাম, এখন তার চেয়ে বেশি লোকে চিঠি লেখে, ট্রামে চড়ে, রেলে চড়ে, থিয়েটারে যায় তাহলে কি বলিব আমাদের আর্থিক অবস্থা অবনত হইয়াছে? আগে যেখানে পাঁচজন লোক জামা পরিত, এখন সেখানে যদি পঁচিশজন লোক জামা পরিতেছে, তাহলে কি বলিব আমাদের অবস্থা অবনত হইয়াছে? আগে যেখানে দুজন লোক চপ-কাটলেট খাইত এখন সেখানে দু শ লোক যদি চপ-কাটলেট খায়...তাহলে কি বলিব আর্থিক হিসাবে দেশ অবনত হইয়াছে?'

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি বিনয় সরকারের বক্তব্য প্রকাশের রীতির একটি সুন্দর উদাহরণ। তাঁর যুক্তিতে অনেক দুর্বলতা আছে, আর বিশেষত তখন আয়বণ্টন সম্বন্ধে কোনো পরিসংখ্যানই ছিল না। কিন্তু বিনয়কুমার যেমন এক দিক থেকে ভারতীয়দের আর্থিক উন্নতির লক্ষণ দেখেছিলেন, অন্যদিক থেকে এটাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমাজের নিম্নস্তরে আয়বৃদ্ধি যদি হয়ে থাকে তবে সেটা খুবই সামান্য। তাঁর দেওয়া উদাহরণগুলি শহর ও গ্রামের সম্পন্ন বা অন্তত মধ্যবিত্তদের বেলাতেই খাটে। আজকের দিনেও বিনয়কুমারের

বক্তব্য অপ্রমাণ করবার জন্য সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান আমাদের নেই। আর, যেদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত, সে দেশে দরিদ্রের সংখ্যাও বাড়ে। ১৯২১-এ যে আদমসুমারি হয়েছিল সে পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুব নীচু ছিল। যেটুকু তথ্য এখন আমাদের আছে বিনয়কুমারের যুগে তার একটা ছোটো ভগ্নাংশও পাওয়া যেত না।

সব কথাই জোর দিয়ে বলতে গেলে, অতিভাষণ সহজেই এসে যায়। যখন বিনয়কুমার বলেন 'নবীন বাংলার মেরুদণ্ড কারখানার মজুর', সেটা মেনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁর মতে যখন কেউ বলেন 'বাংলা দেশকে গড়িয়া তুলিবে চাষী, তাহলে বুঝিতে হইবে যে বক্তা একেবারে চরম নৈরাশ্যের দর্শনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন'। তিনি চেয়েছিলেন পল্লীতে-পল্লীতে ফ্যাকটরি, যেখানে চাষীরা এসে কাজে যোগ দেবে। 'ফ্যাক্টরি একসঙ্গে চাষীকে এবং মধ্যবিত্তকে রক্ষা করিবে।' একথার অন্তর্নিহিত অর্থ এখন আমরা অন্য ভাষায় প্রকাশ করি। বলি, শিল্পোন্নয়নের জন্যই কৃষি-উন্নয়ন প্রয়োজন, আবার কৃষি-উন্নয়নের জন্যও শিল্প-উন্নয়ন প্রয়োজন। সেই ১৯২৬-এ বলা কথাটা এখনো অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে—'ভারতের মজুর সমাজ যতদিন পর্যন্ত না গুনতিতে বাড়িয়া যায় আর কর্মগুণে মজবুত হয়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের পক্ষে আসল স্বরাজ আর ডেমোক্রেসি চাখা অসাধ্য সাধন। স্বদেশ-সেবকেরা, স্বরাজ-সাধকেরা মজুর-আন্দোলনটা পাকাইয়া তুলুন।'

"নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" বইটিতে দুইভাগে ভাগ করা একটি প্রবন্ধ ছিল, নাম "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা"। একথা এখন অনেকেরই মনে নেই যে বিনয়কুমার ১৯২৬-এ এঙ্গেলসের একটি বই অনুবাদ করেন, "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নাম দিয়ে, এবং ১৯২৭-এ মার্কস-জামাতা পল লাফার্গের বইও অনুবাদ করেন, "ধনদৌলতের রূপান্তর" নামে। মার্কসীয় ইতিহাসতত্ত্ব বিনয়কুমার আলোচনা করেছিলেন একটু এলোমেলো ভাবে, বহু অবান্তর কথার সংযোগে। স্বীকার করেছিলেন যে মার্কস, লাসাল এবং এঙ্গেলস প্রচলিত ধ্যানধারণার উপরে সন্দেহ জাগিয়েছেন, কিন্তু মার্কসবাদ তখন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। বরং এ বিষয়ে তাঁর মতবাদের অনেকটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে "বিনয় সরকারের বৈঠকে" বইটির প্রশ্নোত্তরের মধ্যে।

বৈঠকে প্রশ্নকারী ছিলেন শিবচন্দ্র দত্ত, হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন অনুরাগী শিষ্য। বিষয়-বস্তু ছিল বিচিত্র—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ব্রজেন শীল, অরবিন্দ, হীরালাল হালদার-হীরেন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর, ডন সোসাইটি ও ব্রহ্মবান্ধব, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-জসীম-উদিন। আর ছিল নানা অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিষয়। চল্লিশের দশকের অনেক অর্থনীতির প্রবন্ধকার বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে অভিমত ছড়িয়ে আছে—অতুল সুর, হীরেন মুখোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে তখনকার অতি তরুণ লেখক কস্তুরচাঁদ সালোয়ামি। পুরো তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে, তাই শুধু প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বিনয়কুমারের মত বার করে নিলেই অনেকটা বোঝা যাবে। আশ্চর্যের কথা যে, সময়টা যদিও ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের—পার্ল হারবার থেকে হিরোশিমা—তবু যুদ্ধের অর্থ নৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে কোনো বিশদ আলোচনা হয় নি, ১৯৪৩-এর বাঙলাদেশের মন্বন্তর নিয়ে আলোচনাও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মার্কস ও মার্কস-বাদী রচনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বারবার। "লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা" বা "মার্কিন কর্জ-ইজারা" কথাগুলি উঠেছে, কিন্তু এর গভীরে প্রবেশ ছিল না।

"আপনি কি মার্কসিস্ট" এই প্রশ্নের উত্তরে বলে-ছিলেন, 'আমি কোনো "ইস্ট" নই'। আর-একটি প্রশ্নের উত্তর ছিল, 'শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টান্ত সব সময়ে জুটানো কঠিন', এবং 'বুর্জোআ, মধ্যবিত্ত, ধনিক ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে কোনো লেখক-ই নিক্তির ওজন রাখতে পারেন নি—রক্ষা করা সহজ-ও নয়।' অথচ, এও বলছেন যে, সোস্যালিজম আর কম্যুনিজমের দিকে 'বাঙ্গালী মগজের অভিযান' একটা সুলক্ষণ—এবং 'এই নতুন লক্ষণের দাম ঢের।'

একদিন জানালেন যে, তখনকার সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতিতে গিয়ে দেখলেন, 'এই মজলিশের নয়া-পুরাণা, ছোঁড়া-বুড়ো, বা নবীন-প্রবীণ চাঁই বা কর্ম-কর্তাদের ভেতর হা-ভাতে হা-ঘরে কেউ নয়। সকলের ঘরেই হাঁড়ি চড়ে দস্তুরমতন। প্রত্যেকেই দুবেলা বেশ আঁচায় ঠিক যথাসময়ে। অনেকেই সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। কাজেই তথাকথিত প্রোলিটারিয়েটের আন্দোলন এটা নয়।...এই আন্দোলন হচ্ছে যুবক বাঙলার ভাবুকতাময় স্বদেশ-সেবকদের উন্নতিনিষ্ঠার অন্যতম সাক্ষী...এই আন্দোলন সর্বথা সমর্থনযোগ্য।' কথাগুলি এখনো প্রণিধান করে দেখার মতো। ১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে এই সমিতির অধিবেশনে তিনি যাঁদের দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'ভূপেন দত্ত, মৃণালকান্তি বসু, নীরেন রায়, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, দিলীপ বসু, রেণু চক্রবর্তী, বঙ্কিম মুখো-পাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন মুখো-পাধ্যায়।' হীরেন মুখোপাধ্যায়ের করা রুশ কমিউনিস্ট দলের ইতিহাসের অনুবাদ 'একটা জবরদস্ত লেখা।'

"কমিউনিজম বনাম সোস্যালিজম" সম্বন্ধে সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন 'সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার একমাত্র বা সর্বপ্রধান গৌরবজনক কাজ'। তার মতে তখন, অর্থাৎ ১৯৪৪-এ 'দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছে—সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও, এই ১৯৪৪ সনেও, কমিউনিজম নাই।' সোস্যালিজম আর কমিউনিজম সাধারণত একই বলে ধরে নেওয়া হয়, এই মন্তব্যের উত্তরে বলেন যে সেটা ভুল। 'জনসাধারণের সম্পত্তির উপরে গবর্মেন্ট মাত্রা-হিসাবে কম-বেশী শাসন বা একতিয়ার প্রতিষ্ঠা করলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়'—কিন্তু কমিউনিজম-এর জন্য চাই 'জনসাধারণের তরফ হতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ'। উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, ইংল্যানড, জারমানি ইত্যাদি দেশে—এবং এমন-কি তখনকার ভারতবর্ষে-ও—'ব্যক্তিগত ধনদৌলতের উপর সরকারী শাসন-একতিয়ার-নিয়ন্ত্রণ কিঞ্চিৎ কিছু আছে। কিন্তু বিলাতি-জার্মান, মার্কিন, ইতালিয়ান-জাপানী-ভারতীয় নরনারী স্বচ্ছন্দে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করে। জনসাধারণ নিজ-নিজ আয়ের মালিক। সেই আয় ছেলেমেয়েকে উত্তরাধিকারের আইনে দিয়ে যাবার অধিকার এই সকল দেশের লোকের আছে।'

অন্যদিকে 'সোভিয়েট রুশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, ব্যক্তিগত লাভ লোকসান নাই, ব্যক্তিগত জমি-জমা বা বাড়ীঘরের কেনাবেচা নাই। প্রত্যেক জমির টুকরা, বাড়ীঘর, কারখানা, ব্যাঙ্ক, স্টীমার, রেল, রুশ গবর্মেণ্টের' সম্পত্তি। কৃষি-বাণিজ্যের লাভ-লোকসান সবই সরকারী। একটু-আধটু "কিন্তু" আছে, তা ব্যতিরেক মাত্র। আসল কথা, 'সরকারী মালি-কানার ব্যবস্থা-ই সোভিয়েট রুশিয়ার গৌরবজনক আবিষ্কার।' সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি আর কমিউ-নিজমের মধ্যে এই পার্থক্য-প্রদর্শন এখনও প্রাসঙ্গিক। বিনয়কুমার বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন, ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রের নীতি গ্রহণ করেছে এবং সে পথে অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছে। "মিশ্র অর্থনীতি" নামটা চল্লিশের দশকে চালু হয় নি, কিন্তু বিনয়কুমার অনায়াসে এটাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সোস্যাল ডিমোক্র্যাসি যেসব দেশে এসেছে বা আসছে, সেখানে কম্যুনিজমকে দূরে রাখারই চেষ্টা চলে, বা অন্তত কম্যুনিজমের বিকল্প নীতি হয়ে দেখা দেয়।

এটা উল্লেখযোগ্য যে রুশদেশের "কমিউনিজম"-এর প্রশংসা করবার সময় বিনয়কুমার মার্কস-বাদের নাম করেন নি। বস্তুত মার্কসবাদ এবং মার্কসবাদী কর্মপন্থা সমার্থক না-ও হতে পারে। সাধারণ আর্থিক জীবনযাত্রায় মার্কসবাদী কর্মপন্থা

কী রূপ নেবে, সেটা বিনয়কুমার যেভাবে বুঝেছিলেন, আমরাও আজকাল সেভাবেই বুঝি। মার্কসীয় শ্রেণী-বিভাগ ছাড়াও বিভাজন জন্মায় ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি নানা কারণে। তা ছাড়া সোভিয়েত দেশ ও চীনের বিপ্লব মার্কস-কথিত ইতিহাসের ধারা অনুসারে হয় নি। আমরা এটাও দেখছি যে প্রথমে গৃহীত কর্মপন্থা থেকে অনেক কমিউনিসট দেশ সরে আসছে। সোভিয়েট দেশে সাম্প্রতিক কালে "গ্লাস্‌নস্‌ত্‌" আর "পেরেস্ত্রোইকা"-র (উন্মোচন আর পুনর্গঠন) কথা শোনা যাচ্ছে। চীনের আর্থিক নীতি পুনর্গঠন আর আধুনিকীকরণের নামে ধ্রুপদী মার্কসবাদ থেকে সরে আসছে। আর "ধ্রুপদী মার্কসবাদ" বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা নিয়েও বিতর্ক চলেছে—একদিকে "ইয়োরো-কমিউনিজম" আর অন্যদিকে "ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠী"। মার্কসের ইতিহাসব্যাখ্যা ষোল-আনা গ্রহণ না করেও যে মার্কস-প্রদর্শিত অর্থনৈতিক সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, এটা বিনয়কুমার বুঝে-ছিলেন। এখন আবার অনেকে বুঝছেন।

সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে বিনয়কুমারের অনেক মন্তব্য এখনো আমাদের ভাবিয়ে তুলতে পারে। আলামোহন দাশ, 'যাদবপুরী আলামোহনেরা', 'যাদবপুরী মেজাজ ও ধারা'—এ-সবের কথা বলেছেন উচ্ছ্বসিতভাবে। 'ফ্যাকটরির পর ফ্যাকটরি গড়ে উঠছে যাদবপুরীদের হাতে'। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয়তো উচিত, যে ১৯৪৩-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয় নি, ছিল ন্যাশন্যাল কাউনসিল অভ এডুকেশনের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষণালয়—যার নাম প্রথমে ছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুট এবং পরে কলেজ অভ ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি কিন্তু, এই উচ্ছ্বাসের পরেই বলছেন, 'অনেক বাঙালী কর্মবীর-ই পটল তুলবে।' আরো বলছেন, 'ইংরেজ ও মার্কিন কোম্পানী বাঙলাদেশ ও অ-বঙ্গ ভারত ছেয়ে ফেলবে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাদের সমঝোতা ও সহযোগ কিছু কিছু কায়েম হবে।' বাঙালির পশ্চাদপসরণের কারণ হিসাবে দেখিয়েছিলেন যে 'পুঁজিপাটার জোর বাঙালী শিল্প-বণিকদের হাতে বড় শীঘ্র দেখা দেবে না।' আবার এর পরে আশার বাণীও শুনিয়েছেন।

আশির দশকে এসে দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালি বড়ো শিল্পপতি আর কেউ প্রায় নেই—আর বাঙালি পরিচালিত মাঝারি ও ছোটো শিল্প দ্রুত গতিতে অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে, কিংবা রুগ্ন শিল্পের তালিকায় নাম লিখিয়ে ভরতুকির জোরে টিমটিম করে টিকে আছে। অথচ প্রত্যেক বড়ো প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন, অর্থ-ব্যবস্থা ও টেকনোলজির কাজে প্রধান স্থানে আছেন বাঙালিরা—শুধু কলকাতাতে নয়, বোম্বাইয়েও। বিনয়কুমারের বিশ্লেষণ এখনও প্রাসঙ্গিক, তার সঙ্গে বোধহয় যোগ দেওয়া যায় বাঙালিদের ঝুঁকি নেবার দিকে অনীহা। বিনয়কুমার বলেছিলেন, ব্যাবসা-বাণিজ্যে বাঙালি আর অবাঙালিদের সহযোগিতা 'আলবৎ চাই।' মন্বন্তরের বোঝা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বলছেন যে, বাঙালির দারিদ্র্য বাড়ছে এরকম বিশ্বাস করবার কারণ নেই, কিন্তু 'তা সত্ত্বেও বাঙালী জাত গরিব। বাঙালীর দারিদ্র্য অনেক দিন থাকবে।'

১৯৪৩-এর মন্বন্তর সম্বন্ধে বিনয়কুমারের বক্তব্য অনেকটাই আজকালও প্রযোজ্য। ভাব্যন্তের দিকে তাকিয়ে বলছেন যে দুর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক প্রাণহানিই শেষ নয়—অপুষ্টি ও ব্যাধির ফলে '১৯৫০-৬০ সনের ব্যাধি-মৃত্যুর বেশ বড় একটা হিস্যার জন্য দায়ী থাকবে আজকের দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক। মন্বন্তরের প্রভাব বহুকাল ধরে দেখা যাবে।' বিনয়কুমারের নিশ্চয়ই মনে ছিল যে বিখ্যাত ১৭৭০-এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কুড়ি বছর পরেও গ্রামে-গ্রামে কৃষিশ্রমিকের অভাব ছিল। আর ১৯৮৭-তে আমাদের বোঝা উচিত যে এবারকার উত্তর আর পশ্চিম ভারতের ব্যাপক খরার ফলে মৃত্যু খুব বেশি না হলেও অপুষ্টি ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রভাব বহু বছর ধরে অনুভূত হবে। এসব সত্ত্বেও বিনয়কুমার ছিলেন আশাবাদী—দুর্ভিক্ষের

দুঃখকষ্ট বাঙালি কাটিয়ে উঠবে। বাঙালি চলবে 'বাড়তির পথে।' আবার তিনিই বাঙালি-পরিচালিত শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই মনে করেছিলেন। যুক্তির সঙ্গে অনেকখানি আবেগ ও বিশ্বাসের সংযোজন তাঁর একটা বিশেষত্ব ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে 'লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা'-র কথা তুলেছিলেন। যেসব দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, 'লড়াইয়ে-মরা লোক আর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্পত্তি তাদের একমাত্র খরচা নয়। আরও লাখ লাখ কোটি কোটি লোক নিত্য নৈমিত্তিক "ঘরোআ" জীবনে কষ্ট পাচ্ছে।' আজকাল আমরা যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় ('রিয়েল কস্‌ট্‌) যে টাকার অঙ্কের বিপুল ব্যয়ের চেয়েও অনেক বেশি সমস্যাসঙ্কুল হয়, সেটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তিনি দেখে-ছিলেন ১৯৪৪-এই। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ইয়োরোপীয় দেশগুলির 'বহুর দশ পনেরো'-র বেশি লাগে নি, আর দুই দশক পরেই তারা 'চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য'। তাই থেকে বিনয়কুমার সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে 'বহুর দশ-পনেরো-বিশ যেতে-না-যেতেই [অর্থাৎ ১৯৬০-৬৫ নাগাদ] দুনিয়ায় পাঁয়তারা সুরু হবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের। সেই তৃতীয় কুরুক্ষেত্র হয়তো খোলাখুলিভাবে এখনো আরম্ভ হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের ঐতিহাসিক সম্ভবত বিনয়কুমারের মত সমর্থন করেই বলবেন যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, মধ্য-প্রাচ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আর যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যয় যে কত বিপুল হবে সেটা বিনয়কুমারের যুগে বোঝা না গেলেও, সমস্যাটা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। যে সমস্যা তাঁর কালের সে সমস্যা আমাদের কালেরও। কিন্তু সমস্যার ব্যাপ্তি এখন বিশালতর।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্য, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি সব-কিছুর পিছনে বিনয়কুমার দেখে-ছিলেন শুধু 'রংয়ের প্রভেদ' নয়—রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা-ও। জাপানকে পাশ্চাত্য দেশগুলি 'গুঁতোর চোটে বাবা' বলছে। ভারতবর্ষে ছিল 'ত্র্যহস্পর্শ'—'ভারতীয়েরা প্রথমতঃ গোলাম, দ্বিতীয়তঃ গরীব আর তৃতীয়তঃ বাদামী'—এবং এর মধ্যে 'রাষ্ট্রিক গোলামির প্রভাব-ই প্রবলতম'। মৃত্যুর আগে বিনয়কুমার দেশের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু নতুন ধরনের আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব দেখে যান নি। জাপান সম্বন্ধে তিনি যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন সেটা আজ ১৯৮৭-তে আরো জোরালো ভাবে করতে পারতেন—যদি দেখতেন যে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আসলে জিতেছে জাপান ও জার্মানি—নতুন উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পায়নে অন্য দেশকে পিছনে ফেলে চলেছে, ডলারের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে দৃঢ় পদক্ষেপে।

১৯৪৫-এ বিনয়কুমার স্বাধীন ভারতের জয়ের সম্ভাবনা দেখেন নি। বলেছিলেন 'ইংরেজের একতিয়ার সম্পত্তি ও ক্ষমতা আরও বেড়ে চলবে। কাগজে-কলমে হয়ত ভারতীয় নরনারী নতুন-নতুন রাষ্ট্রিক অধিকার পাবে। কিন্তু ইংরেজদের সত্যিকার ক্ষমতা বাড়বে ছাড়া কমবে না।' ১৯৪৭-এ অবশ্য ইংরেজের রাষ্ট্রিক অধিকার চলে গেল, কিন্তু 'ইংরেজের' বদলে 'বিদেশীর' বসালে বলা যায় যে তাদের 'একতিয়ার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা' এখনো প্রবল। তাঁর ১৯৪৫-এর সিদ্ধান্ত 'ভারতীয় নরনারীর স্বার্থ পুষ্ট করবার মতন গবর্মেণ্ট ভারতে কায়েম হওয়া অসম্ভব' এক অর্থে ভুল, কিন্তু একটা গভীরতর অর্থে এখনো প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা যেতে পারে।

যাঁর রচনাভাণ্ডার বিস্ময়করভাবে বিরাট, যাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারের পরিধি এনসাইক্লোপীডিয়ার সঙ্গে তুলনীয়, তাঁর মতামতের বহুক্ষেত্রেই আধুনিক কালে প্রযোজ্য অনেক মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায়, তাতেও তাঁর স্থান নীচে নামে না। মার্কস থেকে আরম্ভ করে বিগতযুগের যত মনীষী যত ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন তার অনেকটাই ইতিহাসের দ্রুত বিবর্তনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাঁদের

চিন্তাধারার সূত্রকে প্রসারিত করে অনেক দূর চলে আসা যায়। তাঁর কালের বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা নিয়েই একটা বড়ো গবেষণাপত্র লেখা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নজরুল প্রমুখ তরুণ কবিদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এখনো গ্রহণীয়—নজরুল 'মনুষ্যত্ব আর মানবিকতার কবি', প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কুমার-ছুতার-কামার'-এর, বুদ্ধদেব 'নিষ্ঠুর দেহ-নিষ্ঠার'। তখনকার দিনে কেউ ভারতেও পারত না যে অর্থনীতির প্রবীণ অধ্যাপক আবৃত্তি করছেন—'লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে / বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি তোমার সকাশে'। কিংবা 'পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু / মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল।'

বিনয়কুমার সম্বন্ধে চিন্তা করতে গেলে মনে হয় তিনি এক অর্থে যথা-সময়ের পরে জন্মেছিলেন। আর অন্য এক অর্থে আগে জন্মেছিলেন। আঠারো শতকে জন্মালে তিনি হতেন এককভাবে ফরাসি অর্থে "বিশ্বজ্ঞানী"। কুড়ির শতকের দ্বিতীয় পাদে জন্মালে, এখন তাঁর বয়স হত পঞ্চাশ-ষাট। শিল্পক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি দেখলে, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কৃতিত্ব দেখলে, সারা পৃথিবীতে ভারতীয় পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক আর প্রযুক্তিবিদের জয়যাত্রা দেখলে তিনি আনন্দে উচ্ছল হতেন। কিন্তু সহজেই কল্পনা করা যায়, তাঁর মনে কী ভাবের উদয় হত যখন দেখতেন শিল্পের উন্নতি সত্ত্বেও আমরা প্রধানত কৃষিজীবী, অজস্র সেচ-প্রকল্প সত্ত্বেও আমাদের কৃষি এখনো বর্ষণ-নির্ভর, আমাদের প্রযুক্তিবিদ্‌দের বাইরে চালান করে আমরা বিদেশী প্রযুক্তি আনছি, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান-এর অগ্রগতি অব্যাহত করে রেখেছি, 'জেলায় জেলায় ব্যাঙ্কের' বদলে আমরা গ্রামে-গ্রামে ব্যাঙ্ক খুলবার পথে এগোচ্ছি, কিন্তু এখনো মহাজনি-প্রথার ক্ষেত্র ব্যাপক, আর দেশের আটাত্তর কোটি লোকের মধ্যে সাতাশ কোটি এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে! স্পষ্টবক্তা বিনয়কুমার আজ ১৯৮৭-তে দাঁড়িয়ে তাঁর অননুকরণীয় সহজ অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় কী বলতেন সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। তাঁর সমালোচনা হত তীব্র, কিন্তু উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পেতেন। সেই সম্ভাবনার উপরে জোর দিয়েই হয়তো বলতেন "আমি ১৯৮৭"।*

* এই প্রবন্ধের সমস্ত উদ্ধৃতি "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) দুই খণ্ড এবং "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (১৯৪৫) দুই খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। দুটি বইয়েই বিস্তারিত সূচীপত্র এবং বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট আছে।

বিনয়কুমার সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ড. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সন্দর্ভ "শত-বর্ষের আলোকে বিনয়কুমার সরকার : প্রসঙ্গ রাষ্ট্র-চিন্তা" আগামী ফেবরুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

বিধ্বস্ত নগরীর স্তম্ভত্রয়

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সবায়ের বল

এবার তো ফুরফুরে হাওয়ার গতি, শরতের আলোয়। বোঝা যা ছিল, রাত্রির, কাকলীর, স্বপ্নের-দুঃস্বপ্নের, পিছনে ফেলে আসা ঘরের অন্ধকারে তা ধূলি সঞ্চয় করবে।

আশার ভারও রাখিনি বুকে, দেখতে চাচ্ছি না প্রিয়ার চাউনি। আজ শুকনো পাতা হওয়ায় আনন্দ, তাকে শূন্যে তুলতে ফুঁই যথেষ্ট, ঝড়ের দরকার নেই।

দুধারের বৃষ্টিধৌত সারি-সারি গাছে আজ এক অন্য পরিধান, সোনালি পল্লবের, আগুনের শত-শত শিখা। তার চাপে শরীর নুইয়ে পড়ে কি না পড়ে, সে-চিন্তা গাছেরই থাক, আমার তা নয়। সে-শরীর আমার নয়। আমার শুকনো পাতা।

আর সম্পর্ক নেই কোনো সুরের বা বেসুরের সঙ্গে, সঙ্গীও কেউ নেই, এই গাছেরাও নয়। আমি চ'লে যাই, ওরা প'ড়ে থাকে। কী কথা বলব, বললেও তার কোনো অর্থ হবে কিনা, বা তখন কথোপকথনে মাততে চাইবে কিনা যারা রয়েছে কাছে-দূরে, হয়তো এখনো থাকবে পথের অনেকখানি ধ'রে, সেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এই পৃথিবীর দিকদিগন্ত, এখন আমার পা ফেলার তালে-তালে, মৃদু-মন্দ নিশ্বাসে-নিশ্বাসে, তেমন চিন্তাও আর নেই।

কারণ যারা আছে, পরেও কিছুকাল হয়তো থাকবে, আমার অস্তিত্বে তারা নেই। আমি যেন অন্য গ্রহের একটি নিমেষের ফুৎকার, অকারণে জুড়ে গেছি অদ্ভুতদর্শন কোন্ বিরাটবপু দৈত্যের হৃৎপিণ্ডে, যাকে চিনি না, জানি না, অন্তত আর কখনো চিনব না, জানব না।

অথবা দৈত্যই নাছোড়বান্দা হ'য়ে আঁকড়ে ধরেছে আমার গোড়ালি, আমি থামলে সে থামে, আমি চলি তো সেও চলে। আমি উড়েছি কি সেও উড়ল।

সে কী ভাবছে না-ভাবছে জানি না, আমি তার কথা ভাবছি না।

হঠাৎ যে তিতিবিরক্ত হব, ভুরু কুঁচকে তাকাব তার দিকে, ব'লে উঠব, আচ্ছা ঝামেলা তো, এ-কিম্ভূতকিমার নামটা কার, এ-চোখটা কোত্থেকে এল, না-না-না, সে-রকম সম্ভাবনা কিছুতে জাগবে না।

তবু হেন প্রশ্ন যে পেড়ে বসলাম, সেটাও এই ভারহীন হাওয়ার দাক্ষিণ্যে, আমার খামখেয়ালিতে—এই শরতের আলোয় সোনা হ'তে-হ'তে, দুলতে-দুলতে, খেলতে-খেলতে। যেন রবারের বল একটা, ইচ্ছা হল তো ছুঁড়ে দিলাম, লুফে নিলাম।

এমন আরো এক ছোঁড়ায়-লোফায় আবার একটু মাতব? শুধু একটুখানি?

"তুমি রইলে যেখানে আমি ছিলাম, ছিলাম না। যেখানে থাকব, থাকব না। তুমি রয়েছ আমার হওয়ায়, না-হওয়ায়।"

"যেয়ো না, যেয়ো না, আমি ছাড়া কোনো মন্দির নেই তোমার, নেই কোনো পথ, কোনো পথের শেষ।"

"তুমিই রাত্রি, তোমার নিশ্বাস সুরভি, তোমারই গর্ভের অন্ধকার আমার ঘর।"

কে বলেছিল এসব কথা? কোন্ প্রিয়া? বা কারা দুজনে বলেছিল, একে-অন্যকে? সত্যিই বলেছিল কেউ?

দূর দূর! স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, ধূলির সঞ্চয়। আমি শুধু শরতের ঝকঝকে আলোয় রবারের বলটা ছুঁড়লাম, লুফলাম।

অচেনা নাক-চোখ, বিরাটবপু দৈত্য, সঙ্গী না হ'য়েও এই যে-দিগন্ত চিটে গুড় হ'য়ে লেপ্টে আছে গায়, এরা সবাই থাকুক যে যেমন রয়েছে, যতক্ষণ পারে।

উৎসব

খাপ খোলা হল, ছুরিকা তৈরী। শাণিত ফলা দ্যুতি ঠিকরালো অন্ধকারে, হল পক্ষিরাজ ঘোড়া। হুহুঃ-শব্দে ছুটল শূন্যের প্রান্তরে-প্রান্তরে, খুঁজতে বিদ্ধ করার একটি শুভ্র কোমল বুক। এক থোক আঙুরফলের মতো একটি নিটোল স্বপ্ন।

পথ যেহেতু পড়েছে পায়ে, এখন ছুটতেই হবে, গন্তব্যের মন্দির দেখা যাক বা না যাক, থাক বা না থাক। কিছুক্ষণ আগের সব গুঞ্জরণ পুঞ্জীভূত মেঘ হ'য়ে তার অভীপ্সাকে ঠেলতে থাকবে বিস্ফোরণের অনিবার্য মুহূর্তটির দিকে, তার অস্ত্র-যন্ত্র-মাংসপেশী হঠাৎ পরিণত বিদ্যুতের কারখানায়।

অগ্নি-পিণ্ড হ'য়ে ঐ নতুন নক্ষত্র জন্মাল।

সর্বনাশের ভক্তের দল তাদের নিজ-নিজ অন্ধ কুঠরি হ'তে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি নামছে রাস্তায়, এখন ঐ অশ্বকে, শাণিত ফলার ছুরিকে, মদত দিচ্ছে উর্ধ্বপানে মুখ তুলে। চেঁচিয়ে বলছে তাকে, থামবে না, তুমি থামবে না।

মরুভূমির নির্জনে আজ কাতারে-কাতারে লোক, ধ্বনি উঠছে দিকে-দিগন্তে, চমৎকার, চমৎকার!

কোথায় লুকিয়ে ছিল এই বিপুল জনপদ, ফুলের সাজি হাতে ঋতুস্নাতা এত নারী। স্তনে-স্তনে এই উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, উচ্চকিত হাসির ঠোঁটে-ঠোঁটে প্রগলভা কিশোরীর বাহিনী। ভিড়ে বাদ নেই শিশুরাও, বুড়োরাও। যে যেমন পেরেছে, রঙিন বা মলিন, অঙ্গবস্ত্রে ভরিয়েছে দেহ।

উড়ে এসে জুড়ে বসেছে নগরী, উৎসবমুখরা। ছাদে-ছাদে চাঁদোয়া, ভুমে-ভুমে জ্বলন্ত রেখার বিরাট-বিরাট বৃত্ত।

চোখে খুনীর চাউনি কিন্তু সকলেরই, স্বর্গীয় সুষমার শিশুদেরও। প্রত্যাশা, একটা খুন হবে এইবার, মাটি ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটবে। এক নিমেষে আকাশ-পাতাল সেঁদোবে উত্তাল সাগরের গর্ভে, রাত্রির ফুৎকার নিবে যাবে একটি দিগন্তভেদী আর্তনাদে। হেন কল্পনা মাত্রেই কুমারী যেন তার যোনিতে পায় দয়িতের স্পর্শ। প্রদীপের সলতেয় আগুন ধরে।

শিহরণে খাড়া হয় প্রতিটি লোম, বয়স্কা কুব্জারও। নেড়া ঢিবিতে গজিয়ে ওঠে একের পর এক মহীরুহ, আহ্লাদে-আবেশে হাওয়ায়-হাওয়ায় এ-ওর গায়ে গড়াগড়ি খায়। আজ বন্দনায় সাড়া দিতে বাদ যাবে না কেউ।

নেই শুধু আঙুরফলের নিটোল গুচ্ছটিই, নেই এখনো। নেই ঘরের কোনায়, পথের বাঁকে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে। নেই আকাশে, নেই বাতাসে, বা ব্রহ্মাণ্ড হ'তে ব্রহ্মাণ্ডে, মুক্তা-খচিত নীহারিকা-পুঞ্জে।

কোথাও নেই সেই বিদ্ধ করার বুকটি।

অথবা সে ঠিকই আছে, কিন্তু সেও ছুটছে। ছুটছে এত জোরে, পক্ষিরাজের চেয়েও, যে যে-কোনো মুহূর্তেই সে থেকেও নেই। যে-কোনো মুহূর্তেই, এই দুয়ের দূরত্ব বেড়ে চলে।

আর এই উর্ধ্বে-অধে, উৎসবের মেয়াদও তাই বাড়ে, ডুমের বৃত্ত আরো অসংখ্য হয়। বহ্নির আঁচে আরো কুঁচকে যায় বুড়ার গাল, তামাটে হয় কুমারীর যোনি।

যে রয়েছে ডুকরে কেঁদে ওঠার, সে এখনো নিঃশব্দ। এখনো সর্বত্রই সাজানো উপচার স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত। নৈবেদ্যের থালিতে তণ্ডুলকণা, কুটীরদ্বারে আম্রপল্লব।

ছ'লেই চলেছে খুনের স্বপ্ন অনন্ত চোখে-চোখে। প্রদীপের সলতেয় সর্পিল শিখা।

কার শেষরক্ষা হবে, কেউ কি তা জানে?

খাপ খুলতেই ছুরিকা তৈরী। উৎসব।

কাষ্ঠপুত্তলী

অনেক অত্যাচারের অবসানে যখন আবার ফিরে এল নীলিমার রূপ, রুদ্রের রক্ত নয়ন মুছে গেল দেয়াল হ'তে, পা টিপে টিপে আমরাও হাজির হলাম ঘরে।

কিন্তু কোথায় সে? হাওয়া উঠল শন শন শান্ত সন্ধ্যায়, ন'ড়ে উঠল কোণে-কোণের ধুলো। আমাদের দৃষ্টি ছুটল মেঝে হ'তে বিছানায়, বইয়ের তাক হ'তে আলমারির আড়ালে, পরে জানালা পেরিয়ে দিগন্তে-দিগন্তে।

কোথায় সে?

ভেল্কিবাজির সেই হতভম্ব ক্ষণে আর কোনো সাড়া শুনল না কেউ, কিছুরই, শুধু সাপের শিসে-শিসে দমকা-দমকা হাওয়া বইল ছবিটাকে কাঁপিয়ে, পর্দাটাকে নাস্তানাবুদ ক'রে।

তবে কি আবার কোনো আসন্ন ঝড়েরই প্রকোপ?

হঠাৎ মনে হল, যেন বহু দূরে কেউ চ'লে যাচ্ছে, ত্বরিত গতিতে বড়-বড় পা ফেলে। গুল্মে ঐ বুঝি আটকে যায় তার কাপড়ের খুটো, হয়তো ছ'ড়েও যায় গোড়ালি, তবু সজোরে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। ঐ চলেছে।

যেন সত্যিই চলেছে কেউ।

লোকটা কি তবে ও-ই হবে? নাকি আমাদের চোখেরই ভুল, আসলে হাঁটছে না কেউই? এত দেখার আশা নিয়ে এসেছিলাম ব'লেই যেন মনে হচ্ছে দেখছি যখন কিছুই দেখছি না?

চাওয়া-চাওয়ি চলে এ-ঘরে তখন, ছুটো-চারটে-দশটা-বিশটা চোখে-চোখে, প্রশ্নের, সন্দেহের বিদ্যুৎ এ ওকে ছুঁড়ে দেয়। পরেই, যেন কিছুই হয় নি, আবার থমথম স্তব্ধতা, কনুইয়ে ধ'রে কনুই দাঁড়িয়ে থাকি ভদ্র সজ্জনের দল, একে-অন্যে তফাত-তফাত, কেউ কাউকে ছুঁই না।

নিরুদ্বেগ, নির্বিকার, কাষ্ঠপুত্তলী।

অন্ধকার নামতে থাকে। হাওয়া তো ছিলই, সাপের সেই শিস, এখন যেন তার সঙ্গে যোগ দেয় অদৃশ্যে ওত পেতে ব'সে থাকা কোন্ ফচকে পিশাচের ফিসফিসানি। শির-শির ক'রে ওঠে আমাদের গা।

এইভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাইরে, এই তো কিছু আগেই, সাত প্রহর ধ'রে, গ্রীষ্মের মায়াহীন সূর্যে ফাটল-ধরা মাটির মতো দগদগে চোয়াল-চিবুকে। বদ্ধ ঘর হ'তে ভেসে আসছিল ওর আর্তনাদ, কখনো কাকুতি-মিনতি, কখনো দুমদাম লাথি, কখনো যেন কোন্ ঝাড়লণ্ঠন চুরমার ক'রে ভাঙার শব্দ।

কখনো ওর সেই স্বর, কী অসহায় বালক সেই, কোন্ অনাথ: "দাও! দাও! দিতে যে হবেই তোমায়!"

অভাব-অনটনের আমরাও তো সমানই আত্মীয়, সুধার সরোবর সকলেই খুঁজছি, তাই ওর আস্ফালন শুনে ছুটে আসি, দাঁড়িয়ে পড়ি।

কী পেতে চেয়েছিল সে? কে ও? ওর সেই তুমিটাই বা কে? কথা বলছিল কার সঙ্গে? পরে গেলই বা কোথায়? কেন গেল? আমাদের এত নজর এড়িয়ে কোথা দিয়ে বেরোল সে?

আজ এই ঘনীভূত সন্ধ্যায় ঘর যখন আবার শান্ত, আর কিছু ভাঙছে-চুরছে না, হাওয়াই ব'য়ে চলে একরোখো গোঁয়ারের মতো। তার দম শীঘ্রই ফুরোবে।

আর আমরা এই ভদ্রসজ্জন, বা তাদের প্রশ্ন-সন্দেহের বিদ্যুৎ? অভাব-অনটনের প্রত্যাশিত অবসান? কই, কিছু যে চাই, কোনো প্রশ্ন যে ছিল, তা আমাদের দেখে বলুক তো কেউ।

কাষ্ঠপুত্তলী।

আমরাও বেরিয়ে গেলাম ব'লে, যে যার পথে।

সাজ

জুলফিকার মতিন

হরতালের দিন।

সকালেই উঠতে হল। উঠতে হয় অবশ্য রোজই। বাম-ডান, ওঠা-বসা,—ধনুষ্টংকারগ্রস্ত রোগীর মতো হাত-পা ছোঁড়া—এ সব তো নিত্যকার কাজ। মাথার মগজ কমিয়ে ফেলার জন্য এর চেয়ে নাকি আর কোনো বড়ো ওষুধ নেই। —তা ভালো! যে হারে লোকজনদেরকে মস্তকবিহীন করে ফেলা হচ্ছে, তার তুলনায় মগজবিহীন মাথা ঘাড়ের উপর থাকা তো সৌভাগ্যেরই বিষয়! তাই ওসব নিয়ে আজকাল আর চিন্তা করে না মকবুল। বরং চার আনা সের চাল, ছ আনা সের তেল,—শায়েস্তা খানের আমলের ঐতিহাসিক সুখ, কী আরাম!

চোখটা একটু টাটাচ্ছে। বরকন্দাজপুর থেকে আসতে হয়েছে তড়িঘড়ি করে। কী যে মুশকিল হচ্ছে দিন-দিন। আইন মানে না, কানুন মানে না। বেহেস্তেরও লোভ নেই, দোজখেরও ভয় নেই। লোকজনগুলো কেবল চেঁচায়। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, চিৎকার করে, সামরিক জান্তা নিপাত যাক। আহাম্মকেরা এটাও বোঝে না যে খালি হাতে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে লড়াই করা যায় না। তাই ব্যাটাদের একটু শিক্ষা দেয়া দরকার। আর সেজন্যই পুরো কোমপানির আসা।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শেষ রাত্রেই। অসম্ভব ভারি হয়েছিল তলপেটটা। কিডনিতে আবার একটু ইয়ে আছে কি না? পানি খাওয়া আর ঝেড়ে ফেলাতেই ও যন্ত্রের কাজ শেষ। তারপরে আর ঘুম আসে নি ঠিকমতো। মকবুল চেয়েছিল আরো একটু শুয়ে থাকতে। কিন্তু সম্ভব হল না। কারণ পুনর্বার সলিল-ক্রিয়ার জোর তাকিদ। যতক্ষণ পারছিল ঠেকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং উঠতেই হল।

চারদিকে সবাই ব্যস্ত। উরদি লাগানো—বেটন পরা—ম্যাগাজিন বুঝে নেয়া,—কাজ কি কম? এর মধ্যেই আবার ছোঁড়াটা চেঁচাচ্ছে,—আরে ও ভাই মালিক কাফুর, একটু গরম পানি পাওয়া যাবে না কোথাও?

নতুন রিক্রুট। অল্পদিন হল এসেছে। জলিল ওর নাম। ইনটারমিডিয়েট পাশ। যোগ্যতা ছিল কমিশন র‍্যাংকেই যাওয়ার। কিন্তু কেবল যোগ্যতা দিয়েই তো সব কাজ হয় না। তাই ও এখন সেপাই।

মকবুল দেখল ওর কানের পাশেই এই মহাবিপদ। ছোকরা চেঁচাচ্ছে তো চেঁচাচ্ছেই। সে তার চোখ দুটো রগড়াতে যেয়ে দেখে সেখানেও বিপদ। লক্ষ-লক্ষ সজারুর কাঁটা খচখচ করছে নির্বিবাদে। সুতরাং চোখ দুটো আধবোজা রেখেই সে জিজ্ঞেস করে,—মালিক কাফুর কে?

—কেউ না—ফিক করে হাসে ছোকরা।

—তবে ডাকছ কেন?

—এমনিই।

আসলেই মালিক কাফুর বলে এখানে কেউ নেই। ইতিহাসের এই নামটা ঘুম থেকে উঠেই ওর মনে পড়েছে। অন্যদিন হয়তো মনে আসে হালাকু খানের কিংবা সুলতান মাহমুদের। এইসব নামে কাউকে না কাউকে ডেকে ও আনন্দ পায়। ফউজি জীবনের সব কিছুতেই এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। ওর অবস্থা যেন অনেকটা রক্তকরবীর নন্দিনীর মতো।

ব্রহ্মচাঁদি জ্বলে যায় মকবুলের। সে তেতে ওঠে, —তা গরম পানি দিয়ে কী করবে?

—এই দাড়িটাড়ি কামাতাম আর কী। যা শীত পড়েছে,—খুবই নিরীহ শোনায় জলিলের কণ্ঠস্বর,—একটু পাকছাপ হয়ে সেজেগুজে যাওয়াই ভালো। কামান বন্দুক না হয় ওদের কাছে নাই থাকল, কিন্তু আল্লার রহমতে একটা ইট যদি ফিট করে বসে, তাহলেই তো গেছি। তখন কার দাফনকাফন কে যে করাবে, তার কি ঠিক আছে?

কথাটা মকবুলের কাছেও সঙ্গত শোনায়। সে বলে,—তাহলে বসে থেকে না চেঁচিয়ে হাতপা লাগাও। কাজটা আমিও সেরে ফেলি।

দাড়ি কামাতে-কামাতে জলিল বলে,—ক্ষৌরকার্য করেই তো এত দিন চালালাম। তা মকবুলভাই, বন্দুক-টন্দুক দাওড় করতে পারব তো?

কথার হেঁয়ালিটুকু ধরতে না পেরে মকবুল তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। জলিল পরিষ্কার করতে থাকে,—বলছিলাম কী, এই ফউজি আইন জারির হবার পরতো রাস্তায় ধরে ধরে লোকের চুল কাটতে-কাটতেই কর্ম কাবার। ভাগ্যিস নীচেরগুলো কামানোর অর্ডার হয় নি।

—হলে বুঝি খুশি হতে?

—তা হতাম বই কি?—চোখ টেপে জলিল,—চুল বড়ো রাখতে হয় বলে মেয়েদের ওটাও যে বড়ো রাখতে হবে, তার তো কোন নিয়ম নাই,—অর্ডার তো নরনারীনির্বিশেষেই হত।

—নাউজুবিল্লাহ!—তাল সামলাতে না পেরে মকবুল খচ করে কেটে ফেলল তার গালের খানিকটা!

কানের পাশে রেডিও চলছে গমগম করে। এখনই বক্তৃতা করবেন সমরকর্তা। তিনি আবার মাইনর নন মেজরও নন, একেবারেই আস্ত জেনারেল। ক্ষমতা দখল করেছেন অল্পদিন হল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন তিনি। কাল রাত্রেই হুকুম হয়েছে, সবাইকেই তা শুনতে হবে। যারা তৈরি হয়েছিল তারা একে-একে এসে ভিড় করছে আশেপাশে।

ডেটলের শিশি খুঁজে পাচ্ছিল না মকবুল। গালের রক্ত ইতিমধ্যেই চুইয়ে-চুইয়ে থুতনি পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। বাতাসের টানে আরম্ভ করেছে শুকাতেও। মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রকৃতির কিছু সাধারণ নিয়ম আছে। রক্তপড়া বন্ধ করা তার একটা। না-খাওয়া মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন হাড়হাড্ডি ছুঁড়ে দেয়া। সুতরাং সাবসিডি পেয়ে মকবুল খুশি,—কিন্তু ক্ষমতা দখল করেও সমরকর্তা অখুশি। তাই এত বক্তৃতা শোনানোর আয়োজন। অতএব কর্ণ-যন্ত্রের শ্রবণশক্তির পরীক্ষা করার জন্য মকবুল নতি উঁচিয়ে রেখে বাকি

কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যোগী হল।

সমরকর্তা বলে চলেছে,—ভাইসব, আজকে সকালে সূর্য উঠেছে। এ সূর্য প্রত্যেকদিনের মতো নয়। একটু ভিন্ন। অন্যদিনের সূর্যের চেয়েও আজকের সূর্যের রঙ লাল। টকটকে লাল। এ সূর্য আমাকে শিখিয়েছে দেশকে ভালোবাসতে। আমি দেশকে ভালোবাসি। দেশও আমাকে ভালোবাসে। আমি দেশের উন্নতির জন্য আমাদের দেহের প্রতি বিন্দু রক্ত এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে মেপে দিচ্ছি। আমি সব সাব ইনসপেকটরকে ইনসপেকটর করে দিয়েছি। এটা কি দেশের উন্নতি নয়? আমি সব ইউনিয়নকে প্রোমোশন দিয়ে জেলা বানিয়েছি। এটা কি দেশের উন্নতি নয়? দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে আমি সর্বক্ষণ ব্যস্ত আছি। ভাইসব, আমি এত ব্যস্ত থাকি যে, আমার ওই কাজ করবার পর্যন্ত কোনো সময় নেই।···

ছোকরা জলিলটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এত গুরুগম্ভীর বক্তৃতার মাঝে সে মকবুলের কানের কাছে ফিসফিস করে ফোড়ন কাটে,—ওজন্যই তো আমার কোনো ছেলেপুলে হয় না।

বিরক্তিভরে মকবুল তাকে থামাতে চায়। কিন্তু সেই শব্দ সমরকর্তার গলার চেঁচানোর আওয়াজের মাঝে ঢাকা পড়ে। কেননা তখন তিনি খুবই উত্তেজিত, বরং বলা যায়, খুবই অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েছেন। মকবুল শোনে,—ভাইসব, আমি সবাইকে সবকিছু দিয়ে দেব। সমস্ত দেশটাকেই আমি একটা গারমেনটস ফ্যাকটরিতে পরিণত করব। ভাইসব, আমি সমস্ত পতিদের উপপতি বানিয়ে ছাড়ব···

হঠাৎ করে বোধকরি সমরকর্তার খেয়াল হয় যে, তিনি কেবল অতীত আর ভবিষ্যতের কথাই বলছেন। বর্তমানকাল সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। তাই তিনি তাঁর গলার স্বর আরো চড়ালেন,—আমি ঘোষণা করছি, এই মুহূর্ত থেকে আপনারা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করপোরেশনের অধিবাসী হলেন। আমি আপনাদের নাম বদলিয়ে দিলাম। আপনাদের বাবার নাম বদলিয়ে দিলাম। অতএব যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদের···

মকবুলেরা ভেবেছিল সাংঘাতিক-সাংঘাতিক সব ব্যাপার ঘটতে থাকবে। রীতিমত কামান বন্দুক নিয়ে জনতা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবে। কার্যত তেমন কিছু দেখা গেল না। রাস্তায়-রাস্তায় কোথাও ইটপাটকেল, কোথাও গাছের গুড়ি টেনে নিয়ে এসে কিছু-কিছু ব্যারিকেড অবশ্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তা এমন কোনো শক্ত প্রতিবন্ধকতা নয়। গাড়ি-ঘোড়া তা চলছেই না। পথে লোকজনও নেই কোনো। কোথাও কোনো দোকানপাট খোলে নি। হরতালের ব্যাপারটি বেশ স্বতঃস্ফূর্তই বলতে হবে। মকবুল তো মাথা ভেবে শিরস্ত্রাণের উপরই হাত বুলাতে থাকল মহাচিন্তায়। সবকিছু যদি এত শান্তই থাকে—এতই নির্বিরোধী হয় তবে থামোকা ট্রাকের উপর চড়িয়ে বন্দুক বাগিয়ে ঘোরাঘুরি করানো কেন?

সঙ্গে পলিটিক্যাল এজেনট ছিল একজন। বকবক করছিল সে সর্বক্ষণ,—এসব ধর্মঘট-ফর্মঘট কিসসু হবে না। শীতের সকাল তো—যা ঠাণ্ডা। লোকজন বেরুল বলে। তখন দেখবেন দোকানপাট সব খুলে গেছে। আমাদের কেবল খেয়াল রাখতে হবে দুষ্কৃতি-কারীরা যেন কোনোভাবেই তাদের বাধা না দেয়। বাধা দিলে কিন্তু একদম গুলি—দু-চারটে না মরলে ব্যাটাদের শিক্ষা শেষ হবে না,—বলে এমন অঙ্গভঙ্গি করল যে গুলি বোধহয় তার হাত দিয়েই টারগেট হিট করেছে।

ট্রাক এগোচ্ছে। এ রাস্তা। ও রাস্তা। বেশ ধীরে। রাস্তার ধুলো হিমে লেপটে আছে। কেমন যেন বিধবা-বিধবা ভাব চতুর্দিকে। মকবুলের তার গ্রামের কথা মনে পড়ে। এ সময়েই ঘাসগুলো পাঁশুটে বিবর্ণ হলদেটে হয়ে যায়। ইঁদুরগুলো সুড়ং কাটতে থাকে ধানকাটা মাঠের ভিতর। ছেলেমেয়েরা উদোম গায়ে

হৈচৈ করে ফেরে। হাত ঢোকায় সেই গর্তে। মকবুল তার আঙুলটা দেখে। ডানহাতের অনামিকা। কী যে কামড়েছিল, কে জানে? কিন্তু তার দাঁতের ধার ক্ষতচিহ্ন এখনো রেখে গেছে যেখানে। ক্ষতচিহ্নের জায়গাটা সে শিরস্ত্রাণে চেপে ধরে। কনকনে ঠাণ্ডা একেবারে সারা শরীর প্রদক্ষিণ করে বুটজুতার সুখ-তলায় এসে ঠেকে। একটা সময় সে পাঁচটা আঙুলই চেপে ধরে। ঠাণ্ডা শিহরন আরো তীব্রতর হয়। হাত ছাড়িয়ে এদিক-ওদিক চায়। দেখে ছোকরা জলিলটা বেশ জমিয়ে বসেছে পলিটিক্যাল এজেনটের সাথে। বলছে,—স্যার, আরমির ভেতর আরো আরো অনেক ডিপার্টমেনট খোলা দরকার—

—কেন?—সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায় পলিটি-ক্যাল এজেনট।

—বুঝলেন না স্যার? এই যেমন ধরুন আজকে হরতাল। আমাদের কিন্তু আবার সবকিছু নরমাল দেখাতে হবে। আরমি ভ্যানটা চালিয়ে রাস্তাঘাটের ব্যাপারটা অবশ্য আমরাই নরমাল করে ফেলেছি। বাকি থাকছে দোকানপাট খোলা। ভেবে দেখুন স্যার,—যেন কত সিরিয়াসলি বলছে এই ভাব দেখিয়ে সে একেবারে পলিটিক্যাল এজেনটের নাকের উপর চলে আসে,—আজকে যদি আমাদের ভিতর এক ডিভিশন মাছ-বিক্রেতা, এক ডিভিশন পানের দোকানদার, এক ডিভিশন তরকারি-বিক্রেতা—মানে বাজারে যা-যা আছে তার সব কিছুর এক ডিভিশন থাকত, তাহলে সারা দেশটাকেই আমরা কত সহজে নরমাল করে ফেলতে পারতাম। কত সুন্দর ছবি আসত টেলিভিশনে।

পলিটিক্যাল এজেনট ভালোমন্দ জবাব দেবার আগেই ট্রাকটি ঘ্যাচ করে থেমে গেল অন্য একটি ফউজি ভ্যানের সামনে। সেখান থেকে তড়িঘড়ি করে নেমে এলেন অপারেশন কমানডার। তিনি বললেন, আমি একজন ম্যাজিসট্রেটকে তোমাদের সাথে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখনি রেলস্টেশনে চলে যাও। গাড়ি চালাতে হবে।

গাড়ি চালাতে বললেই তো আর চালানো যায় না। আর গুলিবন্দুক দিয়ে মানুষ মারা গেলেও এসব কাজ হয় না।

ওরা স্টেশনে এসে দেখে, জায়গাটা একেবারেই জনমানবশূন্য। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। মানুষ আর কুকুরের আত্মীয়তা বোধকরি খুব আদিম। না হলে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না কেন?

জলিল বলে,—ব্যাপার কী, মকবুল ভাই? স্টেশন মাসটার নাই, অ্যাসিসটানট স্টেশন মাসটার নাই। বুকিং ক্লার্ক নাই। সিগনালার পয়েনটসম্যান নাই। আরো আরো অপারেটিভ নন-অপারেটিভ সাহেবসুবা নাই। হরতালের দিন—শালাদের চাকরির ভয় নাই। মাগছাওয়ালের চিন্তা নাই।

মকবুলের বিড়ি সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস কোনোদিনই ছিল না। ভাবে, একটা খেলে দাঁতের কড়মড়ানি থামানো যেত। তাই কথার জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট চায় জলিলের কাছে।

—খাবেন?—অবাক হয়ে যায় জলিল।

—খাই না খাই, তোমার কাছে চেয়েছি। দেবে তো দাও—হাসতে যেয়ে কাটা গালের ওখানে টান পড়ে। মনে হয় ছড়ে গেল। আবার বুঝি রক্ত বেরোবে ফিনকি দিয়ে।

জলিলও ধরায়। খক খক করে ধোঁয়া বের করতে-করতে এবার মকবুল বলে,—কী বলছিলে? মাগ-ছাওয়াল?

জলিল বলে,—না, এখন আর বলি না।

—কেন?

—আমি ভেবে দেখলাম এক বেওয়া আর এক এতিম ছাড়া ওদের আর কিছু নাই।

এই ফক্কড় ছেলেটার প্রতি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড মমতা অনুভব করে মকবুল। যেখানে সেখানে যা-তা বলে। কেনোদিন না ফেঁসে যায়। সে গম্ভীর

হয়,—কোর্ট মার্শাল চেন?

—চিনি।

—তাহলে এসব বল কেন?

—বলি,—নিরুদ্বিগ্ন গলার স্বর। কর্মকোলাহল-হীন আজকের এই সকালের মতোই ভারহীন।

সকাল দশটা পর্যন্ত অবশ্য কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না। স্টেশন মাস্টারকে ধরে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল সেপাইদের। একদফা তারা ফিরেই এল। কারণ তিনি ছুটিতে। তাঁর বাড়িতে লেবার পেইন।

মকবুল ঠিক বুঝতে পারে নি জিনিসটা কী?

জলিলকে জিজ্ঞেস করতেই ফিক করে হেসে ফেলেছিল,—এই আর কী, বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণা!

বিপ্লব—বিদ্রোহ,—এইসব কথা উচ্চারণ করা তো দূরে থাক, শোনাও নিষেধ। মকবুল তাই আরেক দফা নিঃসহত করতে-করতে ফিরে আসে স্টেশনে। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে ছেলেটির প্রতি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুনেই তো আগুন—ব্যাটারা এখনো বুদ্ধিমান হতে পারল না!

তাই তো! গ্রামের সব চাষারা, ছিল বোকা, হয়ে গেল বুদ্ধিমান ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ট্যাবলেট খেয়ে-খেয়ে। আর এই শিক্ষিত মানুষটা,—সরকারের সমস্ত কর্মসূচীই বরবাদ। এর একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। সে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে,—

বয়স কত?

সামনে ছিল জলিল। প্রশ্ন বুঝতে না পেরে ঢোক গেলে,—আমার স্যার?

—না না—ছঙ্কার ছাড়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, —স্টেশন মাসটারের।

বয়স তো কেউ জিজ্ঞেস করে আসে নি। এ ওর মুখের দিকে চায়। শেষে একজন সাহস করে বলে, —চেহারা দেকতে ছার মনে হয় পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ।

—অ্যাঁ! এত বয়স? তাহলে তো আর দেরি করা ঠিক নয়। এই মুহূর্তেই ওকে ভ্যাসেকটমি করিয়ে দিতে হবে।

অতএব ধরে পার আর মেরে পার যেভাবেই হোক নিয়ে এসো।

ছুটিতে থেকেও কর্মস্থলে না আসা কিংবা ভ্যাসেকটমি না করা অপরাধ। কোন্‌টার জন্য, তা বুঝে উঠবার আগেই ধরে আনা হল স্টেশন মাসটারকে। তারপর একই প্রক্রিয়ায় ড্রাইভার হেলপার আরো অনেককেই। ইতিমধ্যে অপারেশন কমানডারও এসে হাজির। গাড়ির হুইশিল-টুইশিল না শুনতে পেয়ে সে খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। তার নিজের ধারণা সিভিলের লোকগুলো কোনো কাজের না। কেবল নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়। আর পরীক্ষা পাশ করে চাকরি নিয়ে কেবল নিজের নাম দস্তখত করে।

সে এসে পড়তেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো ফিউজ। বলে,—ব্যবস্থাট্যাবস্থা তো সব করেই দিয়েছি। আমি তবে এবার যাই।

অপারেশন কমানডার বলে,—আরে না না,— আপনারাই তো হলেন সত্যিকারের পাবলিক সারভেন্ট,—ওই যে বাঙলায় যাকে বলে জনগণের খাদেম। আমরা যত কিছুই করি, আপনাদের সই-ছাপ্পড় না হলে কি চলে?

ম্যাজিস্ট্রেট বোঝে বন্দুকটা তার ঘাড়েই থাকল। কিন্তু উপায় তো নেই।

ইতিমধ্যেই ইনজিনের সাথে কেবল একটা বগি জুড়ে দেয়া হয়েছে কোনোমতে। যাত্রী নেই—ট্রেন ছাড়ছে স্বাভাবিক নিয়মে (?)। অপারেশন কমানডার ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গিয়ে উঠল ইনজিনে। সেখানে ফিট করা হল আস্ত দুটো মেশিনগান। মকবুলরা গিয়ে পজিশন নিল বগিতে। জানালায়-জানালায় বাগিয়ে রাখল সারিসারি বন্দুকের নল। পথে যদি ধর্মঘটীদের দেখা পাওয়া যায়—তো তাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানাতে হবে বইকি! ট্রেন লাইনে কোথাও কোনো একসক্লোসিভ পোঁতা আছে কিনা তা নিয়েও অপারেশন চিন্তা করছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সে কথা

বলতেই সে বলে ওঠে,—আরে না না, ওসব চিন্তা করবেন না। ওরা তো করছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এখনো ওদের কথায় ও কর্মে কোনো গরমিল নাই।

কথা যে সত্যি তা অপারেশন কমানডারও জানে। নাহলে রাস্তাঘাটে-পানের দোকানে অগণিত জনগণের হাতে ওই সামান্য কয়টা ফউজ কিলচড় খেতে-খেতেই এতদিন ফউত হয়ে যেত।

একটা ইনজিনের সাথে একটা বগি। স্বাভাবিক ট্রেন চলাচলের দর্শনীয় চিত্র বটে! হুইশিল বাজানোর কাজটা অপারেশন কমানডার নিজেই করছিল,··· পু—উ—উ···। অর্থাৎ তোমরা দেখো ট্রেন চলছে,— কী চমৎকার স্বাভাবিক অবস্থা!

এই করতে-করতে দু-এক স্টেশন পার হয়ে আসতেই বাধল বিপত্তি। ট্রেন লাইনে উপর নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে ছাত্ররা। তিনি যতই পু—উ—উ বাজান, ছাত্ররা ততই নট নড়ন চড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গুলিবন্দুক নিয়ে গুলিবন্দুকের সাথে লড়াই করায় একটা দারুণ রকমের থ্রিল রয়েছে। কিন্তু নিরস্ত্র প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে সশস্ত্র শক্তির দম্ভকে উপহাস করার যে নিঃশব্দ স্পর্ধা, তারো গৌরব অতুলনীয়। সেই তুলনাহীন প্রতিরোধের সামনে দাঁড়িয়ে অপারেশন কমানডার একবার ভাবল, ওদের উপর দিয়েই ট্রেনটা চালিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুদিন আগেই মিছিলের উপর ট্রাক তুলে দেবার জন্য তাদের বহুত নাকখত দিতে হয়েছে। গোয়েবলসীয় প্রচার-অভিযানও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। এমতাবস্থায় সে ঠিক করল, মারব তো বটেই। তার জন্য নানা রকম ব্যবস্থাও রয়েছে। তুই জল ঘোলা করিস নি, তোর বাবা করেছে,—এ রকম অজুহাত যদি বের করা যায়, তাতে বরং সুবিধাই হবে।

অতএব ট্রেন থামানো হল। সামনেই স্টেশন। খুব বড়ো নয়। রেলওয়ের নিজস্ব ভবনাদি ছাড়াও এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে আছেনানান ধরনের ঝুপড়ি-তোলা দোকানঘর। তার কোনোটি হোটেল, কোনো-টিতে রয়েছে মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী। শীতের উজ্জ্বল মিষ্টি রোদ ইতিমধ্যেই শুকিয়ে দিয়েছে ঘাসের শিশির। সকালের কুয়াশা-কাফন অপসারিত হয়ে শ্যামল প্রকৃতির নয়নাভিরাম শোভা পরিদৃষ্ট।

অপারেশন কমানডার নেমেই তার বাহিনীকে পজিশন নিতে নির্দেশ দেয়। কাজটি সম্পন্ন হবার পর সে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে,—আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই।

কয়েকজন ছাত্র এগিয়ে আসে।

মকবুলের মাথাটা ঘুরতে শুরু করে, এই বুঝি অর্ডার হয়, ফায়ার। কচি-কচি বাচ্চা ছেলেদের বুক বরাবর গুলি তাকে ছুঁড়তে হয়েছে আগেও।

অপারেশন কমানডার বলে,—ট্রেন লাইনের উপর কেন তোমরা ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছ?

ছাত্ররা বলে,—এটা আমাদের আন্দোলনের একটা অংশ।

—গায়ের জোরে আন্দোলন করবে না কি?— তেতে ওঠে কমানডার।

একটি ছাত্র, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, অনুচ্চ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়,—আপনারা গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে আছেন বলেই তো আমাদের গায়ের জোরেই আন্দোলন করতে হচ্ছে।

—তুমি কি নেতা?—প্রশ্ন করে অপারেশন কমানডার।

—না, আমি একজন ছাত্র। আমাদের কাছে নেতার চেয়ে নীতির প্রশ্নই বড়ো।

আবারো রেগে ওঠে অপারেশন কমানডার,— সাধারণ যাত্রীদের অসুবিধা করাটাই কি তোমাদের নীতি?

ছেলেটি বলে,—আপনি যে ট্রেনে এসেছেন, সে ট্রেনে কোনো যাত্রী নেই।

কথা বলে কোনো জিনিসের মীমাংসা করার ট্রেনিং তো দেয়া হয় না। এজন্যই বোধকরি অপা-

রেশন কমানডার সরাসরি জিজ্ঞেস করে,—এই ট্রেন যেতে দেবে কি দেবে না?

—প্যাসেনজার ট্রেন এলে আমরা ছেড়ে দেব, —মৃদু হাস্যে ছেলেটি বলে,—তবে আমরা জানি আজকে কোনো প্যাসেনজার ট্রেনে চড়বে না। যারা ট্রেনে উঠবে আর যারা ট্রেন চালাবে তারা সবাই আমাদের হরতালে শরিক হয়েছে।

কথা শুনে আর ছেলেটির মুখের অনতিপরিস্ফুট হাসি দেখে সারা শরীরে যেন বর্শা বিদ্ধ হতে থাকে অপারেশন কমানডারের।

ছেলেটি আবার বলে,—আমরা আপনাদেরকেও হরতালে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

—ইয়ারকি মারা হচ্ছে—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে অপারেশন কমানডার। চিৎকার করে বলে ওঠে, আমি বলছি, তোমরা লাইন ক্লিয়ার করবে কি না?

এই কথার কি জবাব দেয়া যায়? একমুহূর্ত থামল ছেলেটি। একবার নৈঋতে তাকাল। স্বচ্ছ আকাশ তার সুনীলবরন মেলে দিয়ে আছে। দূরের ঝাউগাছের উপর ডানা ঝাপটাচ্ছে ছুটো পাখি। পরস্পর পরস্পরকে ঘিরে রাগ-অনুরাগের সেই চিরন্তন খেলা। সে দৃশ্য দেখে অপরিসীম মমতায় ভরে ওঠে ছেলেটির চোখ। পিছন ফিরে দেখে তার সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো। অলস। শিথিল। নির্ভার প্রতিজ্ঞার চাপ-চাপ শিলা রোদের বন্যায় যেন আরো জমাট বাঁধছে। তার নিজের হৃদয়ের অনিঃশেষ ফল্গুধারা অনায়াসে মিশে যাচ্ছে শতধারায় উৎসারিত ওদের হৃদয়ের ঝরনাধারার সাথে। সে সামনে তাকায়। দেখে সুসজ্জিত সেপাইরা উঁচিয়ে আছে তাদের রাইফেল। সিনেমাতে দেখা স্টিল-ছবির মতো। তাদের মধ্যে একজন আছে তারই বয়সী। সে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা সবাই তাকিয়ে আছে। পাথরের মতো নিষ্কম্প তাদের চোখ। জলিলও তার পাথরের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ছেলেটির দিকে। কোনো ভাবান্তর নেই। অন্ততপক্ষে এই

মুহূর্তে নেই। তার মনে হয়, তার জন্য ছাত্রটির মনে ধীরে-ধীরে এক বেদনাবোধের সৃষ্টি হচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে। শোনে, ছেলেটি বলছে,—আমরা তো কিছুই করছি না, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। —একটু থামে। তারপর আবারো বলে,—আমাদের কাজ আমরা করছি, আপনাদের কাজ আপনারা করুন। —সে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাকায় অপারেশন কমানডারের দিকে। পুনরায় বলে,—আপনারা আমাদের হত্যা করতে পারেন। কিন্তু আপনাদের এটাও জানা দরকার যে, বেঁচে থাকাটাকেই আমরা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করি না।

বলেই ছেলেটি ফিরে যায় সঙ্গীদের মাঝে।

নিজেকে দারুণ উপহসিত মনে হয় অপারেশন কমানডারের। এত সব কামান বন্দুক দেখেও নিরস্ত্র ছেলেগুলো ভয় পাচ্ছে না। এটা তার আত্মম্ভরিতায় খুব লাগে।

চারিদিকের পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত। শীতের রোদে পিঠ বিছিয়ে দিয়ে ছেলেগুলো যেন আন্দোলনের উত্তাপ সঞ্চয় করছে। তাদের হাতে কোনো ইট-পাটকেল না দেখে জলিলও ভাবছে হেলমেটটি খুলেই ফেলবে কি না। মকবুলেরও আর ভালো লাগছে না এই অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। কিন্তু অপারেশন কমানডার ভাবছে অন্য কথা। খুনী হতে না পারলে এই সমাজে কোনো গৌরব নেই। বাঘা অফিসার হওয়ার প্রধান গুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা। বিশেষ করে আজকের এই দিনে ছেলেগুলোর এত বড়ো স্পর্ধা যে হুকুম অমান্য করে। অতএব কাজ তাকে দেখাতেই হবে। সে অর্ডার দেয়,—ফায়ার!

গুলি শুরু হতেই হতচকিত বিমূঢ় হয়ে পড়ে সবাই। কেউ বলে,—ভয় দেখানোর জন্য প্লাসটিকের গুলি ছুঁড়ছে।

অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তারা রেললাইন ছেড়ে দোকানের ঝুপড়িগুলোর আশেপাশে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপারেশন কমানডার দেখে একটি দোকানের

আড়ালে সেই বেয়াদপ ছেলেটা আরো কয়েকজনের সাথে কথা বলছে। সে তখন ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়, ওকে হত্যা করতে হবে। পাশে দাঁড়ানো জলিলকে বলে,—এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে আর কী হবে? এবার একটু টারগেট প্রাকটিস করো।

কথা বুঝতে না পেরে জলিল ফ্যালফ্যাল করে তাকায় তার দিকে। অপারেশন কমানডার তখন বলে,—ওই যে ছেলেটি দেখছ না? ওকে টারগেট করো।

—স্যার!

—হ্যাঁ, যা বলছি তাই করো—প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে পুনরায় আদেশ করে অপারেশন কমানডার।

তারপর যা হবার তাই হল। লক্ষ্য স্থির হতেই বুলেট বেরিয়ে গেল তীব্র বেগে। জলিল দেখল ছেলেটি পড়ে গেছে। রক্ত বেরিয়েছে কি বেরোয় নি এতদূর থেকে ঠিক বোঝা যায় না।

জলিলের কৃতিত্বে অপারেশন কমানডার মহা খুশি। ম্যাজিসট্রেট সাহেবকে ডেকে বলে,—দিলাম একজনকে নিকেশ করে।

কথা বুঝতে না পেরে ম্যাজিসট্রেট বলে,—তার মানে?

—ওই যে ছেলেটা চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলছিল, —দিলাম ঠুকে।

—একেবারে শেষ হয়ে গেছে? —অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করে ম্যাজিসট্রেট।

—শেষ হবারই তো কথা, কিন্তু···, —ম্যাজিস-ট্রেটের কণ্ঠস্বর একটু অন্যরকম লাগে অপারেশন কমানডারের কাছে। ফিরে সে প্রশ্ন করে, —মনে হচ্ছে, আপনি এজন্য বেশ দুঃখিত হয়েছেন?

দুঃখিত হবার কোনো ব্যাপার নয়,—ম্যাজিসট্রেট বলে,—আমরা সিভিলের লোক। এ ধরনের পরি-স্থিতিতে আমাদের অনেক রকমের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষত জনতার উপর বেপরোয়া গুলি ছোঁড়ার ঘটনা ঘটলে তো কথাই নেই।

এসব কথা বোঝার জন্য অপারেশন কমানডারের মাথা তৈরি করা হয় নি। সে বলে,—কী রকম?

—বুঝতে পারছেন না? —অধৈর্য হয়ে পড়ে ম্যাজিসট্রেট,—এখনি এই মড়া লাশ নিয়ে মিছিল বেরুবে। হাজার-হাজার উন্মত্ত জনতা তাতে যোগ দিতে থাকবে। তখন কোথাকার পরিস্থিতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—পারবেন তা ঠেকাতে?

অপারেশন কমানডারের বোধ হতে থাকে, কথাটা ঠিক। কামান বন্দুক দিয়ে ক্ষমতা জবর দখল করা গেলেও তা টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু পন্থা বের করতে হয়। না হলে সমরকর্তা কেন তার সব জেনারেল সাহেবদের অবসর দিয়ে-দিয়ে পলিটিক্যাল পার্টি খুলছেন। নিজের পক্ষে মিটিং মিছিল যাতে ভালো-ভাবে হয় তার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে তো কাজটি খারাপই হয়ে গেছে। ম্যাজিসট্রেট সাহেবকে সে জিজ্ঞেস করে,—তাহলে উপায়?

ম্যাজিসট্রেট সাহেবের মনে হয় জীবনে এই প্রথম-বারের মতো একজন ফউজি অফিসারকে ঠিকমতো বাগে আনতে পেরেছেন। সে খুব মেপে-মেপে বলে, —উপায় আছে বই কি?—বলেই একটু সময় নেয়। অপারেশন কমানডারের বিব্রত অবস্থাটি একটু উপভোগ করে। বলে,—যেভাবেই হোক, ওই ছেলে-টিকে জীবিত কিংবা মৃত—হস্তগত করতেই হবে।

—তারপর?

—গায়েব করে দেবেন।

—তারপর?

—তারপর আবার কী?—অপারেশন কমানডার-এর বোকামিতে নিজের মনের মধ্যে একটা বিরাট রকমের আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সে। ব্যাটারা এই বুদ্ধি নিয়ে দেশ শাসন করতে এসেছে? বলে, —আলাসউদ যদি না থাকল, তবে কে জখম হল আর কে খুন হল, তার আবার কৈফিয়ত কী?

ছত্তোর! এত একটা সহজ কাজ বুঝতে না পারার জন্য একটা ম্যাজিসট্রেটের সামনে এ হোঁচট খেতে

হল! রাগে দুঃখে উত্তেজিত হয়ে সে সেপাইদের হুকুম দেয়,—জখমি নিয়ে এসো।

কাছে যারা ছিল, তারা দেখল বুলেট শাহানশাহের পিছন দিক থেকে বুকের ডানপাশটা ফাঁকা করে বেরিয়ে গেছে। তীরবেগে ছুটে আসা রক্তকণিকারা সঞ্চালনের পথ না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। কিন্তু সে তো কেবল ক্ষণমুহূর্তের ব্যাপার। এখনি উপচিয়ে পড়ে শরীর ভিজিয়ে দিয়ে মৃত্তিকার বুকে গড়াতে থাকবে। হলও তাই।

তখনো শাহানশাহের জ্ঞান আছে। জিকুর দিকে তাকিয়ে বলে,—আমি গেলাম। যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই, তাদেরকে হত্যা করার জন্য যদি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসতে পারতাম।

ওরা সবাই ধরাধরি করে তৎক্ষণে শাহানশাহকে একটা পুকুরের পাড়ে নিয়ে এসেছে। আঁজলা ভরে পানি দিচ্ছে চোখে মুখে। এখনই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। গাড়ি-ঘোড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ধর্মঘটের দিন। একমাত্র উপায় হল অ্যামবুলেনস জোগাড় করা। লাইফ ছুটেছে টেলিফোন করতে।

ওরা দেখল রেল লাইন ছেড়ে সেপাইরা নীচে নেমে এসেছে। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই পেটাচ্ছে বেধড়ক। তছনছ করে দিচ্ছে দোকানপাট। কী যেন খুঁজছে পাগলের মতো। ওরা বুঝল, কুত্তাগুলোর প্রকৃত লক্ষ্য শাহানশাহ। জীবিত অথবা মৃত—যেভাবেই হোক—তাকে হস্তগত করাটা ওদের দিক থেকে নিরাপদ। বিপদ দেখে একজন বলল,—অ্যামবুলেনস কতক্ষণে আসবে ঠিক নেই। তার চেয়ে চলো শাহানশাহকে নিয়ে মুক্তি ক্লিনিকে যাই। বেশি তো দূর নয়—সেখানেও ওষুধপত্র আছে, ডাক্তার আছে। এখানে এভাবে ফেলে রাখার কোনো অর্থ হয় না।

মুক্তি ক্লিনিকে যখন নিয়ে আসা হল তখনো শাহানশাহ প্রাণ হারায় নি। ডাক্তার সাহেব ছিলেন। রোগী দেখেই বললেন,—কী সর্বনাশ! গুলি খেয়েছে বুঝি? আজকের হাঙ্গামায়?

—হ্যাঁ, স্যার—একজন বলে।

ভালো করে ক্ষত পরীক্ষা করেন তিনি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এখনই জরুরি অপারেশন দরকার। তিনি হতাশভাবে মাথা নাড়েন,—এর সুচিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত তো আমার এখানে নেই, বাবা।

—তাহলে কী হবে?—অসহায়ভাবে চিৎকার করে ওঠে ছেলেগুলো।

—হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করেছ?—জিজ্ঞেস করেন তিনি।

—হাঁ, টেলিফোন করা হয়েছে,—লাইফ ততক্ষণ ফিরে এসেছে,—কিন্তু এতক্ষণ তো অ্যামবুলেনস চলে আসা উচিত।

—উচিত আর অনুচিতের কোনো ব্যাপার আর নেই এখন—ডাক্তার একটু হাসেন। নিরুপায়ের হাসি, —হাসপাতালের অ্যামবুলেনস, সে তো সরকারি সম্পত্তি। হয়তো অর্ডার জারি হয়ে গেছে কোনো-মতেই যেন বের করা না হয়।—তিনি একটু থামেন। মনে হয় তিনি কী যেন ভাবছেন। কোনো বিষয়ে বোধহয় সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন। ইচ্ছে করলেই তিনি দায়িত্ব এড়াতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। গলাটা বাড়িয়ে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন,—

—দেখো, একে আমি আমার গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কয়েকজন আমার সাথে চলো। রাস্তায় ধর্মঘটীদের লক্ষ্য থেকে যদি কোনো হাঙ্গামা হয়, তোমরাই ট্যাকল করবে।

শাহানশাহ গুলি খেয়েছিল সাড়ে দশটার দিকে। হাসপাতালে নিতে-নিতে বারোটা। ততক্ষণে তারো বারোটা বেজে গেছে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল সঙ্গীদের মুখ।

ডাক্তার সাহেব দেখলেন, কান্নাকাটি করার কোনো সময় নেই। সুর্দার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ছেলেদের বললেন,—লাশের কী হবে?

জিকু বলে,—এ আমাদের বন্ধুর লাশ। আমাদের সংগ্রামের প্রতীক। একে আমরা হোস্টেলের সামনে দাফন করব।

হাসপাতাল সূত্র থেকে জানানো হল এই গুলি-বিদ্ধ লাশ আমরা পুলিশের ক্লিয়ারেনস ছাড়া হস্তান্তর করতে পারব না।

সেপাই-পুলিশদের হাতে যাওয়া মানেই তো গায়েব করে ফেলা। দাফন-কাফন কিছুই হবে না। থাকবে না কোনো স্মৃতি চিহ্ন। কোনো অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেবে মাটির ভিতর। যে বন্ধু শহীদ হল,—তার এই অমর্যাদা ছেলেদের কাছে সহ্যাতীত।

ইতিমধ্যেই শাহানশাহের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে। কী করে এইসব খবর দাবানলের মতো বিস্তৃত হতে থাকে, সেটাই এক আশ্চর্যের ব্যাপার। হেড কোয়ার্টারে তো সমরকর্তা রেগেই অস্থির,—মারার জন্যই তো পাঠিয়েছি। তাই বলে লাশ ফেলে আসবি...। জীবিতদের নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই—যত ভয় মৃতদের। আমি হুকুম দিচ্ছি, যে করেই হোক লাশ জোগাড় কর্।

লাশ ছিনিয়ে নেবার জন্য যে-কোনো মুহূর্তে হাসপাতালে হামলা হতে পারে। ছেলেরা কেঁদে পড়ল,—ডাক্তার সাহেব, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার সাহেব বিব্রত হলেন—আমার ক্লিনিক হলে যা করার আমি করতাম। কিন্তু এখানে আমি কী করব? তোমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলো।

—কর্তৃপক্ষ কী করবে?—বলল কে একজন,—এখানকার যা আইন তা তো তাদের মানতেই হবে।

—মানুষের তৈরি আইন তার স্বাভাবিক অবস্থার জন্য।—কথাটা কে বলল বুঝতে না পারলেও তার জবাব দেয়াটা কর্তব্য বলে মনে করলেন তিনি,—যারা এই ছেলেটিকে হত্যা করেছে, তারা তাদের অপরাধের চিহ্ন গোপন করে ফেলতে চায়। আইন মানতে গিয়ে আমরা তাদেরকে সে সুযোগ করে দিতে পারি না। সুতরাং আইন এখানে ভাঙতেই হবে।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও ছিল সেখানে। দেশের এই বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে তারাও যুক্ত। এই নিদারুণ হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে তারাও সমব্যথী। এই পৈশাচিক বর্বর হত্যাকাণ্ডে তারাও ক্ষুব্ধ। তাদের সাহায্যে অনায়াসেই লাশটিকে হাসপাতাল থেকে বের করে আনা যায়। কিন্তু ডাক্তার সাহেব ভেবে দেখলেন, তাতে খুব একটা লাভ হবে না। সম্পূর্ণ বিষয়টিকে এখন গোপনীয় করে ফেলতে হবে। অন্যথায় যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো জায়গা থেকে ফউজিরা লাশটিকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং কিছু নেতৃস্থানীয় ছেলেকে ডেকে তিনি চুপিচুপি বললেন,—তোমরা দু-চারজন মিলে যেভাবেই হোক লাশটিকে সরিয়ে আপাতত কোনো গোপন স্থানে নেবার ব্যবস্থা করো। একদম যেন জানাজানি না হয়। তারপর আমি দেখছি কী করা যায়।

তারা কাজটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করতে পারল। পুনরায় যখন ডাক্তার সাহেব লাশটি দেখার জন্য গেলেন, তখন দেখলেন ছেলেরা ওটিকে তাদের হোস্টেলের ছাদের উপর পানির ট্যাংকের পাশে লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে ওঠা বেশ বিপজ্জনক। তবু তিনি উঠলেন। তাঁর বয়স হয়েছে। শরীরও বেশ ভারী হয়ে এসেছে। উঠতে কষ্টই হচ্ছিল। আসলে তাঁর দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল, ছেলেটি এখনো মরে নি। যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। জেগে উঠবে যে-কোনো মুহূর্তেই। তিনি হয়তো ভাবছিলেন, পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ছেলেটি তার নিমীলিত আখি মেলে দেবে।

উঠে দেখেন যেভাবে লাশকে শুইয়ে রাখা হয় ছেলেটিকেও ঠিক সেভাবেই রাখা হয়েছে। তবে শরীরের উপরে নেই কোনো আচ্ছাদন। সবাই এত শোকগ্রস্ত আর সন্ত্রস্ত যে কারোরই মনে হয় নি একটা চাদর দিয়ে দেহটা ঢেকে দেবার কথা। সরাসরি রোদ এসে পড়েছে তার উপর—তার মৃত মুখে—তার গুলি-

বিদ্ধ পাঁজরার ফোকরে। এইভাবে একটি লাশকে পড়ে থাকতে দেখে খুব কষ্ট হয় ডাক্তার সাহেবের। মৃত্যুর পরে নাকি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? কিন্তু এই ছেলেটি?—মৃত্যুর পরেও তার রেহাই নেই। মানুষের লোভ, ক্ষমতালিপ্সা, ওঞ্চকতা এতই প্রবল যে সেখানে ন্যূনতম মানবিকতাও কোনো মূল্য পায় না। ডাক্তার সাহেবের মনে হয়, মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে ছেলেটি শুয়ে আছে। উজ্জ্বল মিষ্টি রোদের করতালি বাজছে তার চারদিক ঘিরে। আর মাটির পৃথিবীতে শকুনিরা পাখা ঝাপটাচ্ছে,—বিষাক্ত চঞ্চু মেলে দিয়ে ঠোকরাতে আসছে তাকে। সে শুয়ে আছে,—মৃত,—পাশবিকতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের শেষ প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে। জীবন দিয়ে যা ঠেকাতে পারে নি, মৃত্যু দিয়ে তা ঠেকাতে চায়।

ছেলেদের সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের কথা হল আরেক দফা। তিনি বললেন,—জানি না, এই ছেলেটির বাবামাকে খবর দেয়া সম্ভব হবে কিনা। কিন্তু মৃত মানুষের দেহ চায় তার শেষ সদ্গতি। তাই আমরা এভাবে লাশ ফেলে রাখতে পারি না।

ছেলেরা বলে,—আমরাই ওর দফন-কাফন করব। ওকে রেখে দেব আমাদের পাশে। বারবার আমরা ফিরে যেতে পারব তার স্মৃতির কাছে।

—আমি কিন্তু একটা আশঙ্কামুক্ত হতে পারছি না,—সাইফুলের কথা শুনে সবাই তাকায় ওর দিকে। —সে বলে,—ওরা তো কবর খুঁড়েও লাশ তুলে নিয়ে যেতে পারে।

—হ্যাঁ। সে তো পারেই,—সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেন ডাক্তার সাহেব,—যারা মানুষ মেরে ফেলতে পারে, তাদের পক্ষে কবর খুঁড়ে লাশ তুলে নিয়ে যাওয়া কী আর এমন কঠিন কাজ? তাই বলে আমাদের কাজ আমরা করব না? আমাদের যা করণীয় আমাদের তা করতেই হবে। —তিনি বলেন, যেভাবে হাসপাতাল থেকে গোপনে লাশ নিয়ে এসেছে, সেভাবেই তোমরা গোপনে লাশটিকে আমার ক্লিনিকে পৌঁছে দাও। কবর দেবার আগের যে কাজটুকু আছে সেটুকু তো করি। তারপর দাফনের ব্যবস্থা করা যাবে। —বলেই তিনি হাসেন। এত দুঃখের মাঝেও হাসি। হাসি তো নয়, কান্না ঢাকার প্রয়াস। হাসতে-হাসতেই তিনি বলেন,—জানো তো ওরা মনে করে মাটির ভিতর পুঁতে ফেলতে পারলে ওদের আর ভয় নেই। আমরা তাই ওকে মাটিতেই পুঁতে দিতে চাই। কিন্তু ওরা যেটা জানে না আর আমরা যেটা জানি তা হল এসব লাশ কখনো মাটির নীচে থাকে না। তাই আমাদের ভয়েরও কিছু নেই।

পথে পথে বিপদ। যে-কোনো জায়গায় গাড়ি থামিয়ে লাশটি নামিয়ে নিতে পারে। লাশের সন্ধান পাবার জন্য ইতিমধ্যেই ইনফরমারদের যথেষ্ট সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। সরাসরি নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। এজন্য একটু অভিনয়ের প্রয়োজন হল। একটি জীবিত ছেলেকে লাশ বানিয়ে লোকজনের সামনেই তুলে দেয়া হল ডাক্তার সাহেবের গাড়িতে। তারপর ছেলেরা জোগাড় করল অন্য একটি গাড়ি। তার ক্যারিয়ারে বস্তার ভেতরে আসল লাশটিকে পুরে তারা পাঠিয়ে দিল মুক্তি ক্লিনিকে। গাড়ি অনেক ঘুরে গলিঘুপচির ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছাল যথাস্থানে।

একজন মৃতকে কবরস্থ করা কী কঠিন ব্যাপার! ধর্মীয় মতে তাকে ধোয়াতে হবে। সবাই তো আর ধোয়াতে জানে না। আরো চাই প্রয়োজনীয় উপকরণ। জোগাড় করতে হবে কাফনের কাপড়। চাই লোমান আতর। খুঁড়তে হবে কবর। বাঁশ-চাঙ্গারি—দরকার রয়েছে এসবেরও। কিন্তু ধর্মঘটের দিন এগুলো জোগাড় করা খুবই মুশকিল। কিন্তু ছেলেরা, তাদের মৃত বন্ধুর শোক বুকে পাথরচাপা দিয়ে সবকিছুরই ব্যবস্থা করতে থাকল। মনের মধ্যে কেবল একটিমাত্র ভয় তাদের। পাছে সেপাইরা এসে লাশ নিয়ে যায়। অমর্যাদা হয় মৃতদেহের।

শাহানশাহের লাশ ধোয়ানো শুরু হল রাত আটটায়। অর্ধেক ধোয়ানো হতে না হতেই শোনা গেল গাড়ির শব্দ। একটি নয়,—দুটি-তিনটি-চারটি-পাঁচটি—বহু। ঘিরে ফেলল মুক্তি ক্লিনিক। সবাই বুঝলে এসে গেছে।

তারাও বসে ছিল না। তাদের সামনে সমস্যা ছিল আপাতত দুটো। এক, লাশ ছিনিয়ে নিয়ে মিছিল হলে তার মোকাবেলা করা। অপারেশন কমানডারের মাথা ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ধীর-স্থিরভাবে সে অর্ডার দিয়েছে, যদি মিছিল হয়, তবে ওয়ান বুলেট ওয়ান ম্যান। ফউজি কানুনে আমাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। গুলি যেন নাভি থেকে মগজ পর্যন্ত হয়। তার নীচেও নয়, উপরেও না।

দরজায় শব্দ হয়—খট···খট···খট। ডাক্তারসাহেব দেখলেন ভয় পাওয়া আর না-পাওয়ার ব্যাপারই আর নেই এখন। সবাইকে শান্ত থাকতে বলে তিনি দরজা খুললেন। ভারী-ভারী সব বুট এসে পজিশন নিল বিভিন্ন জায়গায়। অপারেশন কমানডার ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে,—ডেড বডি কোথায়?

ডাক্তারসাহেব দেখলেন, লুকানোর আর কোনো মানে হয় না। তিনি বললেন,—আছে, এখানেই আছে।

অপারেশন কমানডার বলে,—গুলিবিদ্ধ লাশ আপনি এখানে রেখেছেন কেন?

ডাক্তারসাহেব বললেন,—আমি ডাক্তার। রোগ-গ্রস্তই হোক আর বুলেটবিদ্ধই হোক, সমস্ত মানুষেরই চিকিৎসা করাটা আমার ধর্ম।

—সে তো মরে গেছে,—বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে যায় অপারেশন কমানডারের মুখে,—তা লাশ লুকিয়ে রাখাও আপনার ধর্ম নাকি?

—না,—খুব শান্ত খুব সংযত খুব স্পষ্ট গলায় বলেন ডাক্তারসাহেব,—মূর্দার জন্যও অনেক কিছুই করার থাকে। একজন মানুষ হিসেবে আমি তাই করছি।

—না, তা আপনাকে করতে হবে না,—এবার ধমকে ওঠে অপারেশন কমানডার,—যা করার আমরাই করব।—তারপর সেপাইদের আদেশ করে, —তোলো, লাশ তোলো।

সবাই প্রস্তুতই ছিল। হুকুম শোনামাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ে লাশের উপর।

ডাক্তারসাহেব বিপর্যস্ত চোখে তাকান আকাশের দিকে। অন্ধকার। শীত রাত্রির হিম দ্রুতবেগে নেমে আসছে মৃত্তিকার অরক্ষণীয়া বুকে। বারান্দার টবে চন্দ্রমল্লিকা। সাধ করে কোন ভুলে যাওয়া রোগী রোপণ করেছিল। ফুল ফুটেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ। কিন্তু তার সাথের এই ধুলোমাটির সংসারের মানবভাগ্যের কোনো প্রতি-তুলনা হয় না। তাঁর মনে হয়, তিনি কী যেন বলতে চান, কিন্তু তা মনে পড়ছে না। বহু কষ্টে তিনি শুকনো ঠোঁট ভেজান। তারপর জোর করে বলেন—আপনারা তো নিয়েই যাবেন। আমরা কাফন পরিয়ে দেই,—এই কাজটুকু আমাদের করতে দিন। কতটুকু বা সময় লাগবে? অনন্তকাল ধরে সে মাটির সঙ্গে মিশতে থাকবে। মৃতের প্রতি আমাদের এই শেষ শ্রদ্ধাটুকু জানাতে দিন।

কী ভেবে রাজি হয় অপারেশন কমানডার। বোধকরি ধর্মীয় সংস্কার থেকে। তারপর ধোয়ানো শেষ হলে কাফন পরানো হলে লাশটিকে তোলা হয় গাড়িতে। মৃদু আলোর ভেতরে পড়ে থাকে শুভ্র কাফন। জীবিত মানুষের রহস্যময় পরিণতির শেষ আচ্ছাদন। তার ভেতরে শুয়ে থাকে শহীদ শাহানশাহ। ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে জানালা দিয়ে। শিরশির করতে থাকে ফাটা ঠোঁট—খসখসে চামড়া। সকালের কাটা গালে আবারো টান ধরে মকবুলের। সে তাকায় জলিলের দিকে। তার চোখ পাথরের মতো। সকালবেলার মতো। জলিলও তাকায় তার দিকে। গাড়ির চলার সাথে পাল্লা দিয়ে এইভাবে কতক্ষণ চলতে থাকে, কে জানে? এক সময় নিজে

থেকেই বিড়-বিড় করতে থাকে,—মকবুল ভাই—ও মকবুল ভাই, যদি সাজটুকু বদল করে নেয়া যেত, ···যদি সাজটুকু বদল করে নেয়া যেত, তাহলে কি কাফনের ভেতর শুয়ে থাকা ওই ছেলেটা আমার এই উরদিপরা পোশাকটা পরতে রাজি হবে, অ্যাঁ···

বাংলাদেশ

ভ্রমসংশোধন

ডিসেমবর ১৯৮৭ সংখ্যায় সমালোচিত সুভাষ ঘোষালের "দেহকেই ফিরে পাওয়া" বইটিকে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত, এটি কবির তৃতীয় কাব্যসংকলন।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে

গৌরী আইয়ুব

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর পাকিস্তানের জন্ম। এবং অবশ্যই স্বাধীন ভারতেরও। এই জন্মের পূর্ববর্তী তিন-চার দশক ধরে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে দেশ অস্থির ছিল। ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে এবং আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে অবিভক্ত বাঙলায় রাজনীতি ও সংস্কৃতির সেই অধ্যায়টিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ করে গেছেন যখন হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাবোধ তিক্ততম ও তীব্রতম পর্যায়ে উঠেছিল। তখন বাঙলাদেশে, একদিকে ছিল সংখ্যাগুরু মুসলমান, প্রধানত কৃষিজীবী, আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষায় হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর, সেই পরিমাণে চাকুরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন—ফলে কিছুটা সংখ্যার জোরেই সেইসব ক্ষেত্রে অধিকতর অধিকারের দাবিদার। অন্যপক্ষে সংখ্যালঘু হলেও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিল ইংরাজি শিক্ষায় অগ্রসর একটি নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ, যারা আধুনিক জীবিকার নানা ক্ষেত্রে নিজেদের অর্জিত অগ্রাধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। ফলে সর্বক্ষেত্রেই রেষারেষি উঠেছিল তুঙ্গে। এবং এই তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে রাজনীতির উপজীব্য করে তোলার জন্য মুসলমানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল সংখ্যাগুরুত্ব, আর হিন্দুর ছিল আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সুবিধা। সমস্যাটার সর্বভারতীয় চেহারা একটু ভিন্নতর ছিল অবশ্য। তাই নিয়ে সর্বভারতীয় নেতারা যখন রাজনৈতিক মঞ্চে দরকষাকষি করছিলেন তখন তার উত্তেজনার চাপে মাঝে-মাঝেই যে-কোনো অছিলায় জনসাধারণ সরাসরি খুনোখুনিতে নেমে পড়ছিল। বাঙলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি ছোট বড় নানা আকারে নানা অঞ্চলে প্রায়শই ঘটছিল। অবশ্যই তাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্ররোচনাও থাকত।

সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ধোঁয়ায় দেশের আবহাওয়া যখন এইরকম কলুষিত এমন সময় ১৩২৯

বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় তারিখে অধ্যাপক কালিদাস নাগের একটি পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "ঠিক যখন আমার জানালার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী।"

আজকের সভার* তারিখ ১লা আষাঢ়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। আজ ৬৫ বৎসর পরেও আমরা সমস্যাটার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। এখন আরো হতাশ বোধ করার কারণ আছে, যেহেতু এই দুরারোগ্য ব্যাধির দুরূহতম চিকিৎসার প্রয়াসও করা হয়ে গেছে ইতো-মধ্যে। ৪০ বৎসর আগে দেশব্যবচ্ছেদ করে সমস্যাটার একটা চূড়ান্ত সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় চূড়ান্ত সমাধান বলে কিছু নেই। আবার শোনা যায় কর্কটরোগে আক্রান্ত দেহে অস্ত্রোপচার হলে রোগটা নাকি আরো দ্রুত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত-দেহের বেলাতেও দেখছি এই উৎকট ব্যাধি ক্রমাগত ছড়িয়েই পড়ছে।

দেশবিভাগের কথা যখন উঠলই তখন সমগ্র উপমহাদেশেরই বর্তমান পরিস্থিতিটার উপরেও দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার অন্য নানারকম চেহারা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা এখন আর তেমন বড় সমস্যা নয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য দুই হাত থাকলেই তালি বাজে—এ তো চিরকালের কথা। বিভাগপূর্ব পাঞ্জাবের দুই অংশে জনবিনিময় প্রায় সম্পূর্ণ ঘটে গিয়েছিল বলে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা আজ এতই নগণ্য যে তাদের অস্তিত্ব স্মরণেই থাকে না। নতুন করে পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হলাম কয়েকদিন আগে, যখন কাগজে পড়লাম মীরাট দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় গত ঈদের দিনে করাচিতে কয়েকটি মন্দির ও হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল।

পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ-এ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করার কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত সেখানেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ক্ষত বারবার রক্তক্ষরণ করেছে। কিন্তু উর্দুভাষী পাকিস্তানের সঙ্গে বঙ্গভাষী পাকিস্তানের সম অধিকারের লড়াইটা যত তীব্র হতে থাকল ঘাটের দশকে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটাও ততই ধামাচাপা পড়ে গেল। বাংলাদেশের জন্ম হবার পর থেকে এই ১৬ বৎসরে ধামাটা যে একবারও তোলা হয় নি তার কারণ হিসাবে বাংলাদেশীরা দাবি করেন যে তাঁদের দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত মোটা-মুটি পাকা হয়ে গেছে, এতে ফাটল ধরানো সহজ হবে না আর। এই জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মুসলমানের, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের মিলিত প্রেরণার সৃষ্টি। সত্যিই যদি সম্প্রীতির ভিত বেশ পাকা করে গাঁথা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা সমগ্র উপ-মহাদেশের পক্ষেই মস্ত বড় আশার কথা, এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু বহুযুগের বদ্ধমূল ভয় তো সহজে কাটতে চায় না। মুজিবের নেতৃত্বে বাংলা-দেশকে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চেয়ে-ছিলেন তাঁরা অনেকেই ধর্মান্ধতার হাতে প্রাণ দিয়ে সেই আদর্শের চরম মূল্য চুকিয়েছেন একথা আমরা জানি এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা যে আজ আর তেমন করে সেই দাবির কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে সাহস পান না এতে আশঙ্কার কারণ অল্প একটু আছে বইকি! বাংলা-দেশের প্রায় নয় কোটি জনসংখ্যার এক-দশমাংশ হিন্দু। এঁদের মধ্যে বর্ণ-হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। অতএব পূর্ববাংলায় হিন্দু-সংস্কৃতির একদা উগ্র আত্মাভিমানও আজ লুপ্ত। জনবল অল্প, মনোবলও খুব বেশি নেই।

* এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রচর্চাভবনে পঠিত আচার্য সত্যচরণ লাল বক্তৃতার ঈষৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

ফলে বাংলাদেশের হিন্দু-সংখ্যালঘু আজ নির্জীব নির্বিষ। অতএব আপাতত এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যা-জর্জরিত বাংলাদেশেরও কোনো বড় সমস্যা নয়।

প্রতিতুলনায় ভারতরাষ্ট্রের অবস্থাটা, সবাই জানেন, অন্যরকম। এবং অনেক বেশি জটিল। পাঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যেভাবে নিঃশেষে মুসলমান-অমুসলমান (হিন্দু না বলে অমুসলমান বলছি, কারণ সে সময়ে হিন্দুর সঙ্গে বিরাটসংখ্যক শিখও ছিলেন একপক্ষে) গণ-বিনিময় হয়ে গিয়েছিল সেরকম চূড়ান্ত বিনিময় যদি পাকিস্তানের দুই অংশের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষেরও হয়ে যেত তাহলে এই শতাব্দীর ইতিহাসে আরো একটি অতি নিষ্ঠুর দীর্ঘ-মেয়াদি সমাধান সেরে রাখত ইতিহাসবিধাতা। সেই সমাধান অনেকেই চেয়েছিলেন এবং তাকেই এখনও অনেকে একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান বলেই মনে করেন। আমার এক পাঞ্জাবি ভাবী বলতেন, "ন রহে বাঁস, ন বাজে বাঁসরী।"—শ্যামের বাঁশির আপদ যদি বিদায় করতে চাও তাহলে দেশ থেকে সব বাঁশঝাড় উৎখাত করে ফেলো। উৎখাত যে করা হয়নি তাতে করে একদিকে মনুষ্যত্বের উপর কিছুটা আস্থাও যেমন অবশিষ্ট রয়ে গেল অন্য দিকে তেমনি যথা-সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার মতন সমস্যার কিছু শিকড়ও রয়ে গেল আমাদের মাটিতে।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটা স্বাস্থ্যকর কিন্তু অস্পষ্ট ভাবনাকে কিছু ভারতীয় নেতা আমাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন—সংবিধানেও এই আদর্শকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শটা অস্পষ্টই রয়ে গেছে যেহেতু নেতৃস্থানীয় ভাবুকরাও মনস্থির করতে পারেন নি যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কী বোঝাবে এদেশে। সব ধর্ম থেকে সরকারের সমদূরত্ব না সম-নৈকট্য—equal distance না equal proximity? দেশের চিন্তাশীল মুষ্টিমেয় মানুষের কাছেই যখন আদর্শটা স্পষ্ট রূপ ধরতে পারে নি এবং সরকারি আচরণও দ্বিধাগ্রস্ত তখন সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা যে কিছুমাত্র গৃহীত হয় নি এতে আর অবাক হবার কী আছে? অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার শুভ চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে অনুকূল জল-হাওয়া পেয়ে সেই শিকড় থেকে সাম্প্রদায়িকতার চারা গজিয়ে উঠে ডালপালা মেলতে দেরি করে নি। অতি সম্প্রতি মীরাট ও দিল্লীতে আর একবার কী উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বিরোধ তা কারুর অজানা নেই।

ভারতবিভাগের পর থেকে কত হাজার বার হিন্দু মুসলমান বিরোধ নৃশংসভাবে ফেটে পড়েছে কখনও বড় আকারে তার পরিসংখ্যান সন্ধান করতেও সাহস হয় না। অর্থাৎ পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে দুই ভিন্ন উপায়ে এই হিন্দুমুসলমান সমস্যার দুই ধরনের সমাধান হয়ে গিয়ে থাকলেও আমাদের দেশের এই সমস্যা, বলতে গেলে ১৯৪৭ সালে যেখানে ছিল আজ ১৯৮৭ সালেও সেখানেই আছে। বরং বলা যায় হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়েই সাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা আবার দ্রুত বাড়ছে এবং তারা আরো অবুঝ এবং মরীয়া হয়ে উঠছে। এদিকে যাঁরা এই সাম্প্র-দায়িকতাকে ঘৃণা করেন তাঁরা আজো দিশেহারা হয়ে পরস্পরকে সেই একই অসহায় প্রশ্ন করে বলেছেন —"ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান কী?"

এই পঁয়ষট্টি বছরে আমরা যে সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছি—সমাধানের দিকে একচুলও অগ্রসর হইনি সেকথা স্পষ্ট করে দেবার জন্যই কালিদাস নাগের প্রশ্ন এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের উল্লেখ করে-ছিলাম। পত্রাকারে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটা খুব দীর্ঘ নয়। অল্পস্বল্প বাদ দিয়ে তাঁর চিঠিখানা প্রায় সবটাই তুলে দেব, পাঠক একটু ধৈর্য ধরবেন :

'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্মগ্রহণ

করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে তাঁরা আধুনিক যুগের বাহন ; তাঁদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই। [এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপের বুকে নেমে আসা মধ্য-যুগের অন্ধকার, ফ্যাশিস্ট তাণ্ডব]। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই।···কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয় —অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-cooperation ! হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার-মূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। [আবার জনান্তিকে বলি, এখন আর তত সংকীর্ণ নেই—শুদ্ধিকরণের বেশ প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে মুসলমানদের পুনর্বার সদ্ধর্মে ফিরিয়ে আনার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে নাকি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে]। আচারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক।·····আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানেই তাকে স্থান দেওয়া হোত। [এই কুশ্রী অভিজ্ঞতাটা এতো লজ্জিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে যে অন্তত ৫।৬ বার এর উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা রচনায়]।

'অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসল-মানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে ? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে সচেটভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।···মোটকথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিংশ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংশ্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি।···সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায় ? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেচে, হিন্দু-মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।···আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।···হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই—কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির মুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।—যদি না আসি তবে, নাস্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমাদের আলোচ্য সমস্যা ও সমাধানের প্রায় সবটাই এখানে সূত্রাকারে পেয়ে গেলাম বলেই আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে পত্রখানি পাঠককে উপহার দিলাম। নানা দিক থেকে এই সমস্যাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসে কাব্যে উত্থাপন করেছেন। এখন তারই কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। উদ্ধৃত পত্রে তিনি বলেছেন বটে যে ভারত-বর্ষের এমনি কপাল যে এই দেশেই এমন পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটি জাত পাশাপাশি বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে, ইতিহাসের চক্রান্তে। এদের এক পক্ষ আগ্রাসী এবং আত্মসম্প্রসারণে উদ্যমী মুসলমান, অন্য পক্ষ নিজের

সুনিপুণ কৌশলে গড়া আচারের প্রাকারে সুরক্ষিত, কূর্মস্বভাব হিন্দু। কিন্তু পৃথিবীর ইতস্তত একটু চোখ বুলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে যে নিজেদের যারা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী মনে করে এমন আরো বহু জাতই নানা ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি প্রতিবেশী-রূপে বাস করেও আমাদেরই মতন কিছুতে মিলতে পারছে না, পারছে না বলেই নিরন্তর হানাহানি করে চলেছে। এমেরিকার সাদা আর কালো মানুষদের দেখুন, আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক আর প্রোটেসট্যানট্ট-দের দেখুন, আরো কাছে এশিয়ার দুই প্রতিবেশী মুসলমান দেশ ইরাকে ইরাণে সুন্নী আর শিয়াদের দেখুন—এরকম পারস্পরিক বিরোধের তো শেষ নেই। ইয়োরোপে খ্রীস্টান ও মুসলমানের সংঘাতও হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের মতোই ৮/৯ শ বৎসরের পুরানো। য়িহুদীদের সঙ্গে প্রথমত খ্রীস্টানদের এবং পরে মুসলমানদের বিরোধ আরো প্রবীণ। তাই ইতিহাস-বিধাতা ভারতবর্ষের প্রতিই বিশেষভাবে অকরুণ হয়েছেন এমন বলা যায় কি ?

তাছাড়া ইতিহাসের এই বিধানকে রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের জাতীয় ভাগ্যের অবিমিশ্র অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন এমন ভাববারও কারণ নেই। ভারতের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে বসে তিনি নিজেই বলেছেন : 'গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত মহা-সভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরা মাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।' অতএব দেখা যাচ্ছে জাতি-সংঘাত ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ইতিহাসের অভিশাপ নয়, ইতিহাসের বরলাভ—যদি অবশ্য রূঢ়িক থেকে যৌগিক বিকাশ অর্থাৎ সভ্যতার অগ্রগতিই আমাদের কাম্য হয়।

মানবসভ্যতার এই রূঢ়িক থেকে যৌগিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা সমাজের পক্ষে শেষ পর্যন্ত উত্তরণের পর্যায়ে পড়লেও ব্যক্তিমানুষকে এর জন্য কঠিন মূল্য চুকাতে হয়েছে। বহু স্বেদ অশ্রু ও রক্তের অক্ষরেই নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল মানবসভ্যতার এই উত্তরণের ইতিহাস। এদেশে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথার্থ আদিনিবাসীদের সংঘাতেও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমাদের মহাকাব্যে তার কিছু কিছু 'ইতিহাস' আজো আমরা দেখতে পাই। জাতি-সংঘাতের অনিবার্য আনুষঙ্গিক যে ঘৃণা এবং জাতি-বিদ্বেষ তারও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে মহাকাব্যে। আর্যরা অনার্যদের যে প্রায় বন্য প্রাণীর সমতুল্য মনে করেছিল তার কিছুটা সাক্ষ্য আছে রামায়ণের হনুমান, জাম্ববান, বালি, সুগ্রীব ইত্যাদি চরিত্রে। রাক্ষসজাতির বর্ণনায় জাতিবিদ্বেষ প্রায় হাস্যকর অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। আবার মজা হল এই যে, ইংরেজ বিজেতারা এই দেশের মানুষকে যখন 'নেটিভ' বলেছিল কিংবা মুসলমান বিজেতারা কাফির আখ্যা দিয়েছিল তখন আমরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম। কিন্তু কই আর্য বিজেতারা যে এদেশের মানুষকে 'অনার্য' বা 'অভদ্র-অসভ্য' আখ্যা দিয়েছিল সেটা তো আমরা প্রতিবাদযোগ্য মনে করি না। বরং এখনও সেই শব্দটিকেই আমাদের আদিপুরুষের অভিধা বলে মেনে নিয়েছি। এবং সেইভাবেই ব্যবহার করে বলেছি। অবশ্য দ্রাবিড়রা এই আর্য অহঙ্কারের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাকে আবার আমরা উত্তর ভারতের মানুষরা দক্ষিণীদের অযৌক্তিক অতিস্পর্শকাতরতা মনে করি।

হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের উৎস ও যৌক্তিকতার সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আমরা আবাল্য শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথও মোটামুটি তার সমর্থন করেছেন : ···'এই বিরোধে আর্যরা জয়ী হইলেন কিন্তু অনার্যরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকানগণের মতো উৎসাদিত হইল না।···একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল।" তাহলে এটাকে সৌভাগ্য বলেই জ্ঞান করা উচিত শূদ্রদের। কিন্তু হিন্দু সমাজতন্ত্রের নিম্নতম ধাপে গৃহীত হবার এই সৌভাগ্যকে শূদ্ররা পরে যথেষ্ট প্রাপ্তি

বলে জ্ঞান করেন নি। এই আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁরা কখনও বৌদ্ধধর্মে কখনও ইসলামে বা শিখধর্মে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছেন। এটাকে আমরা মোটেই ভালো চোখে দেখি নি, আজও দেখি না। বাবাসাহেব আম্বেদকর যে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের বিরোধিতা করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং নিজেও সেই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে আমরা ক্ষমা করি নি। অন্যপক্ষে আর্যদের যে "সামাজিক সুব্যবস্থা" সেদিন মানবিক বলে মনে হয়েছিল, আজ তিন হাজার বৎসর পরে তা কী দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের কাঁধে! তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্রাচ তৈরি করে দিয়েও আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না হিন্দু সমাজ। ক্রাচটাই দেহের অঙ্গ হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে মনে হচ্ছে এবং নানা যন্ত্রণাও সৃষ্টি করে চলেছে। অবশ্য এই বর্ণব্যবস্থার দুর্বলতাটাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন: 'যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকরজাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই।' তাছাড়াও বলেছেন, 'জগতে হিন্দু-জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।···জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই।'

জাতিসংঘাতের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বহু দেশেই এইরকম জাতিসংঘাত একবার নয়, বার বার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসেছে। ভারত ইতিহাসের এহেন ঢেউ গুনতে বসে 'শক হুনদল পাঠান মোঘল' সকলকেই রবীন্দ্রনাথ আপন বলে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন, এমন-কি 'এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ'-ও বলেছেন। খুব সরবেই বলেছেন যেহেতু তাঁর দেশবাসীরা অনেকেই এই পরবর্তী বহিরাগতদের আপন বলে স্বীকার করতে রাজি নন। একমাত্র আর্যদেরই তাঁরা 'দুবাহু বাড়িয়ে' গ্রহণ করেছেন। এবং আর্য গরিমার প্রতিফলিত গৌরবে নিজেরাও গৌরবান্বিত বোধ করেছেন। অবশ্য আর্যমহিমা কীর্তনে রবীন্দ্রনাথেরও উচ্ছ্বাস কিছু কম ছিল না। তবে আর্যামির ভণ্ডামিকেও রবীন্দ্রনাথ কলমের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করতে দ্বিধা করেন নি:

"মোক্ষমূলর বলেছে আর্য,
তাই শুনে মোরা ছেড়েছি কার্য।"

এখানে সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর "হিন্দুর ঐক্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনার্যদের প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করেছেন তা আমি যতবার পড়ি ততবার ক্ষুব্ধ বোধ করি। তিনি লিখেছেন: 'দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা কী শারীর-সংস্থানে কী বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের স্বশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্য-সভ্যতার বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম এবং আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে, 'এই বহুদেবদেবী বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধ লোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।' অনার্যরা অর্থাৎ দ্রাবিড়রাও সর্ব বিষয়েই আর্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট একথা রবীন্দ্রনাথ বললেও আমি মানতে বাধ্য নই। এই মতটি আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদজনক বলেই যে শুধু আমার কাছে আপত্তিকর ঠেকে তা নয়, এটিকে বাস্তবিক ভ্রান্ত এবং আর্য অহঙ্কার-প্রসূত বলেই আমার মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে এই আলোচনার অবকাশ নেই।

অনার্য জাতি ও সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যা ধারণা তাতে আর্যদের ভারতে আগমনকে যে তিনি আশীর্বাদ বলে জ্ঞান করবেন এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য সে হল এই যে পরবর্তী আগন্তুকদেরও তিনি অবাঞ্ছিত জ্ঞান করেন নি। তাঁর "ভারততীর্থে"র রচনাকাল ১৩১৭। তার বেশ কিছু কাল আগে থেকেই যে এই ভাবনা তাঁর মনে দানা বেঁধেছে

তার প্রমাণ তাঁর অন্য বহু রচনাতেই ছড়িয়ে আছে। ১৩১১ সালে লিখেছিলেন, 'বিধাতা যেন বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।' এই রাসায়নিক কারখানা ঘরে যে-ভারতবর্ষীয় মহাজাতি তৈরি হয়ে চলেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে তার প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানকেই তিনি সাগ্রহে সাদরে বরণ করেছেন, তাঁর সমসাময়িকেরা অনেকেই যা করতে পারেন নি, আজও অনেকে পারেন না। অধ্যাপক নাগকে লেখা পত্রে তিনি যেন প্রায় হতাশ প্রশ্ন করেছেন যে 'এক-পক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?' কিন্তু এর উত্তরও তো নিজেই দিয়ে রেখেছিলেন আরো ২৪ বৎসর আগেই।

১৩০৫ সালে লেখা "কোট বা চাপকান" প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনো দিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে নাও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে।'

করিতেছে কি? এই "মহৎ স্বার্থ"-টি রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বুঝেছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন তাকে যদি আমরা গ্রহণ করতাম এবং যদি যথার্থই সচেতনভাবে আমাদের চেষ্টা সেই "মহৎ স্বার্থ"-রক্ষায় অনবরত কাজ করত তাহলে সেদিন ভারত-বিভাগের দাবি আর আজ এত রকমের বিচ্ছিন্নতার দাবি এমন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত বলে মনে হয় না। কে কোন্ রাজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে নিরন্তর এই ভয়, আর সংখ্যা-গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক মানচিত্রের রেখাগুলি ক্রমাগত নতুন করে আঁকতে হবে—প্রত্যেকেরই এই নির্বোধ আর আত্মক্ষয়ী দাবি আমরা ঠেকাতে পারতাম যদি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিকে কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করতাম। সং কবি বলেই সমসাময়িক কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠে আত্মানুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি এমন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার থেকে যখন বাঙালি মুসলমান নিরুত্তাপ উদাসীনতায় সরে রইলেন তখনই তাঁর চোখ খুলল। তিনি এই সমস্যাকে তলিয়ে বুঝলেন এবং আর-পাঁচজন হিন্দুর মতোই মুসলমান সমাজকে সুবিধাবাদী এবং আনুগত্যের বিনিময়ে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে বিশেষ প্রশ্রয়প্রার্থী বলে গাল দিলেন না। বরং লিখলেন, 'সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি।'

বরং আমাদের আত্মীয়তার তাগিদটাই যে সুবিধাবাদী ছিল, ভিতর থেকে ভেদবুদ্ধিকে দূর না করে আত্মীয়তার দোহাই পাড়াটা যে ভণ্ডামি—একথা যত অপ্রিয়ই শোনাক, তিনি তো বলতে ছাড়েন নি। বরং প্রায় অভিশাপের ভাষায় বলেছেন, 'এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।' সেই প্রায়শ্চিত্তের সবটুকু যে তাঁকে দেখে যেতে হয় নি এই তাঁর মহাভাগ্য।

মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি যে অসাধারণ কোনো ব্যক্তি ঠিক পথটা যথাসময়ে বাতলে দিলেও সমাজ কেন সে পথে চলতে পারে না? জনতাকে কোনো একটা পথে পরিচালন করার জন্য যে সম্মোহিনী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, হয়ত তা তাঁর যথেষ্ট ছিল না। নয়ত আমাদের দুর্বল স্থান-

গুলি কোথায়, কোথায় আমাদের উপর চোট আসতে পারে এবং সেই চোট ঠেকাবার উপায় কী—সবই তো তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। তবু আমরা সেই চোট ঠেকাতে পারি নি, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। উনি বলেছিলেন, 'বাহির হইতে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না। —আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনা অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারি নি, যেহেতু ভেদবুদ্ধির পাপকেও নিরস্ত করতে পারি নি।

এই ভেদবুদ্ধির পাপ দূর না করেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের খুব সঙ্গত এবং খুব স্পষ্ট আপত্তি ছিল। কারণ ওঁর মনে হয়েছিল যে 'এই কাজটা মূলতবি হয়ে পড়ে আছে শত শত বৎসর ধরে।' আগের কাজ আগে সেরে নেওয়াটাই তাঁর বেশি দরকার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা হাতে-হাতে ফল পেতে চান। দীর্ঘ দিন ধরে সমাজসংস্কারের ধৈর্য তাঁদের থাকে না। তাই তাঁদের যুক্তি ছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়েই এই ভেদবুদ্ধিকেও দূর করা যাবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নামলেই পারস্পরিক অপরিচয়, অবিশ্বাস এবং অন্ধ লোকাচারের বাধাগুলি দূর হয়ে যাবে। এই যুক্তিটাও একেবারে ফেলে দেবার মতন নয়, সে কথা ঠিক। তবে কাছাকাছি এসে হাত মিলিয়ে কাজ করতে নেমে যে আবার আচারের প্রাকারে কঠিন ধাক্কা খাবার আশঙ্কা থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে, একথাও তো ভেবে দেখা দরকার ছিল। 'লোকহিত' করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে কেমন অহিত হত সে কথাও তিনিই বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।' রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলেন যে হিন্দুর কাছে মুসলমান যে অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু যে কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউই ভুলতে পারে নি।

অন্তরে স্বাধীনতার চর্চা করব না, অন্তঃপুরে মেয়েদের স্বাধীনতা দেব না, দেশের এক বিরাট জন-সংখ্যাকে পায়ের তলায় চেপে রাখব অথচ সমাজের ওপর তলার ভদ্রলোকের জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করব, এই আচরণের মধ্যে যে কতখানি অসঙ্গতি আর আত্মবিরোধ রয়েছে তা বার-বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তা ছাড়াও বলেছেন যে দশটি আঙুলকে পরস্পরে সন্নিবদ্ধ করে অঞ্জলি বাঁধার পর যদি কিছু গ্রহণ করা যায় তবেই তা অঞ্জলিতে থাকে নয়ত আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে পড়ে যায়। স্বাধীনতা যদি কেউ হাতে তুলেও দেয় তবু তা আমাদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে যে গলে পড়ে যাবে সেটুকু দেখতে পাবার মতন দূরদর্শিতা তাঁর ছিল।

ভারতবর্ষীয় জাতি বলতে কাকে বুঝব সেই প্রশ্নে আর-একবার ফিরে আসা যাক। আসামে আজ কে ভারতবাসী আর কে ভারতবাসী নয়, তার বিচার করতে বসে অহমিয়াভাষী নাগরিকরা যখন বিভাজন-বর্ষ নিয়ে দরকষাকষি করেন, কিংবা ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে এসেছিলেন তাঁদের যদি-বা ভারতীয় বলে মেনে নিতে রাজি থাকেন তবু ১৯৭১ সালের পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের বিদেশী বলে বহিষ্কার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন আমরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ বোধ করি। কিন্তু সমস্ত কাণ্ডটায় ইতিহাসের যে একটা নিষ্ঠুর করুণ পুনরাবৃত্তি আছে সেটা মনে হয় আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই হয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া

অন্যায় হবে না যে ভারত-ইতিহাসের ধারাতে আগেও অনুরূপ একটি বিভাজন-বর্ষ নির্ধারণ করে রেখেছেন অনেক ভারতবাসী। যে বৎসরে আফগানিস্তানের মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন সেই ১১৮৬ সালটিকেই মোটামুটি এইরকম একটা বিভাজন-বর্ষ জ্ঞান করেন কেউ-কেউ। কেউ বা সেটাকে আরো দেড়শ বৎসর পিছিয়ে দিয়ে গজনীর লুঠেরা সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণের সালটিকেই বিভাজন-কাল ধার্য করেন। অর্থাৎ তারপর থেকে ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে যাঁরা স্থায়িভাবেও এসেছেন তাঁদের যথার্থ ভারতবাসী এবং তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে উপজাত নবসংস্কৃতিকেও ভারতীয় সংস্কৃতি বলে স্বীকার করায় অনেকের মনেই প্রতিরোধ রয়েছে। আমরা অনেকেই যে-ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব করি, যার পুনরুজ্জীবন কামনা করি, সেই ঐতিহ্য এর পূর্ববর্তী কালের। তাই দেখা যাচ্ছে যে কে ভারত-বাসী আর কে ভারতবাসী নয় এবং কে-ই বা এর বিচার করতে অধিকারী, এই মামলার প্রথম স্ব-নিযুক্ত বিচারক কিন্তু আসাম ছাত্রসভাই নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় পুনর্জাগরণের দিনেও এই প্রশ্নের বিচার একবার হয়ে গিয়েছিল। অন্তত কয়েকটি প্রবল কণ্ঠ মুসলমানের বিরুদ্ধেই রায় দিয়ে-ছিল সেদিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রশ্ন করেছেন, 'অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এই কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস।' এবং তারপর একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে 'হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্ম-ঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্মরণ রাখার যোগ্য রবীন্দ্র-নাথের সেই অভিমত যে, 'একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরার' মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ইংরাজ আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না-থাকিবে।' এই দীর্ঘ বাক্যটি একটি দোধারী তলোয়ার। বিচ্ছিন্নতা-বাদী, বিতাড়নবাদী দুই দলকেই দুদিকে কাটে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও ঐ উদ্ধৃত পত্রে বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে' তবু একথা মোটেই সত্য নয় যে এই দুই ধর্মের দূরত্বকে তিনি অসেতুবদ্ধ জ্ঞান করতেন। এই দুই সমাজের মানুষ এত শত বৎসর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে বাস করার পরেও এদের দূরত্ব কেন ঘুচছে না তা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবার বলেছেন যে আর্যরা যে অর্থে বহিরাগত, ইংরেজরা যে অর্থে বহিরাগত, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান তো সে অর্থে বহিরাগত নয়—তাঁরা এই মাটিরই সন্তান, কেবল একটি বহিরাগত ধর্মে দীক্ষিত। এই বহিরাগত ধর্মটি তুলনায় নবীন এবং প্রবল বলে হিন্দুধর্মের উপর এর আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড জোরে। তখন আর-একবার আত্ম-রক্ষার তাগিদে হিন্দু সমাজকে নিষেধের এবং বিদ্বেষের প্রাচীর উঁচু করে গাঁথতে হয়েছিল। হিন্দুধর্মের অসাধারণ গ্রহিষ্ণুতা সত্ত্বেও এই সাত-আট শ বছরে ইসলামকে গ্রাস ও পরিপাক যে করতে পারে নি হিন্দুধর্ম তার থেকে একথাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে দুই ধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক বৈপরীত্য আছে যার নিশ্চিহ্ন মিশ্রণ সম্ভব নয়। তবু সেই প্রাচীর ডিঙিয়েই এবং সেই বৈপরীত্যকে আত্মস্থ করেই কিছু সমন্বয়ের কাজও হয়ে চলেছিল প্রাণের স্বভাবধর্মে।

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন : 'ভারতবর্ষের যখন আত্মরক্ষার

দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। ...ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে...'। এইভাবনাকেই আরো একটু প্রসারিত করে "আত্মশক্তি ও সমূহ"-এ বলেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে তখন এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যেসকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নাই।'

অন্যপক্ষে সমাজের উচ্চতম এবং সচেতন স্তরের জন্য ব্রাহ্মসমাজেরও অনুরূপ একটি ভূমিকা ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। 'ব্রাহ্মসমাজকে তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে নিজেকে উপলব্ধি করবার' জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে 'ব্রাহ্মসমাজের' একটি 'ঐতিহাসিক তাৎপর্য' এই ছিল যে 'মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য' সেই সত্যকে 'ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সঞ্চিত বিপুল যে সাধনা আছে' তারই আত্মীয় বলে প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মসমাজ যে এই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য প্রবল উদ্যমে অগ্রসর হয়ে আসে নি, সেটা আমাদের সবার পক্ষেই এক পরম দুর্ভাগ্য এবং ওই সমাজের পক্ষে তো বটেই। আবার এই সময়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ যতটুকু সুকৃতি পূর্বেই অর্জন করেছিল তাকে মুসলমান সমাজ তো নয়ই, এমন কি হিন্দুসমাজও যে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয় নি, একথাও স্বীকার করা ভালো।

ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের যে বিরাট ভূমিকা হতে পারত, যা হওয়া উচিত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সেটা হয় নি বলেই ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর-এক প্রজন্মকালের মধ্যেই লুপ্ত হবে। যদি না অবশ্য কেউ দাবি করেন যে ইতিপূর্বেই তা হয়ে সেরেছে। এখন যত দিন না হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে ফেলছে ততদিন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় marginal man বা প্রত্যন্তবাসী মানুষ হয়ে থাকতে হবে গুটি কয়েক ব্রাহ্মকে যাঁরা আজও অবশিষ্ট আছেন।

এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি যা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, যেহেতু কথাটা রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি গত বৎসরে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য। বুধবার সকালে মন্দিরে উপাসনার অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলাম—পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে। ছাত্রীবয়সের প্রিয় অতীতকে আর-একবার যতটুকু সম্ভব আস্বাদন করার চেষ্টা আর কী? কিন্তু সেদিন সেখানে যা দেখেছিলাম তাতে একটা কথা আমার মনে এসেছিল। আরো একদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বল্প সার্থকতা ও প্রচুর ব্যর্থতার কথা। সেদিন মন্দিরে বিশ্বভারতীর অধিকাংশ ভবনেরই ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকেরাও অনুপস্থিত ছিলেন। পাঠভবন ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। শুনলাম ঐরকমই নাকি হয় আজকাল। তবে বাংলাদেশের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন—নানা ভবনের। সেদিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মনে হয়েছিল যেন তাঁরা মন্দিরের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বেশ তৃপ্তি পান। তখন হঠাৎ লক্ষ করি যে এই বিগ্রহহীন মন্দিরে যে-ঈশ্বরের উপস্থিতি হিন্দুমনকে যথেষ্ট উজ্জীবিত করে না, সেই উপস্থিতিই ফুল ও ধূপের গন্ধে, আলপনার আভাসে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীতে হয়ত বা আরো পূর্ণতর করে উপলব্ধি করেন মুসলমানেরা। কারণ মুসলমানের নিজস্ব প্রাত্যহিক

ধর্মচর্যা বড়ো নিরলঙ্কার। সেদিন আমার মনে এই ভাবনাটাও জেগেছিল যে ধর্মবোধের দিক থেকে বোধহয় বাঙালি মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের আরো গভীরে গ্রহণ করতে পারবেন, বাঙালি হিন্দুর তুলনায়। দেবেন্দ্রনাথের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির যে অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই অন্তরের ধন হয়ে উঠতে পারছে না, একটা অভাববোধ থেকে যাচ্ছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শান্তিনিকেতনের গা ঘেঁষে অরবিন্দ-নিলয়, সাধুবাবার আশ্রম ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। সাঁইবাবা, মোহনানন্দরাও দূরে নেই বলেই শুনি। অর্থাৎ হিন্দুমনের পক্ষে রাবীন্দ্রিক ধর্মচর্চা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক নয় কিন্তু মুসলমানের মনের কাছে হয়ত বা যথেষ্টর চেয়ে একটু বেশিই তৃপ্তিদায়ক। কথাটা কি ভেবে দেখবার মতন নয়?

হিন্দু-মুসলমানের মিলন অপেক্ষা করে আছে মনের পরিবর্তনের জন্য, যুগের পরিবর্তনের জন্য, এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই—আগেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদটাকে যখন ক্রমে রাজনৈতিক দাবার শতরঞ্জের উপর বিধিমত সাজিয়ে ফেলা হচ্ছিল তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ সুবুদ্ধির দোহাই পেড়ে ধর্মের দোহাই পেড়ে হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাই বলে চলেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল 'রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দরকষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মনকষাকষিকে অত্যন্ত বেশি দূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।' তার পরেও বুঝিয়ে বলেছেন, 'আমার বক্তব্য এই যে উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালিদেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন মিটবে না। এমন কি পলিটিক্সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারে টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে ঐ গোড়ায়, নইলে কিছুতেই কল্যাণ নেই।'

একটা কথা রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন; করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার, যে 'হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

'আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।...'

এই 'বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ'-টিই যে সেই পূর্ববর্ণিত 'মহৎ স্বার্থ' একথা না বলে দিলেও চলে। ধর্মের দেশে ধর্মের ভাষা বলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। 'বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ', Divine will ইত্যাদি ভাষা সম্ভবত জাতীয় সংহতিকে পুষ্ট করার ইচ্ছাকে একটা অলৌকিক শক্তি জোগায়। যাই হোক এই 'নিয়োগের' লক্ষ্যে আছে যুগপরিবর্তন আর উপায় হল মনের পরিবর্তন।

হৃদয়-পরিবর্তনের কাজ নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হয়। আত্মসমালোচনাই আত্মসংস্কারের প্রথম ধাপ। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুসলমানের বিরূপ সমালোচনা যদি বা ক্বচিৎ দেখতে পাই, হিন্দুর সমালোচনা আদ্যন্তমধ্য। এটাকে ধৈর্যের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে গ্রহণ করার মতন মানসিকতা আজও আছে কিনা সন্দেহ—সেদিনও যে বিশেষ ছিল না সে তো বলাই বাহুল্য। তারপর থেকে এত ঘা খেয়েও আমরা যে খুব শিখেছি তা তো মনে হয়

না, বরং অন্য পক্ষকে উচিতমতন শিক্ষা দিতে হবে—এটাই বর্ধিষ্ণু জনমত।

তবু মুসলমানের তুলনায় হিন্দু যে একটু বেশি আত্মসমালোচনা করতে এবং পরের সমালোচনা সহ্য করতে সক্ষম, এটা কখনও কখনও তার স্বঘোষিত শত্রু-ও স্বীকার করেছে। একটা উপাদেয় উদাহরণ পেশ করি। তৎকালীন মুসলিম লীগের একজন প্রথম সারির নেতা, যিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় "ইত্তেহাদ" পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, সেই আবুল মনসুর আহমদ সাহেব গান্ধীহত্যায় এতদূর অস্থির হয়েছিলেন যে হিন্দুদের অত্যন্ত অশালীন ভাষায় গাল দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রফুল্ল সেন মশাই ও আরো বহু হিন্দু নেতা নাকি প্রবন্ধটি পড়ে তাঁকে—মোবারকবাদ—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ফলে এই ভদ্রলোক তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বৎসর" গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিন্দুস্তানে বসিয়া হিন্দুজাতিকে গাল দিয়া সম্মান ও তারিফ পাইলাম। মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিলে তা পাকিস্তানেই হোক আর হিন্দুস্তানেই হোক, মহাত্মাজির পিছে পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইত। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুঝিলাম: হিন্দু-জাতি নীচ বটে কিন্তু নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।' বাঁ হাতে দেওয়া প্রশংসাপত্র অবশ্যই, কিন্তু এই মন্তব্যে মুসলমানের নিন্দা, হিন্দুর নিন্দা এবং প্রশংসা সবই যে অকৃত্রিম—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিরোধের ধার ক্ষইয়ে দেবার জন্য আত্মসমালোচনা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আত্মসমালোচনায় অসাধারণ সৎসাহস ও তীক্ষ্ণ আত্মানুসন্ধান দেখেছি রবীন্দ্রনাথে, তাই তাঁর ছোট একটি বিচ্যুতিরও উল্লেখ করি। "কথা ও কাহিনী"-র 'হোরিখেলা' কবিতাটি আমাকে অল্প বয়সেই খুব বিচলিত করেছিল। শিশুপাঠ্য রামায়ণ-মহাভারতের কল্যাণে এদেশের শিশুরাও তো জানে যে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাহলে রণক্ষেত্রেও কোনো যথার্থ বীর তাকে হত্যা করে না। অথচ যে রাজপুতরা আমাদের বীরত্বের আদর্শ, যে রাজপুত রমণীর অসাধারণ আত্মসম্ভ্রমবোধ তাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করত সেই রাজপুত রমণী কী করে পাঠান কেসর খাঁকে কপট হোলিখেলায় আহ্বান করে সানুচর তাকে এমন ক্রূরভাবে হত্যা করতে পারল? যে-নীতি-বিশুদ্ধ লেখনীর মহৎ সৃষ্টি গুরু গোবিন্দের "শেষ শিক্ষা" কিংবা আখ্যানকাব্য "সতী" কিংবা "গান্ধারীর আবেদন" সেই একই লেখনীর সৃষ্টি এই "হোরিখেলা" একথা ভাবতে ভালো লাগে না। 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিলো সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা'—শেষ পংক্তির এই দীর্ঘশ্বাসটুকুতে ছলনাময়ী আস্থাভঙ্গকারিণীদের প্রতি যথেষ্ট ধিক্কার যে নেই, এতে আমাদের বিচারবোধ আহত হয়, স্বীকার না করে উপায় নেই। সম্প্রতি আরো বিমূঢ় বোধ করলাম শুনে যে এই কাব্যটিকেই জাতীয় সংহতির উপজীব্য হিসাবে নৃত্যগীতসহযোগে পেশ করছেন মমতাশঙ্করের দল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সুবিচার করেন নি সেখানে অপরে কিভাবে অবিচারের কুশাঙ্কুর উপড়ে ফেলবে বুঝতে পারছি না।

যাই হোক, যে কোনো দ্বন্দ্বে আত্মপরনিরপেক্ষ ভাবে সুবিচার করার চেষ্টা থাকলে অন্যপক্ষের উপরেও একটা নৈতিক চাপ পড়ে তার ফলে। তা ছাড়া, প্রথমে নিজেদের সংশোধন করে নেবার পরেই তো বিরুদ্ধ পক্ষের সংশোধন দাবি করতে পারি আমরা। এইরকম একটা মনোভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটা কথাও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল যে, সারা ভারতে হিন্দুই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ, শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠায় বেশি অগ্রসর, অতএব বিরোধ মেটাবার কাজে যদি কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় তবে হিন্দুই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একধাপ এগিয়ে যেতে পারেন। তাই চাকুরির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে প্রচণ্ড কোন্দলের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বলতে পেরেছেন, 'মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন

তবে অবস্থার অসাম্যবশত জাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এত দিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।....কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, তখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব।'

এই ঐক্যের প্রশ্নে আর-একটা কথাও পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বেশ বড় একটা গোষ্ঠী থেকে দাবি উঠেছে যে ভারতীয় ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু হইবে'—এর অর্থ কী? উনিও কি ঐ-জাতীয় দাবিরই প্রবক্তা? অর্থ টা কিন্তু উনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন পরবর্তী বাক্যে: 'তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।' কিন্তু এর আরো একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং সেই ব্যাখ্যা আমরা পাই "আত্ম-পরিচয়" প্রবন্ধে। ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু বলবেন কিনা এই সংশয়ের নিরসন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিন্দু-সমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দু-সমাজের পরিণাম।' তাই রবীন্দ্রনাথের মতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজেরই অঙ্গ। আবার কোনো কোনো প্রসঙ্গে দেখছি 'হিন্দু' এবং 'ভারতবর্ষীয়' তাঁর কাছে সমার্থক—বরং এইভাবে বলা যায় কেবল তথাকথিত হিন্দুই ভারতবর্ষীয় নয়, ভারতবর্ষীয়-মাত্রই হিন্দু। যে অর্থে এককালে মার্কিন দেশে ভারতবর্ষীয় মাত্রই Hindoo বলে পরিচিত ছিল।

নিজের যুক্তির জের টেনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তবে কি মুসলমান বা খৃস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু-সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃষ্টান। খৃষ্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাঁহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব একই পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে। বরঞ্চ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধে।'

আবুল মনসুর সাহেবরা প্রায় এক দশকের মধ্যেই দেশের নব্বই ভাগ মুসলমানকে তাঁদের সর্বনাশা দ্বিজাতিতত্ত্ব লওয়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ যুক্তি এবং তথ্য বিস্তার করেও তাঁর এই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত এক-জাতিতত্ত্ব এমন কি ব্রাহ্মদেরও লওয়াতে পারেন নি—অন্যে পরে কা কথা। তাহলে কোন্ আশায় তিনি সেই পত্রে লিখেছিলেন, 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।' য়ুরোপ যেমন করে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে পড়েছে

সত্যসাধনা এবং জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে, তেমন করে এসেই আমরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারব তাঁর এই ভরসাকে তো য়ুরোপই মিথ্যা—নির্মম মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। আধুনিকী-করণেও নৃশংস ঘৃণার সমাধান নেই, একথা অর্ধ শতাব্দী আগেই তো আমরা দেখেছি। বরং ঘৃণাকে সর্বব্যাপী করা সহজতর হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে। আর সেই ঘৃণার তাণ্ডব কী প্রলয়ঙ্কর হতে পারে আধুনিকতম প্রহরণের সহায়তায়, তাও আমরা দেখে-ছিলাম হিরোসিমা-নাগাসাকিতে।

তাহলে কি বলতে হবে যে সমাজ-পরিবর্তনের কোন্ তত্ত্ব গৃহীত হবে আর কোন্‌টি হবে না তা সেই তত্ত্বের সারবত্তা কিংবা যৌক্তিকতার উপর মোটেই নির্ভর করে না? বরং করে জনমানসের যৌথ প্রবণতার উপরে? কিংবা যে রাজনৈতিক তত্ত্বে কিছু বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে তা যতই কেন ভ্রান্ত হোক, যদি তেমন চিত্তাকর্ষী ভাষায় তাকে পেশ করা যায় তবে তাই দ্রুত জনমানসকে অভিভূত করতে পারে। সম্ভবত বার্ট্রাণ্ড রাসেল মানবচরিত্র বিষয়ে যে নৈরাশ্য-সূচক মন্তব্য করেছেন সেটাই যথার্থ যে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে “sense” বা সুবুদ্ধি যূথবদ্ধ মানুষকে যতটা পরিচালিত করেছে “nonsense” বা নির্বুদ্ধি তার চেয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেক বেশি।

কিন্তু মানুষের সুবুদ্ধির, শুভ-ইচ্ছার উপর আস্থা হারালে, তাকে মঙ্গলের দিকে অনুপ্রাণিত করা যায় এই ভরসা না করতে পারলে, বর্তমানের কারাগার থেকে আমরা উদ্ধার পাব কোন্ পথে? রামজনম-ভূমি আর বাবরী মসজিদের বিতর্ক যদি লাঠি আর ছোরা ছাড়া নিষ্পত্তি না করা যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কিংবা গান্ধীর মতো মানুষের জন্ম তো প্রকৃতির এক নিষ্ফল অর্থহীন কর্ম, নিদারুণ অপচয়।

তন্মাত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুভাষ ঘোষাল

এই না-জানার প্রতিফল কতখানি অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে তার প্রমাণ বহু আগেই পাওয়া হয়ে গেছে। যে বয়সে সাধারণত উপনয়ন হয়ে যায় বাবা সেই বয়সের মধ্যে আমার উপনয়নের কাজটা সেরে ফেলতে পারেন নি। মার যুক্তি ছিল, আমার অন্নপ্রাশনের ব্যাপারটা অত্যন্ত দীনভাবে যেহেতু সম্পন্ন হয়েছিল, উপনয়নের অনুষ্ঠানটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন আছে সেই কারণেই। গুরুত্ব দিতে গেলে অর্থের সক্ষমতা দরকার। বাবার সেই সক্ষমতা যখন এল তখন আমি উপনয়নের সাধারণ বয়স পেরিয়েছি। অসাধারণ বয়সে বাবা অনেক খরচ করে আমার উপনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বিলম্বের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। পিসিমার এই ঘরে যাবতীয় অনুষ্ঠান ঘটে যায়। এই অনুষ্ঠানে আচার্যের ভূমিকায় ছিলেন আমার এক কাকা। তাঁর আরও একটা বলার মতো ভূমিকা ছিল। আমি কোনো হাসপাতালে হই নি। শুনেছি আমাদের দেশের বাড়ির একটা অংশে একটা অনুজ্জ্বল বেষ্টনীর মধ্যে এক নতনেত্র ধাত্রীর সামনে আমি ভূমিষ্ঠ হই। ফলে জন্মসময়জনিত এমন একটা সুযোগের সৃষ্টি হয়, বাবার অনুপস্থিতিতে কাকা আমাকে স্কুলে ভরতি করতে গিয়ে যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এসেছিলেন। তিনি শুধু আমার জন্মবছরটিকে এক বছর এগিয়ে এনেই ক্ষান্ত হন নি, এগিয়ে এনেছিলেন আমার জন্মদিনটিকেও। সতেরোই জুলাইয়ের বদলে নথিবদ্ধ হল পনেরোই অগস্ট। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের কথা আমি অনেক পরে জেনেছিলাম এবং জেনেও এমনভাবে ভুলে গিয়েছিলাম যে তা হয়েছিল না-জানারই শামিল।

সবে উপবীত ধারণ করেছি। মস্তক মুণ্ডিত। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষায় হাজির হবার চিঠি এল এক শিল্পনগরীর

উজ্জ্বল এনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে। ভোরের ট্রেনে উঠে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলাম। মাথায় টুপি ছিল। পরিধানে সাদা জামা, সাদা প্যানট। টুপির রঙ ছিল কালো। গরমে টুপি রাখা যাচ্ছিল না। টুপি খুলে বাইরে পায়চারি করছিলাম। ভেতর থেকে ডাক এলে পরে নিয়েছিলাম টুপি। আমি সত্যিই জানতাম না এই কৃষ্ণতা মাথায় চাপিয়ে ভেতরে যেতে গিয়ে আদতে কোথায় যাচ্ছি। তিনদিকে তিনজন গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। আমাকে বসতে বলা হল। —তোমার নাম কী, কোথায় থাক, এইসব মামুলি প্রশ্নের পর জানতে চাওয়া হয়েছিল পড়াশুনোর বাইরে আমার কী করতে ভালো লাগে। খুব ভয়ে-ভয়ে বলে ফেলেছিলাম, কবিতা লিখতে ভালো লাগে। একজনের সহজ নির্দেশ কানে এল।—মনে থাকলে তোমার স্বরচিত একটা কবিতা শোনাও।—আমি যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম তার পুরোটাই তিনজন খুব শান্তভাবে শুনেছিলেন। সেই বয়ঃসন্ধি-কালে পূর্ণবয়স্কদের সেই সম্মানপ্রদর্শন আজও আমার কাছে দুর্লভ লাগে, আমাকে আজও কৃতজ্ঞ করে তোলে। অতঃপর প্রশ্নরূপে এল বাণ।—তোমার জন্মদিনটা কী কারণে বিখ্যাত বলো তো?—আমি অসহায়ভাবে ভাবতে শুরু করলাম, কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না, সতেরোই জুলাই আবার কী কারণে বিখ্যাত! আমার এই মৌন দেখে বিস্ময়ের মতো কিছু একটা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ঘরে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নন, অন্য একজন শেষে বলে উঠলেন—এ কী, পনেরোই অগস্ট কী কারণে বিখ্যাত বলতে পারছ না! পরমুহূর্তে বলতে পেরে-ছিলাম। কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে।

শহরে ফিরে বাইরের দিক থেকেও এমন একটা অস্থিরতা সূচিত হল যা শুধু বাবাই নন, আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোথায় গেলে শেষ পর্যন্ত কোন্ এক জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায় তা নির্ণয় করার মতো শক্তি আমার ছিল না এবং যাদের নির্ণয় করার মতো শক্তি ছিল তাদের মতামতও আমার কাছে হয়ে উঠছিল অবান্তর। এই পর্বে আমি একটা বছর ব্যয় করি বড়ো-বড়ো কয়েকটা বাড়ির রসায়ন, ভূতত্ত্ব, গণিত আর পরিসংখ্যান বিভাগগুলিতে শুধুমাত্র একের পর এক নাম লিখিয়ে রেখে। নতুন বছরের শুরুতে বন্ধুবান্ধবদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে একসময় বুঝতে পারি সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক উজ্জ্বল শ্রাবণে, পড়ব এই মন নিয়ে শহর থেকে একটু দূরের যে বাড়িতে অর্থনীতিতে নাম লিখিয়ে আসি তা তখনও জল, হাওয়া ও গাছগাছালির অধিকারে।

সেই বাড়িতে কেটে গেছে অন্তত ছ বছর। বারো বছরকে একযুগ ধরলে অর্ধযুগ নিঃসন্দেহে। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন দীর্ঘদেহী। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন একজন অর্থনীতিবিদের নিকটতম সহকারী। তিনি একটা বিশেষ বিষয়ের ওপর বিশেষ ক্লাস নিতেন। তাঁর সেই ক্লাসে তাঁকে বাদ দিলে আর যে দুজন উপস্থিত থাকত তাদের একজন ভূপালী আর একজন আমি। দীর্ঘদেহী অধ্যাপক আমাদের কোনো ক্লাসরুমে নিয়ে যেতেন না। তাঁর নিজের ঘরে তিনি আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকতেন। কোনো-কোনো দিন ভূপালী আমার আগে এসে অধ্যাপকের সামনের চেয়ারে বসে গল্প করত। আমি এলেই তিনি জিজ্ঞেস করে উঠতেন—এবার তাহলে বলি?—আমরা সম্মতি জানালে তিনি বেল বাজিয়ে তিন কাপ কফির জন্য বলে দিতেন। কফি এলে তিনি লম্বা সিগারেট বের করে আমাকে অনেকদিন বলেছেন—কোনো লজ্জা কোরো না। আমি তো তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, ধরো।—তাঁর এই বলে যাওয়া এবং আমার অনিচ্ছপ্রকাশ খুব উপভোগ করত ভূপালী। কফি খাওয়া যতক্ষণ শেষ না হত তিনি পাঠ্যবস্তু থেকে অনেক দূরে থাকতেন। তিনি বহুদিন বহুদূরের ওলন্দাজদের সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছেন। কফির অবসরে তিনি হাসতে-হাসতে এনে ফেলতেন সেইসব

দীর্ঘায়ু সঙ্গতাপ। আমি বহুদিন আগে ক্যামপে যে ডাচ সংগীতের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম, যে সুর গলায় নিয়ে আমরা দলবদ্ধভাবে এগিয়ে গিয়েছিলাম দিগ্-দর্শনের দিকে, সেই সুরের কথা অধ্যাপককে বলে দেবার ইচ্ছে জাগত। প্রবল ইচ্ছের চাপে যেদিন তাঁকে সেই সুরের কথা বলতে বাধ্য হলাম, তিনি তাঁর প্রসারিত করতল আমার করতলে রেখে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমাকে অব্যাহত-ভাবে অনুরোধ করেছিলেন সেই সুরের যেটুকু মনে আছে সেটুকু শুনিয়ে দিতে। তাঁর অনুরোধের অ-কৃত্রিমতা আমার সমস্ত লজ্জাকে হরণ করেছিল। কোনদিনও, বহু লোকের গলার সঙ্গে গলা মেলানো ছাড়া, আমার কোন গান করা ছিল না। কিন্তু সেদিন সবকিছুকে লঙ্ঘন করে ভূপালীর অবাক দৃষ্টির সামনে আমাকে গুনগুন করতে হয়েছিল।

আমরা বিশেষ ক্লাসের পরে নির্বিশেষ ক্লাসে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করতাম। দুজনের বদলে সেখানে অন্তত কুড়িজন উপস্থিত থাকত। কুড়িজনের মধ্যে অন্তত পনেরো জন আমাদের দুজনকে আলাদা-ভাবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। এই বিবেচনার ফলে ব্যবহারিক দিক থেকে আমাকে আর ভূপালীকে মাঝে-মাঝে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হত। যেমন, এক যুবতী অধ্যাপিকা যাঁর গায়ে তখনও ছাত্রজীবনের গন্ধ পাওয়া যেত, তাঁর ক্লাসে কোনো কারণে আমাদের দুজনের একজনও কোন একদিন উপস্থিত না থাকতে পারলে প্রায় সংকটের সৃষ্টি হত। তিনি ভারতীয় অর্থনীতি পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু পড়ানোর থেকে লেখানোর কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অক্লান্ত। তিনি ক্লাসে এসে তাঁর ফাইল থেকে হলুদ-হয়ে-যাওয়া সব সংবাদপত্র বের করে এক-একদিন এক-এক অংশ থেমে-থেমে জোরে-জোরে পড়ে যেতেন। আর আমাদের কাজ ছিল তার সমস্ত উচ্চারণকে খাতায় তুলে-তুলে রাখা। যেদিন আমি ক্লাসে আছি ভূপালী নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণগুলি ভূপালী আমার কাছে থেকে সংগ্রহ করত। ভূপালী ক্লাসে আছে আমি নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণ-গুলি আমি ভূপালীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতাম। কিন্তু ভূপালী নেই আমিও নেই, তাঁর এমন দিনের উচ্চারণগুলি কার কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া যায় এমন এক চিন্তা আমাদের দুজনকেই বিব্রত করে দিয়ে যেত। যার কাছেই খাতা চাইতে যেতাম তার চোখমুখের ভাবে পবিত্রতার অভাব দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। এমনই এক বিস্ময়ের পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে ভূপালী বলেছিল—তুমি একবার সন্ধের দিকে যদি আসতে পার ভালো হয়। খুব ভালো হয়। আজ আসবে?

গিয়েছিলাম সন্ধের দিকে। এর আগে কিন্তু সন্ধের দিকে কখনও যাই নি। এর আগের সমস্ত যাওয়া-গুলিই ছিল, দুপুর ঠিক শেষ হয় নি এবং বিকেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা দুপুরের লেশমাত্র নেই এবং বিকেল আছে পূর্ণমাত্রায়, এমন সব সময়ে। সেই যাওয়াগুলির মধ্যে কখনও থাকত আমার একক অগ্রগতি এবং অদর্শনজনিত ভাবনা—ভূপালী আজ ক্লাসে এল না কেন? কখনও থাকত ভূপালী এবং আমার সমবেত অগ্রসরণ এবং ভূপালীর আশ্বাস,—আমার গতদিনের না আসার ফলে কোনো ক্ষতি হয় নি, ভূপালী ঘর থেকে তার খাতা এনে আমাকে দিয়ে দেবে—এই মর্মে যা বিধৃত। এইসব যাওয়াগুলির ফলে আমার কোনো দেরি হত না। আমি সন্ধের পরেই ভূপালীর কাছে যাবার কথা ওঠায় আমার প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ঠিক করে ফেললাম, এখন বাড়ি ফিরে যাব এবং বিশ্রাম ও জলখাবার গ্রহণের পর হাঁটতে-হাঁটতে লম্বা জলক্ষেত্র ও গাছগাছালির মধ্য দিয়ে আবার ফিরে আসব। যেখানে আমাদের ক্লাসগুলি হত তার খুব কাছে থাকত ভূপালী। শোনা যায়, আজ থেকে একশো বছর আগে কেউ-কেউ মুগ্ধ শ্রোতাদের যে সমুদ্র তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারতেন তাঁদের

বক্তব্য এবং তার জন্য খালি গলাই যথেষ্ট ছিল। বিশ্বাস করি সেইসব জলদগম্ভীর স্বর দ্বারা কলেজের বারান্দা থেকে 'ভূপালী' বলে ডেকে উঠলে ভূপালী তা তার ঘরে বসেই শুনতে পেয়ে যেত। ভূপালীর ঘরে ভূপালী একা থাকত না। তার থেকে কিছু ছোটো এবং তার থেকে কিছু বড়ো মেয়েরা তার ঘরে এবং ঘরে-ঘরে থাকত। সমগ্র যুবতীদের যিনি নজরে রাখতেন তিনি গতযৌবন হলেও অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে আমার অস্বস্তি হত প্রত্যহ। ভূপালীকে বলে রেখে-ছিলাম যাব, তবে সন্ধের দিকে তুমি হসটেলের সামনে পায়চারি কোরো।—সে কথা রেখেছিল। আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছি বাসে এবং বাড়ি থেকে আবার কলেজে গিয়েছি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হেঁটে-হেঁটে। লোক কোনোদিনও আমার মাইল-মাইল হেঁটে যাওয়াকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। তারা বলে এসেছে—এভাবে তুমি সময় নষ্ট কর কেন? —আমি বলে এসেছি—সময়কে কী ভাবে রক্ষা করতে হয় তা জানিয়ে দিতে পারে এমন কোনো মানুষের সঙ্গে আমার আজও দেখা হয় নি। তাই আমার হাঁটার বিরাম নেই। ভূপালী তার ভূমিকাটুকু পালন করে চলে গেছে। কিন্তু আমি আজও মাইলের পর মাইল একা-একা অতিক্রম করি।

সন্ধের ছাত্রীনিবাসে কোনো বন্দনাগান শোনা ভাগ্যের ব্যাপার। ভূপালীকে রুকে বসে থাকতে দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম। সে আমাকে দেখে উঠে এল। —চলো ঘাটের দিকে যাই।—প্রায় বিস্ময়ের মতো বড়ো হয়ে কলেজগণ্ডীর মধ্যে জলাশয় ছিল। তা ব্যবহার যারা করতে চায় তাদের জন্য সুঠাম সোপান ছিল। সোপানের পাশে ছিল বড়ো ছুটি প্রসারণ যেখানে বসে কেউ-কেউ সেরে নিত ব্যক্তিগত কথা-বার্তা। সেখানে যাবার আগে আমি জানতে চেয়ে-ছিলাম কে বন্দনাগান করছে। ভূপালী আমাকে অনুমানশক্তি প্রয়োগ করতে বলেছিল। ফলে আমি ওর যত নিবাসবন্ধু আমার চেনা প্রত্যেকের নাম পরিষ্কার করে উচ্চারণ করে যেতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে, যেসব মেয়ে বহু দূর থেকে পড়তে এসে কলেজের কোলে থেকে যায়, তাদের সব নাম উচ্চারণ করতে-করতে আমি প্রায় দেশকালের একটি নীল দীপশিখার স্পর্শ পেয়েছিলাম।—তোমার কোনও নামই মিলল না। শেষ চেষ্টা করবে নাকি?

—হ্যাঁ। বলব? আমার মনে হচ্ছে কোনো রেকর্ড বাজছিল।

—ধ্যেত, হয় নি। তবে শোনো, তুমি যাকে ভয় পাও সেই সুপারের গলা। হল তো?

যেখান থেকে সোপান নেমে গেছে আমরা সেখানেই মুখোমুখি হয়েছিলাম।

—শোনো, তোমাকে যেজন্য ডেকেছিলাম। স্বরকে যে ডাচ সংগীত শোনালে তার পটভূমি সম্পর্কে কিছু জান? আমার মনে হয় সুরটার মধ্যে একটা মুক্তির ভাব আছে, তাই না?

—বহুদিন আগের ব্যাপার। সব তো ঠিক-ঠিক মনে নেই। তবে এটা জানি ওলন্দাজ মাঝিদের গলায় সুরটা শোনা যেত। তোমার ভালো লেগেছে?

—খুব ভালো লেগেছে। তুমি তো বাড়ি গিয়ে তরতাজা হয়ে এসেছ। এইজন্যই তো সন্ধেবেলায় আসতে বলেছিলাম। আমাকে একটু সুরটা তুলে দিতে হবে।

—তুমি খেপেছ? স্বর অতবার ক'রে বলাতে একবার পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করার চেষ্টা করেছিল। তাই বলে বারবার! শেষে হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

—ঠিক আছে, নালীক, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। তুমি ক্লাসে যা করেছিলে আমি সেটা করার চেষ্টা করছি। তুমি শুনে বলো ঠিক হচ্ছে কি না। যদি ঠিক না হয় তখন তুমি কিন্তু করে দেখিয়ে দেবে।

ভূপালী সেদিন যে সুর শুনিয়েছিল তা নিশ্চয়ই আমার অনুকরণ ছিল না। কিন্তু শিক্ষকের সামনে করা আমার দুর্বল প্রচেষ্টার যেটুকু সার্থকতা, তার সূত্র

ধরে সে পৌঁছে গিয়েছিল তার একান্ত আপন যে দীপ্তি তার মধ্যে। বলা বাহুল্য এই প্রাপ্তির আনন্দে আমি মিথ্যেকে বরণ করে বলতে পেরেছি—একবার শুনে কী করে তুললে তুমি তাই ভাবছি। হুবহু মিলে গেছে। কোনো খুঁত নেই। সুরের পর্ব শেষ হলে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে বাস-রাস্তার দিকে যাচ্ছিলাম। দোতলা বাসের ঊর্ধ্বভাগ দেখা যাচ্ছিল। দোতলা বাসের পেছনে দোতলা বাস। তার পেছনে দোতলা বাস ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ভূপালী হঠাৎ বলেছিল—নালীক, আর-একটা কথা। খুব ছোট্ট ক'রে আমরা একটা পত্রিকা বের করব। তুমি লেখার দিকটা দেখবে, আমি টাকার দিকটা দেখব। বাবাকে আজ রাতেই চিঠি লিখব।

ভূপালীর কাছ থেকে জেনেছিলাম তার বাবা স্বহস্তে গোলাপের চাষ করতেন। জোনাকির বদলে 'খদ্যোত'-শব্দটি ব্যবহার করে তৃপ্তি পেতেন। তাঁর রাত্রিগুলি ছিল জ্যোতিষচর্চায় পূর্ণ। আমি জানি না আমার জন্মসময় কতখানি সঠিক, যদিও বলা হয়ে থাকে মার প্রসববেদনা শুরু হবার পরেই তাঁর কাছে এনে রাখা হয়েছিল ঘড়ি। ভূপালীর অনুরোধে আমি মার কাছ থেকে যে জন্মসময় পাই তা পেয়ে সে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার বাবা আমার সম্পর্কে তার কাছে কী কী লিখেছিলেন জানি না। শুধু জানি ভূপালীর উচ্ছ্বাস। —জান নালীক, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। তোমার রাশি-লগ্ন-নক্ষত্র যা হয়েছে তার সঙ্গে আমার রাশি-লগ্ন-নক্ষত্র একেবারে মিলে গেছে। আমার বৃশ্চিক রাশি, মিথুন লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র। তোমারও বৃশ্চিক রাশি, মিথুন লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র।

—তাতে কী হয়?

—তাতে তুজনকেই একটু সাবধানে থাকতে হয়। বাবাও সেরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন এ কথা বলার পরে ভূপালীর ঈষৎ হাসি কী যে বিশদ হয়ে উঠেছিল তা কেবল জানে যৌবন। কিন্তু জেনেছিল প্রত্যেকে, আমাদের ভাঁজ-করা একফালি পত্রিকাটির সমস্ত ব্যয়-ভার ভূপালী ছাড়া অন্য কেউ বহন করে নি। সেই দীন পত্রিকার সূত্র ধরে আমাদের যেসব অধ্যাপক কবি ছিলেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর শক্তি পেয়েছিলাম। তাঁদের কেউ-কেউ কবিতার সঙ্গে দিয়েছিলেন আগামী বন্ধুত্বের অবকাশ। কেউ-কেউ পত্রিকার দীনতা দেখে চেতনাকে নামিয়ে এনে যা-কিছু দেবার চেষ্টা করেছিলেন তা বড়ো জোর কবির সৌজন্য; কবিতা যে নয় তা অবসরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত ভূপালী। আর আমরা অঙ্গীকার করতাম সৌজন্যপ্রেমীদের কাছে আর কখনও যাব না।

ছাত্রীনিবাসের পাশেই ছিল অতিথিভবন। নানা রঙের অতিথিরা নানা সূত্রে তার ঘরে-ঘরে কদিনের জন্য নিবিষ্ট হতেন। একবার একজন এলেন ভিয়েনা থেকে। তাঁর বড়ো মেয়ের বয়স আটত্রিশ এবং ছোটো মেয়ে যে তখন চৌত্রিশে ছিল তাঁরই বিবৃতি থেকে তা জানতে পেরেছিলাম। তাঁকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করলে তিনি এই বিবৃতি দিতেন। আমাদের ভাঁজ-করা পত্রিকাটি কারও মাধ্যমে তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। তিনি বাঙলা জানতেন না, কিন্তু বাঙলা বিভাগের এক অধ্যাপকের কাছে আমার খোঁজ করলে আমি একদিন সন্ধের পর অতিথিভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাই। অতিথিভবন সাধারণত সুশান্ত থাকত। আর সন্ধের পরে হয়ে যেত একেবারে মনুষ্যরবশূন্য। প্রথমদিন দোতলায় উঠে বুঝতে পেরেছিলাম এক-একটা ঘর ভিতর থেকে রুদ্ধ আর প্রজ্বলিত হলেও কী আশ্চর্য শ্রম আর মগ্নতার মধ্যে আছে। ভয়ে-ভয়ে একটির পর একটি দরজার সামনে উঁকি মেরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজার ওপরে আমি যে সংখ্যাটি চাইছিলাম তা ছিল একেবারে শেষে। শেষ দরজায় করাঘাত করলে দরজা খুলে যেতে একটু সময় নিয়েছিল। মুক্ত দরজার সামনে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর নীচের দিকে একটা ছোটো প্যানট, আর ওপরের দিকটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল করাঘাতের পর তাকে কোনোমতে আবৃত করা হয়েছে।

আমি তাঁর আহ্বানে উপবিষ্ট হলে তিনি পুনঃপুন জানিয়েছিলেন আমাদের গ্রীষ্ম তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি জামা খুলে ফেলে ঊর্ধ্ব অনাবৃত রাখলে আমি যেন কিছু মনে না করি। সেই দীর্ঘদেহী ভিয়েনাপুরুষ একসময় শুধুমাত্র ছোটো প্যানট শরীরে রেখে আমাকে ঠাণ্ডা কফি করে দিয়েছিলেন। আমার কাপে নয়, তাঁর নিজের কাপে চামচের পর চামচ চিনি ঢালতে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, এত চিনি কি বহুমূত্ররোগ নিয়ে আসে না? তাঁর জবাবে দৃঢ়তা ছিল। তিনি বলেছিলেন, চিনি বহুমূত্র আনে এ কথা ঠিক নয়, তবে বহুমূত্র এসে গেলে চিনি নিষিদ্ধ। অপর্ণা এবার যে সমুদ্রতটে গেছে তার থেকে একটু দূরে এমন একটা পথ আছে যার দুধারে যারা বসে-বসে ভিক্ষে চায় কিংবা রিকশার সঙ্গে দৌড়তে থাকে যারা ভিক্ষে পাবার আশায়, তাদের অনেকেরই হাতে পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো এবং কেউ-কেউ হারিয়েছে একাধিক আঙুল। যতবারই সেই পথ দিয়ে গেছি ততবারই এমন এক ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অঙ্গ-হারানো সব দৃষ্টি। এই পুরুষ ভিয়েনা থেকে একটু দূরে সেইসব দৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে-করতে অর্জন করেছেন চিকিৎসক হিসেবে এমন সুনাম যা শুধু আর আঞ্চলিক থাকতে পারে নি। তিনি অতিথিভবনে সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে এসে আমার মতো অর্বাচীনকেও বাদ দেন নি। প্রথম দিনই আমাকে স্মৃতি থেকে স্বরচিত কবিতা বলতে হয়েছিল। আর তিনি একটা জটিল টেপ চালিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর ঘর থেকে বেরোলে ঘর আবার ভিতর থেকে রুদ্ধ হল। আর তখনই সমস্ত রুদ্ধ এবং প্রজ্বলিত ঘরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিলাম। বাঁদিকে ছাত্রীনিবাসের একটি অংশ জ্বলজ্বল করছে। সেখানে বহু জানলা তখনও উন্মোচিত হয়ে আছে। তারই একটা জানালার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ভূপালী ঘরের মধ্যে আমার দিকে পিছন রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বনিগরিমার অজানা শক্তি আমার গলায় মিয়ে এসে একবার 'ভূপালী'—এই ডাক ছাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভব হয় নি ডাকা। কারণ সারি-সারি সারস্বত যে নীরবতা তার মধ্যে এমন একটা নিষেধ ছিল যা আমি শুনতে পেয়ে যাই। আমাদের কলেজ-জীবনের একেবারে শেষদিকটাতে আসন্ন পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে বিভাগীয় প্রধান মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে তাঁর বাড়ি যাবার জন্য বলেছিলেন। আমরা যেতাম। তাঁর বাড়ি, আমার বাড়ি কিংবা ভূপালীর নিবাস থেকে একেবারে অন্যদিকে ছিল। দুজনের পক্ষে সুবিধেজনক একটা জায়গায় মিলিত হয়ে হাঁটতে শুরু করতাম। বেশ খানিকটা হাঁটতে হত আমাদের। এই সময়ে ভূপালীকে অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হত। কিন্তু আমাদের বাড়ির কথা ভেবে কোনো কথাই বলার মতো উৎসাহ কোনোদিক থেকে পেতাম না। বাবা বাজার যাবার সময় এবং বাজার থেকে ফিরে এসে থলি হাতে করে অবিশ্বাসের সঞ্চার করতেন। আর বুবুন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর নোনাধরা দেয়াল থেকে অবিরাম বালি ঝরছে এবং মেঝেতে বিছানা পড়ছে অপরিণত রাতে। পড়ানোর কাজটুকু হয়ে গেলে বিভাগীয় প্রধান বহু প্রসঙ্গে চলে গিয়ে অন্তত কিছু সময় আমাদের উপহার দিতেন যা ব্যক্তিগত ছিল। তিনি একদিন এমন-কি বুদ্ধের কথা বলেছিলেন। অতিশয় বড়ো একটি ঘরের উজ্জ্বল সব গ্রন্থস্তম্ভ আমাদের পরিপার্শ্বরূপে বিরাজ করত। বিরাজমান সব সম্পদের দ্বারা তাঁর চশমাবিযুক্ত চোখ মাঝে-মাঝে তাঁর বক্তব্যের সহায়ক শক্তি ছিল। তিনি তেমন কোনো সময়ে বলছিলেন—বুদ্ধ নাস্তিক এমন একটা কথা পণ্ডিতরা চালু করে দিয়েছেন। আসলে দেখা গেছে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময়ে যে পরিস্থিতি ছিল সেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে বলতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

ভূপালী আমাদের পরীক্ষার ঠিক আগে বিভাগীয় প্রধানের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একদিন আমার হাত ধরে জানিয়েছিল—তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য, নালীক। —এর পরেই সে অতিকষ্টে তার বক্তব্য রেখে যায় এবং আমি জানতে পারি তার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে এক উজ্জ্বল বিমানকর্মী। পরীক্ষা শেষ হলেই তার বাবা তাকে সেই তরুণ চিকিৎসকের হাতে তুলে দেবার কাজটি মিটিয়ে ফেলবেন। আমি মাথা সোজা রেখে সব কিছু শুনেছিলাম, পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং পেয়েছিলাম মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ভূপালীর সমবেদনা। কিন্তু পাই নি এমন কোনো পথ যা অতীতের পদশব্দদ্বারা অধ্যুষিত না হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলে গেছে সরাসরি।

পড়াশুনোর সরকারি পর্ব শেষ হবার আগেই সেতুবন্ধনের অফিস থেকে বাবা অবসরজীবনের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। প্রচলিত অর্থে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে ভাবগত এবং ভৌগোলিক সব দূরত্ব থাকে আমাদের সেসব দূরত্ব পার হতে হয় নি। আমরা একই বাড়িতে বসে একই শিক্ষকসঙ্ঘের তাপ নিয়ে একদিন স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে কোথায় যাব তা জানতে আমার রাতের পর রাত কেটে গেছে। মাঝে-মাঝে লোভনীয় পদের জন্য লিখিত পরীক্ষায় বসার চিঠি পেতাম দূর-দূর থেকে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম এই শহরের বাইরে কোথাও চলে গিয়ে দাঁড়ানোর মতো যোগ্যতা আমার নেই। চার বর্গমাইল জুড়ে আমার যে মানচিত্র তাকে বিচলিত করার মতো সাহস আমার ছিল না। আমি দূর-দূর থেকে আসা লিখিত পরীক্ষার খামগুলিকে বাবার চোখে যাতে না পড়ে এমন কোনো জায়গায় সরিয়ে রাখতাম। একবার এমন একটা চিঠি এল যা ছুটে গিয়ে বাবার চোখের সামনে ধরা যায় এবং চিঠিটি এসেছে আমার শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে। এক রবিবার সকালে এই চিঠির শক্তিতে বোধহয় শহরের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলাম। বিশাল একটা লাইন অপেক্ষা করছিল। কয়েকটি লিফট ক্রমাগত সচল থেকে লাইন থেকে তুলে আনা পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ তলায় পৌঁছে দিচ্ছিল। সবাই সবচেয়ে ওপরে পৌঁছলে মাইকে বলে দেওয়া হয়েছিল কী করতে হবে এই পরীক্ষায়। এই পরীক্ষায় 'শুরু করো' বললে সঙ্গে-সঙ্গে কাজ শুরু করতে হবে এবং 'থামো' বললে সঙ্গে-সঙ্গে থেমে যেতে হবে, কাজ তখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন। 'শুরু করো' এবং 'থামো'—এই দুটি নির্দেশ মাইকে ঘোষিত হয়েছিল ইংরেজির মাধ্যমে। এই পরীক্ষাটির মুখোমুখি হয়ে আমি হলঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম সবাই দম নিয়ে প্রস্তুত এবং বাঁশি বাজলেই শুরু হবে দৌড়। ওই গতিময় প্রেক্ষাপটে 'শুরু করো' এই নির্দেশ বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার শুরু আসে নি। দৌড়ে গিয়ে সাধারণত যেসব ফিতে ছোঁয়া হয়ে থাকে তার কোনোটিরই রঙ আমি চোখের সামনে আনতে পারছিলাম না। ফলে আমার যেটুকু করে যাবার তা করে যেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'থামো' বলার সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গিয়ে পরিদর্শকের হাতে খাতা তুলে দিয়ে দেখি চারপাশের অনেকেই যাঁরা-যাঁরা খাতা নিয়ে নেবেন তাঁদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে তখনও চলছে। বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে বলেছিলাম—সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। —কিন্তু কয়েক মাস বাদে আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে চিঠি এল—তুমি নির্বাচিত হয়েছ। তোমাকে এবার ডাকতারের সামনে উপস্থিত হতে হবে, দুপুরবেলায়, ওই একই বাড়িতে।

ডাকতার তাঁর ঘর থেকে দূরে গির্জার যে বড়ো ঘড়িটি দেখা যায় আমাকে তার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি চশমার কাঁচ ভালো করে মুছে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে যাব, এমন মুহূর্তে স্বহস্তে জানলা প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই দূরের ঘড়ি আমার কাছে তখনও ঝাপসা ছিল। 'বলুন বলুন

কটা বাজে'—এই কথাটা বলতে-বলতে ডাক্তার ঘরের অন্যদিকে চলে গিয়ে পরবর্তী কোনো পরীক্ষার ব্যাপারে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই সরে যাওয়াটাকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ মনে করে আমি আমার মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়ি থেকে সময় দেখে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমার ওজন নিয়েছিলেন। আমি যখন ওজন-যন্ত্র থেকে নেমে দাঁড়ালাম তাঁর বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল—কী ব্যাপার, কী খাওয়া-দাওয়া করেন? তিনি বিস্ময়ের ঘোর প্রায় বজায় রেখেই আমাকে বলে উঠলেন—একটু প্যানট খুলুন—এ-কথা বলার পর ঘরের অন্যদিকে কোনো কিছু নিয়ে আসার জন্য তিনি সরে গেলে আমি জীবনের অন্যতম বড়ো এক অসহায়তার স্বাদ পেয়েছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল ভূপালী বিমানবন্দরের বিরাট চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে চলে না গেলে আমি কখনোই এই পরীক্ষার মুখোমুখি হতাম না। তিনি একটি বড়ো চামচ নিয়ে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন—কী হল? প্যানট খুলুন, লজ্জার কী আছে। —প্রায় কান্নার মতো ধীরে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। তিনি পরবর্তী অন্তর্বাসও উন্মোচন করার কথা বলেছিলেন। সেটিও বন্ধনমুক্ত হলে সেই বড়ো চামচ দিয়ে আমার অত্যন্ত ব্যক্তিগত দুটি গোলাকার স্থিতি ছুঁয়ে রেখে সরব হয়েছিলেন—ভালো করে জোরে-জোরে কাশুন তো। —আমি তাঁর শেষ নির্দেশ পালন করে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তখন একটিই সংকল্প ছিল। বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে, এবং চৌবাচ্চা ভরে উঠবে একেবারে নতুন জলে। আমি সেই নতুন জলের পাশে দাঁড়িয়ে আবার স্নান করব।

নিয়োগপত্র নিয়ে কোন্ বাড়িতে যাব সেটা আমার একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ যে বহুতল বাড়িটিতে লিখিত মৌখিক ও শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম তার অধীনে দেশের প্রায় সর্বত্র শত-শত বাড়ি আছে। আমি শেষ পর্যন্ত এমন একটা বাড়িতে গিয়ে বসার নির্দেশ পেলাম যা আমার বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। এই শাখা অফিসের তলায় বাজার আছে। এই শাখা অফিসের মধ্যেও যে-সমস্ত কাজ হয়ে থাকে তার মধ্যে বাজারের সমস্ত লক্ষণগুলি আছে। এই অঞ্চলের বহু মানুষ আমাদের কাছে তাঁদের টাকা জমা রেখে চলে যান। আমরা তার জন্য তাঁদের সুদ দিয়ে থাকি। তাঁদের সঞ্চিত টাকা থেকে টাকা নিয়ে আমরা আবার অনেককে টাকা ধার দিয়ে থাকি এবং তার জন্য যে সুদ পাই তা নিঃসন্দেহে আমরা যে সুদ দিয়ে থাকি তার থেকে অনেক বেশি। প্রথমে ঋণী হওয়া আর তারপর ঋণী করা। এই ঋণী হওয়া আর ঋণী করার খেলা দেখতে-দেখতে বহু বছর এখানে কেটে গেল। তবে অফিসটা বাড়ির খুব কাছে হওয়াতে প্রয়োজনে যখন-তখন যে-কেউ চলে আসতে পারে। এই তো সেদিন অপর্ণা এসেছিল জয়ের হাত ধরে। আমি কাউনটারে বসে যে-কোনো মানুষের অপেক্ষা করছিলাম। অপর্ণা কাউনটারের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখে একটু লজ্জার ভাব ছিল। —কী ব্যাপার, তুমি?

—মাম্পি প্রচণ্ড বায়না ধরেছে, আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো, বাবাকে দেখব। ভোলানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিছুতেই ভোলাতে না পেরে নিয়ে এসেছি।

—কই, মাম্পি কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

অপর্ণা হেসে উঠল।—মাম্পিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই না মাম্পি?

অপর্ণা কাউনটারের সান্নুদেশ থেকে এবার ওকে কোলে তুলে নিলে আমরা একে অপরকে দেখতে পেলাম।—হল তো, বাবাকে দেখলে। এবার বাড়ি চলো।

কিন্তু জয় তখনই চলে যেতে রাজি নয়। সে কাউনটার পার হয়ে আমার কাছে চলে আসতে চায়। এই অবস্থা সামলে নিতে আমি আমার জায়গা থেকে উঠে পড়ে পেছন দিয়ে ঘুরে অপর্ণার কাছে গিয়ে জয়কে কোলে তুলে নিই। কিন্তু সে কিছুতেই বাড়ি যাবে না। তার আসল কথা, সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে বাড়ি যাবে। শিশুদের ভয় দিতে ইচ্ছে করে না। অনিচ্ছার সঙ্গে আমি ওকে কোলে করে অফিসের পাহারায় যে নিযুক্ত আছে তার চেয়ারের কাছে চলে গিয়েছিলাম। তার বন্দুক আর পোশাক জয়কে দেখিয়ে বলেছিলাম—তুমি যদি মার সঙ্গে বাড়ি না যাও ওকে দেখছ তো, ও তোমাকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে দেবে। ওর বন্দুক আছে। আমি তো আর ওর কাছে যেতে পারব না। তখন তুমি কী করবে? তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।

জয় আর দেরি না করে মার হাত ধরে বাড়ির দিকে রওনা হলে সশস্ত্র ছেলেটি হেসে উঠে আমাকে বলল—নালীকবাবু, আমি তো ঘুরে এলাম। কাল ফিরেছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো সেই পরিক্রমায় গিয়েছিলে। সব ভালোভাবে হয়েছে তো?

—অতি চমৎকারভাবে হয়েছে। কোনো অসুবিধে হয় নি। পরে আপনাকে সব বলব।

এই ছেলেটি চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবনপরিক্রমায় যোগদান করেছিল। কোনোভাবেই যাতে ছুটির অসুবিধে না হয় তার জন্য সে বহু আগে থেকে অফিসে ছুটির জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়ে রেখেছিল। মাঝে-মাঝে বসে থাকতে-থাকতে ক্লান্ত হয়ে সে কারও-কারও কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কোনো-কোনো প্রসঙ্গ তুলে কিছু কথা বলতে চায়। আমি হয়তো কাজ করছি, খুব একটা চাপ নেই, কথা বলার মতো অবকাশের তেমন একটা অভাব নেই, সে বসে-বসে সব লক্ষ করে আমার ডানপাশে এসে দাঁড়িয়ে তার বন্দুকটাকে একটু কাঁধ বদল করে ঝুলিয়ে নিল। —নালীকবাবু, আজ লক্ষ্মীবার। লোক কম, দেখেছেন তো? ওঃ, ভালো কথা। আমার গুরুভাইয়ের কাছে আপনি যে বইয়ের কথা বলেছিলেন তা নেই। তবে বিষ্ণুপুরাণ আছে, তাতে চলবে?

—ঠিক আছে সুধীর, যদি দরকার হয় তোমাকে জানাব। তারপর কেমন আছ? অফিস থেকে বাড়িতে গিয়ে কী কর?

—বাড়ি যেতে-যেতেই তো সন্ধে হয়ে যায়। তারপর একটু বিশ্রাম করে দু-তিন বালতি জল টানি। আমার আবার পামপ করতে যত কষ্টই হোক ওই সময় একবার স্নান না করলে চলে না। তারপর চা-টা খেয়ে কোনো-কোনোদিন বাজারে যাই। বাজার যেদিন না যেতে হয় সেদিন একটু বউকে নিয়ে বসি।

লক্ষ করি, এরপরেই সে একটু চুপ করে এবং সামান্য লজ্জায়, হাসিতে দাঁড়ায়।

—বসে কী কর? চুপ করে আছ যে?

—আপনাকে বলা হয় নি, কিছুদিন আগে একটা পুরোনো শ্রীখোল কিনেছি। তাই সময় পেলে বউকে নিয়ে বসে একটু নাম করি।

অফিসে মাঝে-মাঝে বিভিন্ন সূত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকে। যেমন কারো উন্নতি হল। সে চলে যাবার আগে যে টাকা হাসিমুখে দিল তাতে প্রত্যেকেরই পেট ভরে খাওয়া হয়ে যায়। এখানকার অধিকাংশ কর্মচারী পেট ভরে খাওয়া বলতে মাংস-ভাত খাওয়াকেই সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক ব্যাপার মনে করে। যখন এই খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় তখন নিরামিষাশীদের জন্য পাঁচ-ছটি ঠোঙায় মিষ্টির বন্দোবস্ত থাকে। একটি ঠোঙা অবধারিতভাবে সুধীরের হাতে যে তুলে দিতে হবে, এ সকলেরই জানা। আমি নিজে আরও কিছু জানতে পারলাম এবারের অফিস পিকনিকে উপস্থিত থেকে। অফিসের কাছে ঋণী এমন একজনের নতুন বাস নিয়ে যাত্রার কথা ভাবা হয়েছিল। এক ছুটির সকালে বেশ বেলায় যেখানে গিয়ে পৌঁছনো হল তার অনতি দূরে গঙ্গা উদার। যে বাড়িটায় ওঠা হয়েছিল সেই বাগানবাড়ির মালিকের কাছে অফিস ঋণী ছিল। মালিক ভদ্রলোক তাঁর অফিস ছুটি নিয়ে আগের দিন বাগানবাড়িতে চলে যান। আমাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার

জন্য সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রান্নার কাঠ আর জলের সঞ্চয় রেখে পরের দিন সকাল থেকে আমাদের অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সহাস্যে। বাস থামলে জলখাবারের পর্ব শেষ করে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে বেশ কয়েকজন গাছগাছালির ফাঁকে-ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল রান্না যখন প্রায় শেষ তখন তাদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল বিশিষ্ট সব বোতল পাশে রেখে কেউ-কেউ গান গাইছে, কেউ-কেউ অফুরন্ত মনোবেদনায় কাঁদছে, থম মেরে আছে কেউ-কেউ, আর কেউ-কেউ বমিতে ভাসছে। এই শেষের দলটিতে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককেই ধরে-ধরে রন্ধনক্ষেত্রের দিকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। আমি যার চোখেমুখে জল দিয়ে যাকে তুলে দাঁড় করিয়েছিলাম যাকে ধরে-ধরে নিয়ে এসেছিলাম আগুনের খুব কাছে এবং এই নিয়ে আসার পর্বে যার জন্য আমিও নিজেকে কম অসহায় মনে করি নি সে সুধীর আনখশির।

শুধু সুধীরকে কেন, এমন দিন প্রতি সপ্তাহেই অন্তত একবার আসে যখন নিজেকেই ধরে-ধরে এনে অফিসের চেয়ারে বসিয়ে না দিলে চলে না। সাধারণত এসব দিনগুলি সোমবার হয়ে পড়ে। শনিবার অর্ধেক অফিস করে অফিস ছাড়ার পর শনিবারের বেশ কিছুটা এবং রবিবারের পুরোটা মিলে এমন একটা স্বেচ্ছাচারের মধ্যে চলে যায় যে তার প্রভাব সোমবার সকালে দূরে ঠেলে দিয়ে হাসতে-হাসতে এসে কাজে যোগ দেওয়া আমার মতো দুর্বলচেতার পক্ষে আর সহজ থাকে না। সহজ থাকে না শব্দের যে মহামিশ্রণ ঘটতে থাকে তাকে তুচ্ছ করার কাজ। বিদ্যুৎ না থাকলে সিঁড়ির নীচে যে কালো বস্তুটি বসানো আছে তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং তার সেই গর্জন কাচের দরজার ফাঁক দিয়ে ওপরে উঠে এসে প্রতিটি স্নায়ুকে গ্রাস করতে চায়। সহকর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে কথা বলে। যেখানে জমির দাম এবং অবস্থান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে যে কারও সাম্প্রতিক সেতারবাদন নিয়ে মতান্তর হবে না এ কথা কে বলল? মতান্তরের শব্দ হয়। যেখানে গান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেখানে কণ্ঠনালীর অসুখ নিয়ে বাদপ্রতিবাদ ওঠে এবং কণ্ঠনালী থেকে কোনো-কোনো রাতের কণ্ঠলগ্নতায় চলে যেতে কে বলল দেরি হয়? দেরি না হবার শব্দ হয়। এইসব শব্দের পাশে তাচ্ছিল্য প্রকাশের শব্দ হয়। সেইসব শব্দের মধ্যে থাকে যাকে যা শিখিয়ে রাখা হয়েছে তার পরে আর কিছু না থাকার সব ঘোষণা। এ ছাড়াও কিছু-কিছু শব্দ আছে যা একটু অন্যরকমের। সেগুলির সৃষ্টি হয় কোনো-কোনো বহিরাগতের হঠাৎ এসে পড়ার ফলে। এইসব আকস্মিক শব্দের শক্তি কোনো ভাবেই কম নয়।

যেমন একটি মেয়ে প্যানটের কাপড় নিয়ে অফিসের একদিকে বসে পড়ে। তার চারিদিকে অনেক তরুণ দাঁড়িয়ে যায়। সে কাপড় বের করে যায় একটির পর একটি। কেউ-কেউ কোনো-কোনো আকর্ষণীয় কাপড় হাতে করে অফিসের চারিদিকে দেখিয়ে বেড়ায়, মতামত সংগ্রহ করে এবং তেমন হলে মেয়েটিকে কাপড় আর ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। তারপর তিন-চারটি কিস্তিতে দাম পরিশোধের যে সুযোগ আছে সেই সুযোগের তালিকায় সে মেয়েটিকে দিয়ে তার নাম অন্তর্গত করায়।

যেমন একটি ছেলে, স্বহস্তে চানাচুর বানায় বলে যার খ্যাতি আছে, প্রতিটি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার ব্যাগ থেকে সবে হয়তো স্বচ্ছ কাগজে মোড়া চানাচুর বের করেছে, এমন সময় পেছন থেকে কেউ জোরে-জোরে তার গত দিনের চানাচুরের প্রশংসা বা নিন্দা করতে-করতে তার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে এগিয়ে যেতে দেখে আর-একজন চেয়ার থেকেই বলে উঠতে পারে—আজ বাদাম এনেছ তো? আমাকে বাদাম দেবে। যার কাছে ছেলেটি প্রথম থেমেছিল তার কাছে দাবি রাখার জন্য সমস্বরের অভাব হবে

না।—এই যে বিশুদা, একটা প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলুন না। চায়ের আগে এই উপকারটুকু করুন। —যে-কোনো বিশুদারই প্রতিরোধক্ষমতা এই একাগ্র দাবির মুখে ভেঙে যেতে বাধ্য। এবং ভেঙে গেলে কেউ না কেউ বিশুদার নামে ছেলেটির হাত থেকে একটি স্বচ্ছ মোড়ক চেয়ে নিয়ে তার মুখ খুলে দিকে-দিকে বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

কিংবা দেখা যাচ্ছে না, কাউনটারের আড়ালে জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কোথাও বসে আছে এমন কোনো মানুষের অনুকূলে একটি বিবর্ণ আবেদনপত্র আমাদেরই কেউ প্রত্যেকের চোখের সামনে উপস্থিত করে যাচ্ছে।—"পত্রবাহক মূক ও বধির। এই কঠিন সংসারে তাহাকে দেখিবার মতো কেহ নাই। হতভাগ্য আপনাদের কৃপাপ্রার্থী। কৃপাই তাহার একমাত্র সম্বল। অনুগ্রহ করিয়া কিছু সাহায্য করুন।" তখন তাকে খুঁজে বের করে দেখার ধুম পড়ে যায়। কাগজে প্রত্যেকের নাম লিখে তার পাশে অর্থের পরিমাণ লিখে-লিখে যাবার জন্য লোকের অভাব হয় না। একদিকে চেয়ার ছেড়ে উঠে-উঠে গিয়ে মানুষটিকে দেখে আসা, আর একদিকে যে কাগজ নিয়ে ঘুরছে তাকে অর্থের ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বলা বা ঘুরিয়ে 'না' বলার স্বরক্ষেপণ।

কিংবা আমাদের পেছনে আমাদেরই কোনো সহ-কর্মীর সঙ্গে যে সুদর্শন প্রবীণ কথা বলে যাচ্ছেন তাঁরই লেখা একটি আবেদনপত্র প্রত্যেকের সামনে রাখার কাজটি হয়ে গেল যথাযথভাবে। জানতে পারলাম—"আমি একজন চিত্রশিল্পী। কিছুদিন ধরে আমার ডান হাত অসাড় হয়ে পড়ায় আমি আর কোনো রকম কাজ করতে পারছি না। ফলে নিঃস্ব হয়ে পড়ছি। এই দুঃসময়ে আপনাদের যে কোনো-রকম সাহায্য আমার কাছে অমূল্য হবে।" একফালি সাদা কাগজে লিখে-লিখে যে অর্থ সংগ্রহ করছিল সে আমার কাছে এলে আমি দেখলাম বেশ কয়েকটি নামের পাশে 'পারছি না' লেখা রয়েছে। যারা 'পারছি না' লিখেছে তাদের কয়েকজন সমবেত হয়ে চিত্রশিল্পীর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যে কথাই বলুক তার গুঞ্জনশক্তি আছে।

কিছুদিন ধরে এসব আকস্মিক এবং অনিয়মিত শব্দের পাশাপাশি একটা প্রত্যাশিত তথা নিয়মবদ্ধ শব্দ হয়ে চলেছে। সপ্তাহে একবার যার আসার ব্যাপারে কোনোরকম ছেদ পড়ে না সেই তরুণের কাছে থাকে নানা প্রদেশের লটারির টিকিট। সে এসে পড়লে তার চারিদিকে যে ভিড় হয় তা নিশ্ছিদ্র। আগের সপ্তাহে যেসব টিকিট বিক্রি হয়েছে সেগুলির ফলাফল তার নখদর্পণে। মাঝে-মাঝে তাকে জোরে বলতে শুনি তার থেকে টিকিট কিনে যে দু-একজন সস্তা ফল পেয়েছে তাদের অচেনা নাম-ঠিকানা। তার থেকে টিকিট কিনতে-কিনতে কেউ-কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার যে প্রকাশ হয় তা বড়ো মৃদুলতাময় নয়। কেউ-কেউ ক্লান্ত হয়, হতাশ হয় না। তারা একা-একা ছোটো-ছোটো টিকিট আর না কিনে বড়ো টিকিট কিনতে থাকে দলবদ্ধভাবে। ফলে ফলাফল জানার জন্য যে সাধারণ উৎসাহ, তার সঙ্গে এক দল-বদ্ধ এবং অসাধারণ উৎসাহ মিলে প্রায় একটা আলোড়ন হয়ে ওঠে আমারই কোলের কাছে, অখণ্ড এবং মণ্ডলাকারে। আমি প্রায়ই এই প্রবলতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এমন কয়েকটি নীরবতার কথা ভাবতে থাকি যেগুলির মুখোমুখি হয়ে আমি কিছু-ক্ষণের জন্য নিজেকে প্রবল ভাবতে পেরেছিলাম।

[ক্রমশ

কন্নাডা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

এক

কন্নাডা-সাহিত্যবিষয়ক বিস্তৃত ইতিহাসগ্রন্থে কন্নাডা উপন্যাস-সাহিত্যের সূচনায় তিনখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখা যায় : (১) যাদব-রচিত "কলাবতী পরিণয়" (আনুমানিক ১৮১৫), (২) মুম্মুডি কৃষ্ণ-রাজ-রচিত "সৌগন্ধিকা পরিণয়" (১৮২১) এবং (৩) কেম্পুনারায়ণ-রচিত "মুদ্রামঞ্জুষা" (১৮২৩)। তৃতীয় বইখানি সংস্কৃত নাট্যকার বিশাখদত্ত-কৃত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের কাহিনীরূপ হলেও বইটিকে কন্নাডা গদ্যের তথা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়।

তা না হয় হল। কিন্তু মুশকিল এই যে, "মুদ্রা-মঞ্জুষা" কন্নাডা উপন্যাসে কোনো ধারাবাহিকতার সূচনা করতে পারে নি। লক্ষ্মণরাও গদগকর-রচিত "সূর্যকান্ত"-কে (১৮৯২) কন্নাডার প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলে স্বীকার করে নিলেও "মুদ্রামঞ্জুষা"র প্রকাশকাল থেকে সাতটি দশক ধরে দীর্ঘ নীরবতা।

খাপছাড়াভাবে হলেও অনুবাদের কাজ অবশ্য চালু ছিল। ইংরেজি থেকে "পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্" (১৮৪৪) "রবিন্‌সন্ ক্রুসো" (১৮৫৭), মারাঠি থেকে পদমঞ্জীকৃত "যমুনাপর্যটন" উপন্যাস (১৮৬৯), বাঙলা থেকে "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৮৫), অতঃপর তেলুগু ও মালয়ালম্ উপন্যাসের অনুবাদ কন্নাডিগ-দের (কন্নাড-ভাষীদের) গল্পরসপিপাসানিবৃত্তির সহায়ক হয়েছিল।

বঙ্কিমের সুপ্রসিদ্ধ কন্নাড অনুবাদক বি. বেংকটাচার্য (১৮৪৫-১৯১৪) "দুর্গেশনন্দিনী"র ভূমিকায় নভেল কথাটি প্রয়োগ করলেও কন্নাডা ভাষায় নভেল-এর প্রতিশব্দরূপে "কাদম্বরী" কথাটিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক নন, 'কাদম্বরী-কার'।

কন্নাডা অনুবাদসাহিত্যে মারাঠি এবং বাঙলার দানই সর্বাধিক। সেসব কথা ছেড়ে দিলে গঙ্গাধর

তুরমারি-কৃত "বাণ" (১৮৭৫) মুদ্দান্নার "রামাশ্বমেধ" (১৮৯৪), গুব্বি মুরিগারাধ্য-কৃত "শৃঙ্গার চাতুর্যোল্লাসিনী" (১৮৯৬), গলগনাথ (আসল নাম বেংকটেশ তিরকো কুলকর্নী)-কৃত "প্রবুদ্ধ নয়নে" (১৮৯৮) প্রভৃতি বইয়ের মাত্র নামোল্লেখের পরে প্রথম স্মরণীয় বই গুলবাডি বেংকটরায়-রচিত মৌলিক নীতিগর্ভ উপন্যাস "ইন্দিরাবাই" (১৮৯৯)। ধর্মস্থানে দুর্নীতির বিবরণ দিয়ে সংধর্মের বা সত্যধর্মের জয় দেখানো হয়েছে বলে বইখানির আর-একটি নাম "সদ্ধর্মবিজয়"। অতঃপর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বোলার বাবুরায়ের "বাগ্‌দেবী" (১৯০৫), কেরূর বাসুদেবাচার্য-কৃত আদর্শ নারীর চিত্র "ইন্দিরে" (১৯০৮), গলগনাথের "কুমুদিনী" (১৯১৩)।

বি. বেংকটাচার্য বাঙলা থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রমেশ দত্তের যে বইগুলি অনুবাদ করেছিলেন, তার অনেকগুলি কন্নাডার পাঠকসমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ পাঠক বেংকটাচার্যকে অনুবাদক নয়, গ্রন্থকার বলেই মনে করত।

সাহিত্যের দৃষ্টিতে উপন্যাস নামের যোগ্য সর্বপ্রথম গ্রন্থ এম্. এস্. পুট্টাপ্পা (১৮৫৪-১৯৩৩)-কৃত "মাডিদ্দ্লো মহারায়" (যেমন কর্ম তেমনি ফল, ১৯১৫)। বইটির কথাবস্তুর স্থান ও কাল সপ্তমাডি নামক একখানি গ্রাম ও মৈসূর-রাজ তৃতীয় কৃষ্ণরাজ ওডেয়ারের আমল। প্রধান চরিত্র : শিক্ষিত বিদ্বান্ সদাশিব দীক্ষিত, তার বুদ্ধিহীন স্ত্রী তিম্মম্মা, পতিব্রতা পুত্রবধূ সীতাম্মা এবং খলপ্রকৃতির ব্যক্তি অপ্পাজি। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে বইটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কন্নাডা উপন্যাস-সাহিত্যের গোড়ায় তিনটি নাম স্মরণীয় : গলগনাথ, বেংকটাচার

এবং পুট্টাপ্পা।

দুই

এইটুকু ভূমিকার পরে বলা চলে কন্নাডা উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে আজ প্রায় ষাট বছর ধরে। প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক শিবরাম কারন্ত (জন্ম ১৯০২) আজও বেঁচে আছেন এবং এখনও তাঁর লেখনী একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর নতুন উপন্যাসের নাম "নাবু কট্টিদ স্বর্গ" (আমাদের তৈরি স্বর্গ)। এই শিবরাম কারন্তের প্রথম উপন্যাস "দেবদূতরু" বেরোয় ১৯২৮ সালে অর্থাৎ "পথের পাঁচালী" প্রকাশের সমকালে।

অতঃপর কন্নাডা উপন্যাসের আয়ুষ্কাল বোঝাবার জন্য কালানুক্রমিকভাবে কয়েকজন লেখক এবং কয়েকখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৯৩০ "অন্তরঙ্গ" (দেবুডুনরসিংহ শাস্ত্রী) ; ১৯৩২ "মায়ুর" (দেবুডুনরসিংহ শাস্ত্রী) ; ১৯৩৩ "সুদর্শন" ('আনন্দকন্দ' ছদ্মনামধারী বেটগেরি কৃষ্ণশর্মা), "চোমন ডুডি" (চোম নামক ব্যক্তির ঢোল, শিবরাম কারন্ত) ; ১৯৩৪ "বালুরি" (জীবনশিখা, রম্-শ্রী-মুগলি), "জীবনয়াত্রে" এবং "উদয়রাগ" (অনন্তকৃষ্ণ রাও, ১৯০৮-৭১) ; "বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি" (বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, আদ্য রঙ্গাচার্য, সংক্ষেপে শ্রীরঙ্গ, ১৯০৪-৮৪) ; ১৯৩৫ "রাজযোগী" এবং "অশান্তিপর্ব" (আনন্দ কন্দ), "ইজ্জোডু" (বিষম জোড়, বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাক, জন্ম ১৯০৯) সন্ধ্যারাগ (অনন্তকৃষ্ণ রাও) ; ১৯৩৬ "কানুরু সুব্বম্মা হেগ্‌গডিতি" (কে. ভি. পুট্টাপ্পা, সংক্ষেপে কুবেম্পু, ১৯০৪-৮৪)।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ দশকের গোড়া থেকেই কন্নাডা ভাষায় উপন্যাসরচনার ধারাবাহিক যুগ শুরু হল। বস্তুত তিরিশের দশকেই কন্নাডার ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্ফুরণ। এবং ১৯৪৫ সালের মধ্যে প্রায় আশিখানি উপন্যাস প্রকাশিত। সংখ্যার দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক না হলেও কন্নাডা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এই কালসীমার মধ্যেই রচিত। যেমন, শিবরাম কারন্তের "চোমন ডুডি" (১৯৩৩), "মরলিমণ্ণিগে" (মাটির টানে, ১৯৪০),

অনন্তকৃষ্ণ রাও-এর "উদয়রাগ" (১৯৩৪), "সন্ধ্যারাগ" (১৯৩৫), "নটসার্বভৌম" (১৯৪০)। প্রখ্যাত কবি-সমালোচক বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাকের মতে এই যুগটিই (১৯২০-৪৫) আধুনিক কন্নাড সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

কন্নাড কাব্যসাহিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ দুটি নাম: বেন্দ্রে (দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রে, ১৮৯৬-১৯৮২) এবং কুবেম্পু, তেমনি উপন্যাসসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুটি নাম: শিবরাম কারন্ত এবং অনন্তকৃষ্ণ রাও। রচনার পরিমাণ এবং উৎকর্ষ—দু দিক থেকেই এঁরা দুজন কন্নাড উপন্যাসের দুটি স্তম্ভ। পরবর্তী কালের বেশ কিছু লেখককে কারন্ত বা অনন্তকৃষ্ণ রাওয়ের অনুগামী বলা যায়। সর্বাধিক সম্মানিত লেখক অবশ্যই শিবরাম কারন্ত, কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক অনন্তকৃষ্ণ রাও।

তিন

কন্নাড সাহিত্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিকেরা যে তিনটি সাহিত্যিক আন্দোলনের কথা বলে থাকেন, তা হল "নবোদয়", "প্রগতিশীল" ও "নব্য" (আধুনিক)। শিবরাম কারন্ত, অনন্তকৃষ্ণ রাও এবং তাঁদের সমকালীন আনন্দকন্দ (বেটগেরি কৃষ্ণশর্মা), দেবুডু নরসিংহ শাস্ত্রী, শ্রীরঙ্গ প্রভৃতি লেখক কন্নাড কথাসাহিত্যের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন বলে তাঁরা "নবোদয়" কথাশিল্পী বলে পরিচিত।

কারন্ত অবশ্য কোনোদিনই নিজেকে কোনো গোষ্ঠীভুক্ত রূপে চিহ্নিত হতে পছন্দ করেন না। তিনি কর্ণাটককে, বিশেষ করে তাঁর জন্ম-অঞ্চল দক্ষিণ কন্নাড জেলাকে যেমন ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তেমনি তাকে গল্পে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁর রচনার সহজ সাবলীল আন্তরিকতাই তাঁকে কন্নাড উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় করে রেখেছে।

কারন্তের সমকালীন অপর কথাশিল্পী অনন্তকৃষ্ণ রাও—যিনি সাধারণত অ. ন. কৃ. নামেই পরিচিত। সেই অ. ন. কৃ. কিন্তু সাহিত্যজীবন শুরু করার বছর দশেকের মধ্যেই প্রগতিশীল আন্দোলনের আবর্তে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৪৪ সালে সারা-ভারত প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের বেঙ্গলুর শাখার সভাপতি হন। আরও যেসব কথাশিল্পী সেই শাখায় যোগ দিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন তলুকু রামস্বাময় সুব্বারাও (ত. রা. সু., ১৯২০-৮৪), নিরঞ্জন, বসবরাজ কট্টীমণি, অচিক বেংকটেশ, আর. এস্. মুগলি, এম্. ভি. সীতারামায়্য, চন্দ্ররঙ্গ, নাডিগের কৃষ্ণরাও প্রমুখ। প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘে যোগ দিয়ে বামপন্থী আদর্শের প্রভাবাধীন হলেও কালক্রমে অ. ন. কৃ. এই সঙ্ঘের কট্টর মার্কসবাদীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করলে তারা অ. ন. কৃ. আর তাঁর সাহিত্যের উগ্র সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। একদিন যেমন অ. ন. কৃ. "নবোদয়" গোষ্ঠী ছেড়ে নবোদয়-পন্থীদের আক্রমণ করেছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে এখন তিনি তেমনি তীক্ষ্ণ আক্রমণ-এর সম্মুখীন হন।

প্রগতিশীল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে একদল সাহিত্যিক "নব্য" (অর্থাৎ আধুনিক) লেখক বলে আত্মপরিচয় দিতে থাকেন। এই "নব্য" আন্দোলনের প্রথম ফসল বোধকরি শান্তিনাথ দেশাই রচিত উপন্যাস "মুক্তি" (১৯৬১) আর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপন্যাস ইউ. আর্. অনন্তমূর্তির "সংস্কার" (১৯৬৫)। দিনে-দিনে প্রগতিশীল উপন্যাসের পরিবর্তে "নব্য"-পন্থী উপন্যাস রচনার হিড়িক পড়ে গেল।

উল্লিখিত তিনটি আন্দোলনের পার্থক্যের কথা এখানে চুম্বকে বলে নেওয়া যাক। নবোদয় উপন্যাস-এর সমস্যা পারিবারিক, অর্থাৎ সেগুলি মূলত গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। প্রগতিশীল উপন্যাসের সমস্যা সামাজিক এবং নব্য উপন্যাসের সমস্যা বৈয়ক্তিক (ব্যক্তিগত)। ফলে নব্য উপন্যাসের নায়ক বড়ো বেশি অন্তরমুখী, বড়ো বেশি আত্মকেন্দ্রিক।

এই ত্রিবিধ আন্দোলনের ভিত্তিতে কন্নাড

উপন্যাসের শ্রেণীবিভাজন অযৌক্তিক না হলেও বর্তমান সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা সে-জাতীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না।

চার

পাঠকসমাজে কন্নাড উপন্যাসের জনপ্রিয়তা শুরু হয় মোটামুটি ১৯৫৫ সাল থেকে। উদ্‌ভবের পর থেকে প্রথম আড়াই দশকে (১৯২০-৪৫) যেখানে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা আশিকেও অতিক্রম করে নি, সেখানে পরবর্তী দশ বছরে পাঁচশো উপন্যাস-এর প্রকাশ নিঃসন্দেহে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন। তবু বলব, বাঙলার সঙ্গে তুলনা করলে কন্নাড উপন্যাসসাহিত্য এখনও শিশুশিল্পের পর্যায়-ভুক্ত।

শিশু কিন্তু আর শিশু থাকছে না, ক্রমশ সে বাড়তির মুখে। পরিসংখ্যান দিয়ে বলা যায়, ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা আশি, ১৯৮৫ সালের সংখ্যা আড়াইশো।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মর্তব্য। কন্নাড ভাষায় মহিলারা যেমন উপন্যাস রচনার কাজে হাত লাগিয়েছেন, এমন আর বোধ করি অন্য কোনো ভাষায় নয়। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত প্রায় দুইশো উপন্যাসের মধ্যে ৬০খানি অর্থাৎ তিরিশ শতাংশ উপন্যাস মহিলাদের রচনা। এর কারণ কী? কন্নাড ভাষায় কথাশিল্প কি এখনও মেয়েদের সূচিশিল্প বলে গণ্য হয়?

সেই কারণেই কিনা জানি না, সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার লাভের ক্ষেত্রে কন্নাড উপন্যাসের স্থান নগণ্য। একটা নির্দিষ্ট কালসীমায় বাঙলায় পুরস্কৃত পঁচিশখানি গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা যখন নয় অর্থাৎ ছত্রিশ শতাংশ, তখন কন্নাড ভাষায় পুরস্কৃত পঁচিশখানি গ্রন্থের মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র তিন অর্থাৎ মাত্র নয় শতাংশ।

এর থেকে দুটি সিদ্ধান্ত করা চলে। কর্ণাটকের জ্ঞানী-গুণী মানুষ এখনও উপন্যাসের প্রতি উদাসীন অর্থাৎ উপন্যাসকে তাঁরা কোনো মহৎ সাহিত্যশিল্প বলে গণ্য করেন না। অথবা এমনও হতে পারে, কর্ণাটকের সাহিত্যপ্রতিভা এখনও আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। বাঙলার পুরস্কৃত প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা যখন চার, কর্ণাটকে পুরস্কৃত প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা দশ। এই তথ্যটুকু থেকেও বাঙলা এবং কন্নাড ভাষার সাহিত্যিক মেজাজের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

পাঁচ

খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার প্রভৃতির ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের স্বতন্ত্র করে দেখানো হলেও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিভাজন অনুমোদনযোগ্য নাও হতে পারে। তবু যে কন্নাড ভাষার মহিলা-ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে পৃথকভাবে দু-একটি কথা বলা হচ্ছে তার কারণ তাঁদের রচনাগৌরব নয়, তাঁদের সংখ্যাগত গুরুত্ব। আর, কে না জানে এ যুগটা সংখ্যাতত্ত্বেরই যুগ।

কন্নাডার প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা-ঔপন্যাসিক ত্রিবেণী (১৯২৮-৬৩)। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি লিখতে শুরু করেন এবং দশ বছরে তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা কুড়ি। স্বভাবতই তাঁর উপন্যাসের মুখ্য বিষয়বস্তু নর-নারীর দাম্পত্য জীবন। অন্তরের ঐশ্বর্য, সমভাবাপন্ন স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের মাধুর্য বার-বার তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে। পুরুষের প্রেম এবং মাতৃত্বের আনন্দলাভের জন্য নারী-চিত্তে যে কী গভীর আকাঙ্ক্ষা, সে কথা তিনি নারীর দৃষ্টি দিয়ে নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে ত্রিবেণীর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে "বেঙ্কিন কণ্ণু" (বিড়ালের চোখ) এবং "শরপঞ্জর" (শরের পিঞ্জর) উপন্যাস দুটিতে। মনুষ্যপ্রকৃতি এবং মনুষ্যচরিত্রে তাঁর

প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাই ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত "হণ্ণেলে চিগুরিদাগ" (শুক্‌নো পাতা মুঞ্জরে) নামক শেষ উপন্যাসে। এই গ্রন্থের বৃদ্ধরায় চরিত্রটি কন্নাডা উপন্যাসজগতের একটি অপূর্ব সৃষ্টি বলে বিবেচিত। ত্রিবেণীর সৃজনীশক্তি যখন নতুন পথের সন্ধানে রত তখনই তাঁকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হল।

ত্রিবেণীর পরে যে-সমস্ত মহিলা উপন্যাস রচনায় এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের পরিচয়-দান দূরের কথা, নামের তালিকা রচনাও দুঃসাধ্য। বেঙ্গলূরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কন্নাডা সাহিত্যের ইতিহাসের দশম খণ্ড "হোসগন্নড সাহিত্য" (নবীন কন্নাডা সাহিত্য, ১৯৭৬) গ্রন্থে এল্‌. এস্‌. শেষগিরি রাও জানিয়েছেন, গত দুই দশকে প্রায় একশোজন মহিলা উপন্যাস রচনায় হাত লাগিয়েছেন। খবরটা প্রায় অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! সাধারণত পারিবারিক জীবনই এঁদের রচনার কথাবস্তু। সমালোচকদের চোখে সেই-সব রচনার সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, কোনো-কোনো ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছেন। যেমন "তুঙ্গভদ্রা", "গেজ্জে পূজে" (নূপুর পূজা)-র লেখিকা এম্‌.-কে ইন্দিরা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপকার অনুপমা নিরঞ্জন, "জীবনজাল"-এর লেখিকা এইচ্‌. এস্‌. পার্বতী, "গ্রামলীলে" গ্রন্থের রচয়িতা সি. এম্‌. জয়লক্ষ্মী দেবী, তাছাড়া এম্‌. কে. জয়লক্ষ্মী, উষাদেবী, বীণা শান্তেশ্বর, নীলাদেবী, এম্‌. সি. পদ্মা, পঙ্কজা, ললিতাম্বা, মল্লিকা, এইচ্‌. জি. রাধাদেবী, কে. আর্‌. পদ্মজে, সি. এন্‌. মুক্তা, বিজয়শ্রী, সুনীতি কৃষ্ণস্বামী, এ. পি. মালতী প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে উষাদেবী খ্যাতিলাভ করেছেন "মুডিয়োরদ হূ" (চুল সাজাবার ফুল), "মোগ্‌গিন জডে" (বেলকুঁড়ির ছড়া) প্রভৃতি উপন্যাসে মনের অস্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা ক'রে; "কনসিন কডে" (স্বপ্নের সমাপ্তি) উপন্যাসে হোস্‌টেলবাসিনীদের জীবনকথার শিল্পী এস্‌. কে. জয়লক্ষ্মী নারীসুলভ ভঙ্গিতে বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন; বীণা শান্তেশ্বরের প্রথম দিককার রচনায় পুরুষজাতির বিরুদ্ধে যে উগ্র ঝাঁঝ লক্ষ করা যেত এখন তা অনেকটা প্রশমিত, অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেই নিষ্ঠুর সত্য—'ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে'।

ছয়

সাধারণভাবে বলা যায়, কন্নাডা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ঝোঁকটা প্রবল। গোড়ার দিকে এই ঝোঁকটা অল্পবিস্তর সব সাহিত্যেই থাকে, তবে কন্নাডা সাহিত্যে তার প্রাবল্যটা লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন নি এমন লেখক কন্নাডা ভাষায় মুষ্টিমেয়। লেখকদের কথা বলছি, লেখিকাদের কথা নয়। লেখিকারা বোধ করি পারিবারিক চিত্র রচনার জন্যই বিধিনির্দিষ্ট। লেখকদের দৃষ্টি ইতিহাসমুখী।

এর বিশেষ কারণ কী? আমাদের মনে হয়, এদেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরে কন্নাডাভাষীদের মনে দীর্ঘকাল ধরে এই একটা ক্ষোভ ছিল যে তাদের প্রত্যন্ত প্রদেশের নানা অঞ্চল ভিন্নভাষী বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ভাষা, প্রাদেশিক জাতীয়তা ও অতীত নিয়ে গৌরব করার মতো সবেধন নীলমণি ছিল দেশীয় রাজ্য মৈসূরু (মাইসোর)। কন্নাডিগদের স্বপ্নলালিত নাম কর্ণাটক, তামিলদের যেমন তামিলনাড়ু। ১৯৫৬ সালে দীর্ঘপ্রত্যাশিত কন্নাডাভাষী অঞ্চলগুলির একীকরণ বা সংযুক্তি ঘটে, যদিও সাংবিধানিকভাবে কর্ণাটক নামটি গৃহীত হয় আরও পরে। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে কন্নাডা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯৫৬ সাল একটি বিশেষ স্মরণীয় বছর। তা বলে তাদের উপসংস্কৃতি ও উপজাতীয়তাবোধের অগ্নিশিখা কোনো কালেই নির্বাপিত ছিল না। ১৯৫৬ সালে সেই শিখা নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, এই মাত্র।

উপন্যাস রচনার হাতেখড়ির যুগে রচিত কর্ণাটকের ইতিহাস-আশ্রয়ী প্রথম মৌলিক উপন্যাস গলগনাথের "কুমুদিনী" (১৯১৩)। বিজয়নগরের ইতিহাস নিয়ে তাঁরই লেখা "মাধব-করুণা-বিলাস" (১৯২৩)। প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস দেবুডু নরসিংহ শাস্ত্রী-লিখিত "মায়ূর" (১৯৩২)। কর্ণাটকের কদম্ব-বংশীয় রাজকুমার মায়ুর বর্মাকে নায়ক করে রচিত এই উপন্যাসখানির কথাবস্তু হল: বেদাধ্যয়নের জন্য যুবক মায়ুর বর্মা পল্লবরাজাদের রাজধানীতে গিয়ে কালক্রমে পল্লবরাজকে পরাভূত করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। লেখক বলেছেন, তাঁর এই কাহিনীতে সত্যের চেয়ে মিথ্যার ভাগ বেশি হলেও কন্নাডিগদের দেশাভিমানকে বাড়িয়ে তোলার পক্ষে বইটি খুব সহায়ক হয়েছিল। গ্রন্থকারের এই অকপট স্বীকারোক্তি যে-কোনো ভাষার ঐতিহাসিক উপন্যাসের সততা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করবে।

বাঙলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা নাটক রচনার জন্য বাঙালি লেখকদের নিরুপায় হয়ে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পানজাব প্রভৃতি অঞ্চলের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। কন্নাডা ভাষায় যে সেরকম কিছু ঘটে নি তার কারণ প্রাচীন কাল থেকেই কর্ণাটক নানা ঐতিহাসিকস্মৃতিমণ্ডিত গৌরবের অধিকারী। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতক—এই তিনশতাব্দীব্যাপী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিহাস কন্নাডা লেখকদের সামনে প্রচুর উপকরণ তুলে ধরেছিল। বিজয়নগরের উপর উপন্যাসমালা—সংখ্যায় পনেরোখানি—রচনা করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে রেকর্ড তৈরি করেছেন কোরটি শ্রীনিবাস রাও। বীরকেশরী সীতারাময়্য শাস্ত্রীও ওই একই বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন—"সাম্রাজ্যবৈভব", "ধর্মগ্লানি", "গোলকোণ্ডা-পতন"।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর রায় ও বুক্ক রায় মূলত ছিলেন মৈসূরু-র হোয়সলবংশীয় রাজাদের বেতনভুক কর্মচারী। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ছিল হোয়সল বংশের সমৃদ্ধির কাল। বিষ্ণুবর্ধন (১১১০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর অন্যতম কীর্তি শ্রীবৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তামিলনাড়ুর রামানুজাচার্যকে আশ্রয় দান। হোয়সল রাজ্যের উত্থানপতন নিয়ে উপন্যাস লিখে যশস্বী হয়েছেন তলকু রামস্বাময়্য সুব্বরায় (সংক্ষেপে ত. রা. সু. ১৯২৩-৮৪)। বেশ কিছুসংখ্যক লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিষ্ণুবর্ধনের পত্নী শান্তলাদেবীর নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গের মহিমা। বন্ধ্যা নারী শান্তলা বরমালাকে সপত্নী রূপে এনে দিয়ে পরিশেষে সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নেয়। এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উপন্যাস কে. ভি. আয়ারের "শান্তলা" (১৯৫৪)। সি. কে. নাগরাজ রাও-কৃত "পট্টমহাদেবী শান্তলাদেবী", সমেতন হল্লি রামরায়ের অনুরূপ গ্রন্থ এবং আরও কিছু উপন্যাস কর্ণাটকে শান্তলা-কাহিনীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

শৈবসাধক বসবেশ্বর বা বসবন্নার নেতৃত্বে দ্বাদশ শতাব্দীর কর্ণাটকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তারই সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজজীবনের বিরাট ক্যানভাসে রচিত বি. পুট্টস্বাময়্য-র (জন্ম ১৮৯৭) ঐতিহাসিক উপন্যাস "ক্রান্তি কল্যাণী" (ছয় খণ্ডে)। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাধিকা ও মহিলা কবি অক্কমহাদেবীকে নিয়ে অধ্যাত্মরসমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন এইচ্‌. তেপ্পিরুদ্রস্বামী ("কদলি কর্পূর"), বসবরাজ কটীমণি ("গিরিয় নবিলু" অর্থাৎ পর্বতের ময়ূর) এবং আরও কেউ-কেউ।

কোডগু বা কুর্গ নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সাধারণ কন্নাডিগ থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক হলেও এবং ইংরেজ আমলে কুর্গ পৃথক-শাসিত রাজ্য হলেও কুর্গের কাহিনী কর্ণাটকেরই অংশ। চিক্কবীর রাজেন্দ্র ছিলেন কোডগু বা কুর্গের শেষ স্বাধীন রাজা। কুর্গের রাজপরিবারের এই শেষ প্রতিনিধির নির্বুদ্ধিতার জন্য

শাসনভার ইংরেজদের হাতে চলে যায়। শ্রীনিবাস (মাস্তি বেংকটেশ আয়েঙ্গার ১৮৯১-১৯৮৪)-এর "চিক্কবীর রাজেন্দ্র" (১৯৫৬) উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন কোডগু শাসকবংশের পতন আর ধ্বংসের কথা। ওই একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা নিরঞ্জনের "কল্যাণ স্বামী" কন্নাড়া সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে বিবেচিত। আর-একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ "দুর্গাস্তমন" (চিত্রদুর্গের পতন, ১৯৮৪)। চিত্রদুর্গের পালেগর রাজাদের শেষ প্রতিনিধি মদকরী নায়কের পরাজয় নিয়ে এই অসামান্য উপন্যাসের রচয়িতা চিত্রদুর্গেরই সন্তান ত. রা. সু. (১৯২০-৮৪)। ১৯৮০ সালে "গঙ্গরসর্দুবিনীত" (গঙ্গবংশীয় রাজা দুর্বিনীত) লিখে চমক সৃষ্টি করেছেন সি. এন্. জয়লক্ষ্মীদেবী। যেখানে গার্হস্থ্য উপন্যাস লেখাই লেখিকাদের দস্তুর, সেখানে একখানি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা বিরল ব্যতিক্রম বলেই বিস্ময়কর।

প্রাচীন যুগের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লিখতে গিয়ে কেউ-কেউ আবার ইতিহাসের গণ্ডী পার হয়ে একেবারে পৌরাণিক যুগের আশ্রয় নিয়েছেন। এই ধারার সূত্রপাত করেছেন পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত "মহাব্রাহ্মণ" (১৯৫০), "মহাক্ষত্রিয়" "মহাদর্শন" (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক দেবুড়ু নরসিংহ শাস্ত্রী (১৮৯৫-১৯৬২)। পৌরাণিক চরিত্র নচিকেতা অবলম্বনে লেখা ত. রা. সু.-র. উপন্যাস "বেলকু তন্দ বালক (আলোক নিয়ে আসা বালক)। এস্. এল্. ভৈরাপ্পা-কৃত সুবৃহৎ "পর্ব" (১৯৭৯) গ্রন্থে মহাভারতের কাহিনীকে সামাজিক উপন্যাসের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাত

যাঁরা পরাধীন ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী অথবা যোগদাতা এমন কিছু লেখক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক জগৎ ছেড়ে সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই শ্রেণীর রচনা অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হতে দেখি স্বাধীনতা-লাভের সমকালে অথবা ঈষৎ পূর্ববর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে। ত. রা. সু. র "রক্ততর্পণ", গোরূর রামস্বামী আয়েংগার-কৃত "মেরবণিগে" (শোভা-যাত্রা), এস্. অনন্তনারায়ণ-রচিত "পয়নদ হাদিয়ল্লি" (যাত্রার পথে) এবং "মুরুকু মণ্ডপ" (ভাঙা মণ্ডপ), বেংকটেশ মাধব ইনামদার-কৃত "মুরুবট্টে" (নৈরাজ্য)। তিলকের মৃত্যুদিবস (১.৮. ১৯২০) থেকে স্বাধীনতা-লাভের দিন (১৫.৮.৪৭) পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে "পুরুষার্থ" উপন্যাস লিখেছেন শ্রীরঙ্গ (আদ্য রঙ্গাচার্য)। এসব ছাড়া কুবেম্পু-র "কানুরু সুবম্মা হেগ্‌গডিতি" (১৯৩৬), শিবরাম কারন্তের "মরলিমন্নিগে" (১৯৪০), বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাকের "সমরসবে জীবন" (১৯৫০) প্রভৃতি ক্লাসিক গ্রন্থেও জাতীয় আন্দোলনের কথা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম অধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট অংশ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে উপন্যাস লিখেছেন ভি. এম্. ইনামদার এবং বসবরাজ কট্টিমণি। বাঙলার একটি সমকালীন ঘটনা "পঞ্চাশের মন্বন্তর" আর্. এস্. মুগলি-রচিত "অন্ন"-র (১৯৪৮) মতো চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের প্রেরণা জুগিয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের জাতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বেশ কয়েকখানি উপন্যাস রচিত হয়েছে। ১৯৫০ সালের পরে প্রবীণ লেখকেরাও নতুন ধাঁচে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন, যার বিষয়বস্তু স্বাধীন ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ। অ. ন. কৃ. র "ভূমিতায়ি" (ভূমি-মাতা, ১৯৫৮), "হেগাদরূ বহুকু" (যেমন করে হোক বেঁচে থাকো, ১৯৫৪), ত. রা. সু.-কৃত "এল্লা অবন হেসারিনল্লি" (সব তার নামে) প্রভৃতি উপন্যাস এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। শিবরাম কারন্তের "নাবু কিট্টদ স্বর্গ" (আমাদের তৈরি স্বর্গ)ও তাই—স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতন

চিত্রণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গান্ধীজী ও গান্ধীতত্ত্ব স্বাধীনতালাভের বিশ বছর পরে নতুন প্রজন্মের যুব-মানসে কোন্ রূপে প্রতিফলিত তাই দেখানো হয়েছে শ্রীরঙ্গের "বিষচক্রব্যূহ" (১৯৬৭) উপন্যাসে।

আট

গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষে গ্রামজীবনের চেয়ে নগর-জীবনই যে আনুপাতিক প্রাধান্য লাভ করছে তার কয়েকটি কারণের একটি হল স্বয়ং কথাশিল্পীদের জীবন নগরকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় কারণ নগরজীবনের কলকোলাহলময় হৃৎস্পন্দন গ্রামজীবনে অনুপস্থিত বলে সেখানকার বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি ক্লান্তিকর, পীড়াদায়ক। কারণ আরও আছে, তবু যেসব লেখক তাঁদের সমগ্র রচনায় না হলেও কোনো-কোনো গ্রন্থে গ্রামজীবনকে নতুন করে এবং জীবন্তরূপে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করা দরকার।

কুবেম্পুর "কানুরু সুবম্মা হেগ্‌গডিতি" (১৯৩৬) উপন্যাসে মলেনাড়ু-র (অর্থাৎ পশ্চিমঘাটের) জন-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নিসর্গজীবনের কথা বর্ণিত। অন্যতম প্রগতিশীল লেখক বসবরাজ কট্টিমণির (জন্ম ১৯২১) উপন্যাসগুলিতে গ্রামজীবনের কথা অতি মনোহররূপে উপস্থাপিত। সকালবেলায় দূর-দূর অঞ্চলের পল্লীবাসীরা তাদের গ্রাম্য যানবাহনে এক-এক করে শোভাযাত্রার মতো হাটে-গঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে—সেসব বর্ণনা স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকার মতো। কখনো-কখনো তারাশঙ্করের কথা মনে পড়ে। বসবরাজ গ্রামজীবনকে যে যথার্থরূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যশবন্ত চিত্তল (জন্ম ১৯২৮)-এর জন্ম উত্তর কন্নাড়া জেলার হনেহল্লি গ্রামে। কর্মসূত্রে তাঁকে বোমবাই শহরে বসবাস করতে হলেও তাঁর রচনায় ফিরে ফিরে এসেছে সেই হনেহল্লি গ্রামের কথা, লাভপুর যেমন এসেছে তারাশঙ্করের গল্পে-উপন্যাসে। হনেহল্লি কন্নাড়া সাহিত্যের লাভপুর।

রামজীবনের কাহিনী যেমন রামায়ণ, কর্ণাটকের গ্রামজীবনের কাহিনী তেমনি "গ্রামায়ণ" (১৯৫৭)। এই গ্রন্থের রচয়িতা রাও বাহাদুরের (মৃত্যু ১৯৮৪) প্রসঙ্গ উঠলেই অনিবার্যভাবে "গ্রামায়ণ"-এর নাম উচ্চারিত হবে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে যেমন ওঠে পথের পাঁচালীর কথা। কৃষ্ণানদীতীরবর্তী পদল্লি গ্রামের গেঁয়ো মানুষগুলির অশেষ দুঃখদারিদ্র্য, তাদের মনের ছোটোখাটো আবেগ-আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে মনুষ্যপ্রকৃতির আলো-অন্ধকার এমন অন্তরঙ্গ-ভাবে বর্ণিত যে লেখককে সেই গ্রামেরই একজন বলে না ভেবে পারা যায় না। এই গ্রন্থে চরিত্রসংখ্যা আশির কাছাকাছি, এদের মধ্যে নায়ক-নায়িকা বলে কিছু নেই, সমস্ত গ্রামখানিই যেন নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র।

নতুন লেখকদের মধ্যে গ্রামজীবনের কথা বলা হয়েছে এইচ. এল্. নাগেগৌড়া-রচিত "দোড্ডমণি" উপন্যাসে। উত্তর কন্নাড়া জেলার হনেহল্লি গ্রামের নাম সুবিদিত। সেই জেলারই আর-একটি গ্রামের কথা শুনিয়েছেন আধুনিক কালের অরবিন্দ নাডকর্নী তাঁর "মোহিতঙ্ক" উপন্যাসে। আর দক্ষিণ কন্নাড়া জেলার সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামাঞ্চল অমর হয়ে আছে চিরপল্লীবাসী অথচ কর্ণাটকের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যপুরুষ শিবরাম কারন্তের রচনায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে "মরলি মন্নিগে" (মাটির টানে ১৯৪০) বইটির কথা। "বংশবৃক্ষ" ও "গৃহভঙ্গ"-খ্যাত এস.. এল্. ভৈরাপ্পা-র "দাট্ট" (পার হওয়া, ১৯৭৫) গ্রাম্যজীবনের ছবি হলেও সে গ্রাম জাতিভেদসমস্যায় দীর্ণ। হয়তো বা "দাট্ট"ই ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের খাঁটি চিত্র।

পল্লীজীবনে আধুনিক সভ্যতার পদসঞ্চার বর্ণিত হয়েছে নিরঞ্জন-রচিত "নূরু জট্টু মূরু জডে" উপন্যাসে। কামরূপী-রচিত "কুডুরেবোট্টে" উপন্যাসে একটি পল্লী-গ্রামের যে ছটি পরিবারের কাহিনী বলা হয়েছে, তার

একটি ব্রাহ্মণ পরিবার, দ্বিতীয় পরিবারটির পরিচয়—তারা "ওক্কলিগ" অর্থাৎ অব্রাহ্মণ চাষী।

কেবল ব্রাহ্মণ 'ওক্কলিগ'-দের সম্পর্কের কথাই নয়, ব্রাহ্মণ-হরিজন সম্পর্কের কথাও বলা হয়েছে কন্নাড উপন্যাসে। অস্পৃশ্য হরিজনদের কথা বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম শিবরাম কারন্তের "চোমন দুডি" (চোম নামক ব্যক্তির ঢোল, ১৯৩৩) উপন্যাসে। এম্. ভি. সীতারামায়্য-লিখিত "মাদন মগলু" (১৯৫০) উপন্যাসে অস্পৃশ্যতার সমস্যা আলোচিত। শ্রীরঙ্গ (আত্তরঙ্গাচার্য)-এর "প্রকৃতি" ও "পুরুষ" (১৯৫৬) উপন্যাস দুটিতে অর্ধশতাব্দী কাল ধরে হরিজনদের সমাজ- ও ব্যক্তি-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তারই কথা বর্ণিত। নব্য ভারতের তরুণ অফিসার জনৈক হরিজন যুবকের কথা গভীর আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছে। "প্রকৃতি" উপন্যাসে দেখানো হয়েছে হরিজন আর ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে পরিবর্তনের আভাস।

কেরিজন নয়, গিরিজন (অর্থাৎ পার্বত্য উপজাতি)-দের জীবন নিয়ে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে উপন্যাস লিখেছেন বিন্দুমাধব কুলকর্নী ও ভারতীসুত। কেরল-কর্ণাটক সীমান্তে অবস্থিত উপজাতীয় মানুষ নিয়ে ভারতীসুত লিখেছেন "পুলিয় বোন্থু" এবং "চিত্তরুহাসিগে"। বসবরাজ কট্টীমণি-র "বেলগিন গালি" (ভোরের হাওয়া) উপন্যাসে স্থান পেয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়।

মনুষ্যসমাজের নিম্নতম স্তরে এসে কোনো-কোনো লেখকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেই মানুষগুলির নিত্যসহচর তির্যক প্রাণীদের উপর। শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, তারাশঙ্কর, জয়কান্তন্ প্রমুখ লেখকদেরও দৃষ্টি পড়েছে। কন্নাড উপন্যাসেও ঠাঁই পেয়েছে তির্যক প্রাণীরা। শেষ নারায়ণের (জন্ম ১৯২৭) "কপিলে"-র একটি প্রধান চরিত্র গোরু, "পদ্মরঙ্গ" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটি সাপ, জনার্দন গুরিকরের "দুস্বন নায়ি" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটি কুকুর। কারন্তের "মরলিমণ্ণিগে" উপন্যাসে প্রধান চরিত্র নরনারী হলেও তাদের সঙ্গী হিসাবে গোরু-বাছুরকেও যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

নয়

আঙ্গিকে, বর্ণনারীতিতে, কলাকৌশলে এবং নতুন-নতুন বিষয়বস্তু নির্বাচনে ভারতীয় উপন্যাসে যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে, কন্নাড উপন্যাস তার থেকে দূরে সরে থাকে নি। তারই কিছু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা যাক।

কেবল ঘটনাসংস্থাপন ও চরিত্রসৃজন নয়, আধুনিক উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ। দেবুড় নরসিংহ শাস্ত্রীর "অন্তরঙ্গ" (১৯৩৩) কন্নাড সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। পরে মহিলা ঔপন্যাসিক ত্রিবেণী এই-জাতীয় উপন্যাস রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। "স্ট্রীম অব্ কনশাস্‌নেস্ টেকনিক্", কন্নাড ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রজ্ঞাপ্রবাহতন্ত্র', এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে ত. রা. সু.-র উপন্যাস "বিড়ুগডেয় বেডি" (মুক্তির বেড়ি, ১৯৫৩)। এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে এই 'তন্ত্র' বা টেকনিকের প্রথম আভাস পাওয়া যায় শ্রীরঙ্গ-রচিত "বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি" (১৯৩৪) গ্রন্থে।

অন্যান্য অনেক ভাষার মতো কন্নাড-উপন্যাসেও এক সময়ে আদর্শবাদ প্রচারের প্রতি একটা অতিরিক্ত ঝোঁক লক্ষ করা যেত। প্রথমে বেটগেরি কৃষ্ণশর্মার (জন্ম ১৯০০) উপন্যাসগুলিতে। পরে সেই ধারায় নারীজীবন, পারিবারিক জীবন ও তার আদর্শ নিয়ে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন কৃষ্ণমূর্তি পুরনিক (জন্ম ১৯১১)। কিন্তু এ যুগে আদর্শবাদ যে কতটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে মির্জি অন্নারাও-র (জন্ম ১৯১৮) কিছু উপন্যাসে।

দিল্লী-বম্বে-কলকাতা শহরে দক্ষিণ ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক দেখা যায় আন্ধ্র-কেরল-তামিলনাড়ুর। কর্ণাটকে ভূমির উর্বরতা, লোকসংখ্যার আপেক্ষিক স্বল্পতা অথবা কন্নডভাষীদের অল্প নিয়ে আত্মতৃপ্তি—এইসব কারণে রাজ্যের বাইরে তাদের দৌড়তে হত না। লেখকরাও এক সময়ে নিজেদের রাজ্যেই আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রবাসী কন্নাডিগেরা বেশি সংখ্যায় বোধকরি তাদের নিকটবর্তী শহর বোম্বাইয়ের অধিবাসী। চাকুরিসূত্রে কিছু-কিছু লেখককেও বোম্বাইতে কাটাতে হয়। তাই নগরকেন্দ্রিক কন্নাড উপন্যাসে আজকাল বেঙ্গলুর-মাইসোরের সঙ্গে বম্বে-ও পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প-কারখানাবহুল শহর না হওয়াতে বেঙ্গলুর-মৈসুরের কাহিনী মধ্যবিত্ত জীবন ঘিরেই আবর্তিত। বম্বের পটভূমিতে আঁকা হয়েছে কিছু উচ্চমধ্যবিত্ত অন্তরাষ্ট্রীয় জীবন এবং বস্তিবাসী শ্রমিক-মজুরের সংগ্রামী চিত্র। মোট কথা, কন্নাড উপন্যাসের একটা নতুন locale-রূপে দেখা যাচ্ছে বোম্বাই শহরকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শান্তিনাথ দেশাই-কৃত "বিক্ষেপ" (নিক্ষেপ বা ছুঁড়ে দেওয়া), এ. কে. রামানুজন্-এর "হলদী মীন" (হলুদ মাছ), যশবন্ত চিত্তল-এর "ছেদ", ব্যাসরায় বল্লালের "বণ্ডায়" (বিদ্রোহ, ১৯৮৫)।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে কন্নাড উপন্যাস যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে তা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে। খনি অঞ্চলের জীবনকাহিনী পাই কে. এস্. সীতারামায়্য-র রচনায়; কুর্গের লোকজীবন নিয়ে লেখা গণপতির উপন্যাস "কন্নিকাবেরী"; আঞ্চলিক উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ শিবরাম কারন্তের "বেট্টদজীব" (পাহাড়ের জীব); সমস্যামূলক উপন্যাসের উদাহরণ রঙ্গনাথ শ্রীনিবাসকৃত "অন্না" (১৯৩৮) এবং "কারণ পুরুষ" (১৯৩৯); বিবাহ-বিচ্ছেদ-নির্ভর উপন্যাস অ. ন. কৃ. র "কঙ্কণবাল্লা" (১৯৫৮); দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস ভি. এম্. জোশী-র "সমর সৌদামিনী" (১৯৫৮); অসবর্ণ বিবাহ প্রাধান্য পেয়েছে ভৈরাপ্পা-র "দাটু" উপন্যাসে; ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা আর সেই নিঃসঙ্গ জীবনের ছিন্নমূল রূপ দেখানো হয়েছে এ. কে. রামানুজন-এর "হলদী মীন্" উপন্যাসে; যশবন্ত চিতলের "শিকারী" (১৯৭৯) উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে প্রতিকূল পরিবেশে সামগ্রিক সুস্থরূপে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম; জেলখানার জীবন নিয়ে লেখা অ. ন. কৃ.-র "পাপিয় নেলে" (পাপীর গৃহ, ১৯৫৫); ধর্মান্তর-গ্রহণের ফলে যে সাংস্কৃতিক সংকটের উদ্ভব ঘটে তাকে তুলে ধরেছেন ভৈরাপ্পা তাঁর "ধর্মশ্রী" গ্রন্থে; তিন পুরুষের কাহিনী নিয়ে সাগা (saga) উপন্যাস শিবরাম কারন্তের "মরলিমণ্ণিগে"; স্কুলমাস্টারের জীবনের সুখ দুঃখ বর্ণিত হয়েছে নিরঞ্জন-কৃত "নবোদয়", "দূরদ নক্ষত্র" (দূরের তারা) প্রভৃতি উপন্যাসে; ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে জৈনধর্মের প্রভাব নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন জি. ব্রহ্মাপ্পা এবং এইচ্. পি. নাগরাজয়্য: শিল্পীদের জীবন নিয়ে লেখা অ. ন. কৃ.-র "বন্ধদ বদুকু" (রঙিন জীবন ১৯৫৩) এবং "কট্টিদ বঞ্চ" (১৯৫৭), ভারতীপ্রিয়-কৃত "রূপসম্পিগী", চেন্নবসবপ্পার "কলাপ্রপূর্ণ", এস. এন. মূর্তির "গায়ন চক্রবর্তী"।

দশ

প্রেম, প্রেমের সাফল্য ও পরিণয়, প্রেমের ব্যর্থতা ও বিচ্ছেদের কাহিনী বিবৃত করাই অধিকাংশ উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আপামর পাঠকের পরম তৃপ্তি। নরনারীর এই বিরহ-মিলনের বাইরেও যে বিরাট কর্মময় ও ভাবময় জগৎ রয়েছে সে সম্পর্কে কথা-শিল্পীদের নির্বিকার ঔদাসীন্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠক-দৃষ্টিতে কথাশিল্পকে অশ্রদ্ধেয় করে তোলে। আবার এমন একদল লেখকও আছেন যাঁরা নরনারীর

সম্পর্ককেই উপন্যাসের মুখ্য নয়, একমাত্র প্রতিপাদ্য মনে করে বিকৃত যৌন-লালসার নানারূপ কুৎসিত পসরা সাজিয়ে বসতে গৌরব বোধ করেন। এবং এক শ্রেণীর সমালোচকের বাহবা লাভেও ধন্য হন। সাধারণভাবে এই যখন কথাশিল্পের চরম সত্য, তখন কন্নাডা উপন্যাসেও বা এই সত্যের প্রতিফলন ঘটবে না কেন?

"নবোদয়" ধারার কথাশিল্পী অ. ন. কৃ. যখন প্রগতিশীল কথাশিল্পীর রূপ ধারণ করেন, তখন কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, নর-নারীর সম্পর্ক চিত্রণেও তিনি দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। অবশ্য তাঁর প্রথম উপন্যাসেই ("জীবন যাত্রে", ১৯৩৪) স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ—বিবাহ, বিবাহ-বহির্ভূত যৌন মিলন এবং পতিতাবৃত্তির কথা তিনি বলেছেন। এবং পঞ্চাশ দশকের গোড়ার প্রগতি আন্দোলনের তুঙ্গী অবস্থার দিনে একে-একে বেরোতে থাকে "নগ্নসত্য" (১৯৫০), "শনিসন্তান" (১৯৫১), "সল্লেগলু" (সন্ধ্যার গোধূলি, ১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাস। কী রক্ষণশীল, কী প্রগতিপন্থী সকল শ্রেণীর লেখক সম্মেলনে (১৯৫২) অ. ন. কৃ. পরোক্ষভাবে ভৎর্সিত হন তাঁর উপন্যাসের অমার্জিত প্রকৃতিবাদ ও অসংযত যৌনাকাঙ্ক্ষার জন্য। অ ন. কৃ.-র অনুগামী অন্যতম প্রগতিশীল লেখক নিরঞ্জনও গুরুনিন্দায় অংশগ্রহণ করেন। অ. ন. কৃ. ও তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন "সাহিত্য মত্তু কামপ্রচোদনে" (সাহিত্যও কামোত্তেজনা, ১৯৫২)।

বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা, অ. ন. কৃ. প্রায় চার দশক পূর্বে যে ধারার প্রবর্তন করেন আজও তা প্রবহমান। অনেক খ্যাতনামা লেখকও এই পথে সাহিত্যের পরমার্থ খুঁজে পান। ইউ. আর অনন্তমূর্তির "সংস্কার" (১৯৬৫) ও "ভারতীপুর", লঙ্কেশ-কৃত "বিরুকু" (চিড়/ফাটল, ১৯৬৬), গিরি-লিখিত "গতিস্থিতি" (১৯৭১), চন্দ্ররঙ্গ (জন্ম ১৯১৬)-কৃত "উয়্যালে" (দোলনা, ১৯৬০) এবং "বৈশাখ" (১৯৮১)—এই-সমস্ত উপন্যাসে শক্তির প্রকাশ থাকলেও যৌনতার আতিশয্য সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না—অকাদেমি পুরস্কার পেলেও না।

১৯৭৬ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত কলকাতার এক শরৎস্মরণসভায় "আধুনিক কন্নাডা উপন্যাসে নব্য-ধারা" নামক পঠিত প্রবন্ধে প্রবীণ লেখক শিবরাম কারন্ত পাঁচজন আধুনিক লেখকের পাঁচখানি উপন্যাসের বিশদ আলোচনা করে পরিশেষে মন্তব্য করেন: 'এই উপন্যাসগুলির যুবক-যুবতীদের প্রধান কাজ হল সেক্স্ সম্পর্কে অনর্গল অসংযত সংলাপ ও আচরণ। তারা পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ না হয়ে যৌনসঙ্গমের মজাটুকু ভোগ করতে অভিলাষী।'

সাহিত্যের এ ছবি হয়তো অবাস্তব নয়। কিন্তু এর বাস্তবতা সমগ্র জীবনের তুলনায় কতটুকু?

ভারতে সাম্প্রতিক শেকসপিয়ার-চর্চা

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

বইটি এদেশে শেকসপিয়ার-চর্চা নিয়ে নয়, কিন্তু সংকলিত প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষে এদেশে সাম্প্রতিক শেকসপিয়ার-অনুশীলনের উচ্চমান সুস্পষ্ট। ১৯৮৪ সালের প্রারম্ভে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় এক আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের একটি সুনির্বাচিত সংকলন এটি। একটি বাদে সব প্রবন্ধই ভারতীয় শেকসপিয়ার-বিশেষজ্ঞ বা রসিক বিদ্বজ্জনের রচনা। এঁদের মধ্যে কয়েক জন অপেক্ষাকৃত তরুণ—এও খুবই আশাব্যঞ্জক। পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের সমাবেশ, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রকীর্ণ।

যদিও কোনো একটি নির্বাচিত বিষয় ঘিরে প্রবন্ধগুলি নয়, আলোচনার একটি বিশেষ ঝোঁক বা সাধর্ম্য চোখে পড়ে—শেকসপিয়ারের নাটকের গঠনে 'আইডিয়াজ'-এর ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধিৎসা। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁর সমকালীন চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে সচেতন। শেকসপিয়ারের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনেই প্রয়াসী এই লেখকেরা। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে নাট্যকারের সৃষ্টির সার্থক যোগ প্রতীয়মান হয় একটু সামনে এগিয়ে এসে পরবর্তী কোনো যুগের, বিশেষ করে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর অনুভূতি, চিন্তাপদ্ধতি বা দার্শনিক দৃষ্টি নিয়ে শেকসপিয়ারের কোনো বিখ্যাত নাটক দেখলে। ড. নাগরাজন তাঁর প্রবন্ধে এ যুগের অন্যতম ধর্মচিন্তাবিদ্ শ্রীমতী সীমোন হ্বাইলের চোখে "কিং লীয়র" নিয়ে লিখেছেন সংক্ষেপে। আবার এই নাটকেই ক্ষুদ্র, আপাতসামান্য চরিত্রের ("মিনিমাল ক্যারাকটারস") অর্থপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমতী মলি মাহুড। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, শেকসপিয়ারের যুগেই প্রচলিত চিন্তাধারার যে আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত ছিল, তা থেকে "শ্রাভো"র ধারণা অনুধাবন করেও এই ধরনের চরিত্রের সার্থকতা উপলব্ধি সম্ভব। 'ছায়ানট' শব্দটিতে এই দ্বার্থবোধক পদের ব্যঞ্জনা আছে কিছুটা।

যুগপরম্পরায় একটি কোনো নাটক, যেমন "কোরিয়োলানাস", বিভিন্ন নাট্যকার কিভাবে রূপান্তরিত করেছেন এবং তাঁদের বিভিন্ন প্রয়াসে মূল নাটকের তাৎপর্য কতটা অক্ষুণ্ণ থেকেছে অথবা বিকৃত হয়েছে দেখিয়েছেন সযত্নে শ্রীমতী অঞ্জনা দেশাই তাঁর বিশদ তুলনামূলক আলোচনায়। এই গ্রন্থের যুগসম্পাদক ড. বিশ্বনাথন "উইনটারস টেল" নাটকে মঞ্চোপযোগী কৃত্রিমতার সঙ্গে সাবলীল, স্বাভাবিক প্রাণবন্ত দীপ্তির সহাবস্থান দেখিয়েছেন ব্যাপক উদাহরণ সমেত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই নাটকটি একটি 'লেট পাস্টোরাল'। ওই 'গণ' (genre)-টির উৎকর্ষ সহজ এবং কৃত্রিমের সমাবেশ-সাধনে। ড. বিশ্বনাথন অভিনয়ের বিশেষ একটি অঙ্গ বা ভঙ্গি (জেসচার), হাতধরা (হ্যানডক্লাস্প্) কিভাবে সমগ্র নাটকে, অর্থাৎ তার দুই গোলার্ধে (বোহিমীয় আর সিসিলীয়), রীতি এবং প্রকৃতির (আর্ট অর আর্টিফিস অ্যানড নেচার) মিলন-সাধন করেছে দেখিয়েছেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি টি. এস. এলিয়ট কিভাবে তাঁর সমগ্র কবিজীবনে এবং কবিকৃতিতে শেকসপিয়ারের প্রভাব অনুভব এবং ব্যবহার করেছেন, তাই নিয়ে লিখেছেন শ্রীসুধাকর মারাঠে।

সাহিত্যের রূপায়ণে জীবনের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিক তত্ত্বের প্রাণসঞ্চারী শক্তি আবিষ্কারের

Shakespeare in India. Edited by S. Nagarajan & S. Viswanathan. Oxford University Press. **Rs. 70·00**

একটি সুস্থ প্রবণতা এই সংকলনের প্রথম এবং শেষ দুটি প্রবন্ধে সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি একটিমাত্র নাটকে ("ট্রয়লাস অ্যানড ক্রেসিডা") জীবন বা বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বিধাবিভক্ত রূপ অনুধাবন করেছে। নাটকের গঠনপদ্ধতির বা স্ট্রাকচারাল রিদ্‌ম্‌-এর চাবিকাঠিটি লেখক শ্রীরাজীব পাটকে ধরেছেন একটি দ্বিধায়, আত্মসংশয়ে। তিনি দেখিয়েছেন উৎসের উত্তরাধিকারে, মুদ্রণেতিহাসে, চরিত্ররূপায়ণে, কাহিনীবিন্যাসে, রচনাশৈলীতে একটি ব্যাপক দ্বন্দ্ব, দ্বিধা বা বিরোধ। সব মিলিয়ে নাটকটি যেন নিজেকে নিয়েই দোটানায় পড়েছে—এইভাবে এর হেঁয়ালিকে তুলে ধরেছেন লেখক। শিল্পকৃতির স্বয়ংসচেতনতা, নারসিসাসের মতোই তার আত্মনিবদ্ধ এবং আত্মমগ্ন দৃষ্টি এই প্রবন্ধে এবং ড. বিশ্বনাথনের প্রবন্ধে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু (ফোকল পয়েনট)।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটিতে "ট্র্যাজিক লিবর্টিনস" আখ্যায় অভিহিত করে শেকসপিয়ারের একাধিক সুপরিচিত চরিত্রের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে শেকসপিয়ারের সৃষ্টির উৎকর্ষ ড. সুকান্ত চৌধুরী দেখিয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের এই-জাতীয় চরিত্র-উৎপাদনের তুলনা করে। ড চৌধুরী তাঁর আলোচনার কাঠামো-রূপে বেছে নিয়েছেন ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের অন্যতম প্রশাখা "লিবর্টিনিজ়ম্‌" যার আবির্ভাব, প্রচার এবং সম্প্রসারণ প্রধানত মন্‌টেনের প্রভাবে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই চরিত্রগুলি বিচার করেছেন তার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এইসব চরিত্রের অসংযত এবং অবিরত আত্মতৃপ্তির সাধনা বুর্‌কহার্‌টের সুবিদিত মতবাদ রেনেসাঁস ইনডিভিজুয়ালিজম বা সেলফ-একসপ্রেশনের অনুগামী।

অসংগত হলেও এখানে এতগুলি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত প্রবন্ধের বিষয়ে সামান্য দু-একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের বেশি কিছুর জায়গা নেই। তবু সেগুলি একটু কম খাপছাড়া শোনাবে যদি প্রথমে সামগ্রিক আলোচনার একটি কাঠামো খাড়া করা যায়। বেশির-ভাগ প্রবন্ধেরই বিষয়বস্তু হল শেকসপিয়ারের ট্র্যাজেডিজ বা ট্র্যাজিকধর্মী নাটক। বিভেদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতা—এ সবই ট্র্যাজেডির উপাদান ঠিকই। কিন্তু শেকসপিয়ার সেগুলি ব্যবহার করেছেন তাঁর জীবন-বীক্ষণের বিস্তীর্ণ পটরচনায়; ড জনসনকে অনুসরণ করে বলা যায়, 'for an infinite extension of his design'। প্রথম প্রবন্ধেই কনট্র্যারিনেস বা বৈপরীত্যকে "ট্রয়লাস অ্যানড ক্রেসিডা" নাটকের মূল গঠনরীতি অর্থাৎ বাঁধুনির ভিত্তি (স্ট্রাকচারাল প্রিন্‌সিপল)-রূপে দাবি করা হয়েছে। আলোচনাটি আরো সমৃদ্ধ হত যদি প্রবন্ধকার পাঠকসাধারণকে একটু ধরিয়ে দিতেন রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতায় বৈষম্যের নৈরাজ্য যতই উদ্‌ঘাটিত হবে নাটকের কলাকৃতিতে, ততই তার গৌরব। ঐক্যসূত্রে গ্রন্থনের জন্য নাটকের, বিশেষ করে ট্র্যাজেডির, উপাদান হবে যত বিক্ষিপ্ত, আপাতবিরোধী এবং অন্তর্ঘাতী, ততই তার অবয়ব হবে সম্পূর্ণ এবং সুষমামণ্ডিত। যে মিক্‌স্‌ট্‌ বা 'ডিভাইডেড' মোড অভ কমপোজিশন শেকসপিয়ারের একেবারে নিজস্ব পদ্ধতি-রূপে চিহ্নিত করেছেন ড. জনসন, তাতে অবিরত এবং অনিয়ন্ত্রিত মিশ্রণ ঘটেছে নানা বিরোধের যার অন্যতম হল চরিত্রচিত্রণে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য (ইনডিভিজুয়ালিজম)-এর সঙ্গে প্রচলিত (কনভেনশনাল) লক্ষণসমূহের। পুরাতন অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগের এবং কিছু-পরবর্তী শেকসপিয়ার-সমালোচনার মূল গলদ ছিল এই মিশ্রণকে সুপরিকল্পিত ধরে নেওয়া। যেমন জীবনে তেমনি নাটকে একটি চরিত্রের সমস্ত দোষ আর গুণ মিলিয়ে রূপ পরিগ্রহ করে একটি অখণ্ড আধার যাকে আমরা তার বিশিষ্ট সত্তা বলি। মনস্তত্ত্ব তার নাগাল পায় না। অযত্নপ্রসূত হলেও এই ধরনের চরিত্রের গভীরতা অক্ষুণ্ণ থেকে যায়, তার প্রাণপ্রাচুর্য এতই অসীম। কোনো শিল্পসৃষ্টি বাস্তবানুগ হতেই পারে না যদি শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্রগুলির ফিক্‌শনাল লাইফ (কল্পলৌকিক জীবন) কোনো পূর্বপরিকল্পিত নকশা-মাফিক তিনি পরিচালিত করতে পারেন। সেই চরিত্রচিত্রণে হিসাবমাফিক যে খুঁতই বার করি তা হয়ে ওঠে জীবন্ত। শেকসপিয়ারের বিপরীত গোষ্ঠীর লেখকদের প্রধান দুর্বলতাই হল তাঁদের সৃষ্টিতে জটিলতা এবং অসংগতির অভাব।

তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে শ্রীরাজীব পাটকে জন বার্টনের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করে এই নাটকটির উৎকর্ষ-

প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন, তার গূঢ়তর অর্থ আরো সংক্ষেপে বহু আগে কোলরিজ উদ্‌ঘাটন করেছেন "বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া"-র চতুর্দশ অধ্যায়ে কল্পনাশক্তির বহুশ্রুত বর্ণনায়: '...The poet, described in ideal perfection, brings the whole soul of man into activity'। জীবনে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা-কিছু খণ্ডিত, পরস্পরবিরোধী—সবেরই সহাবস্থান সাধন করেন কবি আমাদের চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে। খণ্ডিত জীবন থেকে কাব্যে উত্তরণ ঘটে সামগ্রিক অনুভূতিতে। ক্ষণিক হলেও এইসব moments of fulfilment-এ প্রাণের আস্বাদবঞ্চিত মানবাত্মা নিখিলের অনুভূতিতে অবগাহন করে। কীটসের ভাষায়, 'that moment have we slept/into a sort of oneness, and our state is like a floating spirit's' (Endymion, I, 795-6)। কাব্যেরই হাতে মুক্তির এই চাবিকাঠি। "ট্রয়লাস অ্যানড ক্রেসিডা" নাটকে ট্রয়লাসের হৃদয়েরই মতো শতধাবিদীর্ণ জীবনের রিক্ততা উদ্‌ঘাটন করতে কবি তাই ব্যবহার করেছেন।

কবিদৃষ্টিতে হোল্‌ এবং পার্ট-এর অর্থাৎ দি ইনডিভিজুয়াল এবং কসমস-এর এই প্রণয়রহস্য বিধৃত আছে নব-প্লেটোনিক সৃষ্টিতত্ত্বে। ফিচিনো-কৃত প্লেটোর "সিমপোজিয়মে"র ভাষ্যে এই ইঙ্গিতটি আছে। যে 'লাভ'-এর উপর স্যাটায়ার এই নাটকে প্রচ্ছন্ন, নব-প্লেটোনিক তত্ত্বে তার শক্তি চরাচর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। নাট্যকারের এই কৃত্রিম জগৎসৃষ্টিতেও তা কার্যকর। নাটকের বিষয়বস্তুতে যে ইনার্‌শিয়া বা জড়তা, তার প্রতিদ্বন্দ্বী এই প্রিন্‌সিপল অভ অরগানাইজেশন যা সততসঞ্চরমাণ (ডাইনামিক)।

এরিক্‌সিমেকসের ভাষণে (থার্ড স্পীচ) আমরা পড়ি:

'Heaven alone is *moved* by an innate love. Heaven, wishing to enjoy the soul revolves, *flying moreover at top speed*, in order to be at every point, exactly at the same moment when the soul is there.'

এইভাবে রেনেসাঁস দার্শনিক চিন্তার একটি মুখ্য প্রবাহে অবগাহন করলে আমাদের দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ হয়। আমরা দেখি, (১) কবির সৃষ্ট জগতের রহস্য সেই প্রিন্‌সিপল অভ অরগানাইজেশন যাকে প্লেটো দেখেছেন তাঁর প্রেমের তত্ত্বে সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী এবং সর্বত্রগামী। প্রতিটি খণ্ডিত অংশে এই অখণ্ডের তাৎক্ষণিক আবির্ভাব; (২) আপাতদৃষ্টিতে যেটি বিষয়—ডিভিশন, ব্যাট্‌ল্‌, কনফ্লিক্‌ট্‌ ইত্যাদি তার বিপরীত এই প্রিন্‌সিপল: ফর্‌ম্‌ এবং ম্যাটার-এর এই পরস্পরপ্রতিস্পর্ধিত্ব সার্থক সৃষ্টির উৎস; (৩) প্রবন্ধের শেষে যদিও এই নাটকের বিভিন্ন ধরনের সাড়া একই সঙ্গে জাগাবার ক্ষমতার কথা আছে, ঝোঁকটা সমগ্র প্রবন্ধে কমপ্লেকসিটির বা জটিলতার উপর যতটা, ইউনিটি বা টোটালিটি অর্থাৎ সামগ্রিক সংহতির উপর ততটা নয়। আসলে ব্যাপারটা একই: কিন্তু ডিসট্রিবিউশন অভ এমফ্যাসিস-এ খানিকটা পার্থক্য এসে যায় দৃষ্টিভঙ্গির। অনুমান হয়, এ যুগের সমালোচনা-সাহিত্যের অন্যতম অবসেশন 'পোয়েটিকস অভ টেনশন'-এর প্রভাব এই ধরনের বিশ্লেষণের পশ্চাতে। তাতে আপত্তি নেই যতক্ষণ 'ডিভিসিভনেস অভ একসপিরিয়নস' শুধুমাত্র উপাদান, অভীষ্টপ্রাপ্তির নিছক উপায়মাত্র—এই চেতনা অবলুপ্ত না হয়। বিভেদ, বিরোধ, সংঘাত প্রাত্যহিক জীবনে আনে শুধুমাত্র ক্ষয় আর অবসাদ, আমাদের দৃষ্টিকে করে ক্ষীণ এবং সংকুচিত। সাহিত্যে তার উন্মোচন আনে দৃষ্টির প্রসার, মহত্তর পূর্ণতার উপলব্ধি। লেখকের একনিষ্ঠ বিশ্লেষণে এই মূল্যবোধ কয়েক সময়ে অন্তর্হিত। দু-একটি উদাহরণ: 'ডিভিসিভনেস'-এর অভিজ্ঞতার বাহক আর যেই হোক, ক্রেসিডা হতে পারে না। শেকসপিয়ারের হাতে এই চরিত্রের প্রকৃত কোনো সূক্ষ্মতা বা জটিলতা নেই। কাজেই III. ii. 144-55 উদ্ধৃত করে লেখক ক্রেসিডার মধ্যে যে দ্বিধা (বীয়িং ইন টু মাইন্‌ড্‌স্‌) প্রদর্শন করেছেন তা এই চরিত্রের আর সব-কিছুর মতো বাহ্য, অগভীর এবং স্বচ্ছ প্রতারণা মাত্র, ট্রয়লাসের মতো মুগ্ধ আত্মপ্রবঞ্চনা একেবারেই নয়।

একই পৃষ্ঠায় (পৃ. ১৩) ওথেলো এবং লেয়নটিসের যে তুলনা করেছেন লেখক বা পরে (পৃ. ১৫) যে ফ্র্যাগমেনটেশনের কথা বলেছেন তাও একটু অস্বস্তিকর এই কারণে যে অন্তত ওথেলোর ক্ষেত্রে এটি একটি আভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের বহিঃপ্রকাশ, পরিপূর্ণ প্রেমের কসমস থেকে সংশয়বিদীর্ণ কেয়স-এ নিমজ্জিত হওয়ার পরিণতি। এই ইমোশনাল পারসপেকটিভ-এর অনুপলব্ধিতে আমাদের বোধও হবে খণ্ডিত, হীনবল।

পৃ ৮-৯-এ লেখক একটি বিশেষ স্ট্রেন-এর ইমেজারি ধরে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন ট্রয়লাস 'speaks of love in terms of buying and selling'। প্রথমেই বলা দরকার, তথাকথিত ইমেজারি ক্রিটিকেরা ইমেজস-এর শ্রেণীবিভাগ করে এক-এক ধরনের পুনরাবৃত্ত ইমেজেস সংগ্রহ করে এর আগে ইউনিটি নিয়ে যা বলেছি তার পরিপূরক সত্যকে দেখতে পান না। নাটকের গঠন, তার সমগ্র সত্তা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, 'যা মনে হচ্ছে আলাদা তা আসলে এক'। এখানে নাটকের অন্যতম কন্‌স্টিটুয়েন্ট্, তার ইমেজারি নিয়ে বলব, এই কলেকটর অভ ইমেজেসকে, 'যা মনে করছ এক, তা কিন্তু আলাদা'। কবিতায় ইমেজেস শব্দ দিয়ে তৈরি হলেও ইমেজেসকে নিছক শব্দ বা শব্দসমষ্টিতে পরিণত করা যায় না। IV-iv. 39-41-এ ট্রয়লাসের যে ভাষণটি উদ্ধৃত করেছেন শ্রীপাটকে :

We two, that with so many thousand sighs
Did buy each other, must poorly sell ourselves
With the rude brevity and dischage of one···

সে বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এবং সেই মন্তব্যের পটভূমিকা—'lovers claim to love or cherish obsessively in images of commerce and appetite'—দুটিই হতাশাব্যঞ্জক। উদ্ধৃত অংশে "sell" শব্দটির ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভূতি জাগায়। আসল কথাটা রয়েছে এর ঠিক পরের পংক্তিতেই—'Injurious time now with a robber's haste/Crams his rich thievery up, he knows not how ; এখানে এবং সমগ্র ট্র্যাজেডিতে এই তস্করের উপস্থিতি কী করে সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ? এই 'রিচ থিভারি'র যে রিচনেস ট্রয়লাসের সখেদ উক্তির সমৃদ্ধিতে প্রতিফলিত—'the rude brevity and discharge of one'—বিশেষ করে ওই অন্তিম "one"-ওই ব্রেভিটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সবই তাঁর নজরের বাইরে। তা ছাড়া যে কথা বলছিলাম, ট্র্যাজেডিতে টাইম, সর্বাপহরক কাল অন্যতম চরিত্র। তার উপস্থিতি প্রচ্ছন্ন কোনো দুরন্ত ব্যাধির মতো। এই নাটকের অন্যতম স্মরণীয় উক্তি ইউলিসিসের : 'Time hath, my lord, a wallet at his back/Wherein he puts alms for oblivion' (TC III. 3. 144-5)। "Buying" এবং "selling" দুটিই টাইম-এর ফাংশনস, বক্তা ট্রয়লাসের নয়। ট্রয়লাস এখানে এই ডিস্‌পজেশনের কথাই ভাবছেন যা আমাদের হিউম্যান লট। তার সঙ্গে কোনো কমার্স্ বা অ্যাপিটাইট-এর সম্পর্ক নেই। আগে যে ফ্র্যাগমেনটেশন বা আইটেমাইজেশন-এর উল্লেখ আছে, এই প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যা বা উৎস এখানেই। পূর্ণতার আস্বাদ বা প্রতিশ্রুতি যে পায়, কাল এসে হঠাৎ তা কেড়ে নেয় তার কাছ থেকে। যে নিঃস্ব, অপহৃত—তার ভাগ্যে পড়ে থাকে রি-কলেকশন অভ ফ্র্যাগমেনটস। ট্রয়লাসের ট্র্যাজেডি এই যে সে প্রেমের সৃজনীশক্তির আস্বাদ কিছুই পেল না—দেখতে পেল শুধুই কালের করাল বিধ্বংসী ছায়া যার মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল তার স্বপ্ন, তার আদর্শ। কিন্তু ট্রয়লাসের যিনি স্রষ্টা, তাঁর অবিনাশ কারুকৃতি কালের এই সর্বনাশা শক্তির বিরোধী।

প্রসঙ্গত ট্র্যাজেডিতে কালের এই ভূমিকাই কিন্তু "ট্রয়লাস" এবং "হ্যামলেট" এই দুই নাটকের যোগসূত্র। দুটি নাটকের অ্যাকশনে কালের এই ফাংশন প্রতিবিম্বিত সংশয়, দ্বিধা, জড়তা এবং কালক্ষয়ে। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য যে বিষয় সেই দ্বিধার জনকই তো কাল। চরিত্রের মধ্যে আর বাহিরে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, দুর্জ্ঞেয়, পরাক্রান্ত অশুভ শক্তির

উপস্থিতি। এদের পারস্পরিক মিতালি যে সৃষ্টির অঙ্গীভূত তাতে আশঙ্কা আর অমঙ্গলবোধ হয়ে ওঠে তীব্র, অসহনীয় ; গড়ে ওঠে তার দুর্ভেদ্য রহস্য, দুর্বার গতি আর অপ্রতিহত শক্তি।

"শেকসপিয়ারস মিনিমাল ক্যারাকটারস" নামক প্রবন্ধে শ্রীমতী মলি মাহুড তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন খুব বড়ো মাপের নাটক "কিং লীয়র"-এর ছোটো মাপের যেসব চরিত্র প্রায় চোখেই পড়ে না তাদের প্রতি। শেকসপিয়ারের মঞ্চে এইসব চরিত্রের ভূমিকায় কাঁরা কিভাবে অভিনয় করতেন ভাবতে বা বুঝতে গেলে নাটকটিকে একটি থিয়েট্রিকাল স্ক্রিপ্‌ট্ হিসাবেই পড়তে হবে। এটা একটা মস্ত লাভ। লীয়র এত বিশাল, অতিকায় যে তা কোনো মঞ্চেই আঁটে না, এই ধারণা সংশোধনে এই পাঠের বিশেষ প্রয়োজন। লেখাটি সহজ, অনাড়ম্বর, সুখপাঠ্য। লেখিকা দেখিয়েছেন, নাটকের অবগমনে লীয়রের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিশাহারা জগতে এইসব ক্ষুদ্র, নগণ্য, প্রায় অনামা চরিত্র কিভাবে নিশানা দেয়, দিগ্‌দর্শনে সাহায্য করে। এইজন্য লেখিকা "মিনিমাল" না বলে এইজাতীয় চরিত্রদের "ডিরেকশনাল" বলেছেন।

এই ধরনের চরিত্রের মধ্যে আছেন লীয়রের সেই একক নাইটটি যাকে নাট্যকার বাচনিক অর্থাৎ কিছু বলার ভূমিকা (স্পীকিং পার্ট) দিয়েছেন (I. IV)। আর আছেন সেই অজ্ঞাত জেন্‌টল্‌ম্যান যিনি III. i-এ স্বল্পক্ষণের আবির্ভাবে কোরাসের সমতুল্য ভূমিকা নিয়েছেন এবং IV. vi-এ চারটি পংক্তিতে কর্ডেলিয়া সম্পর্কে তার উক্তিতে "নেচার"-এর প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। ফোলিও টেক্‌স্‌টে IV. iii-তে গ্লস্‌টারকে এডগারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন যে বৃদ্ধ (ওল্‌ড্ ম্যান) এবং শেষ দৃশ্যে সেই ক্যাপটেন যার উপস্থিতি আমাদের উপলব্ধি করায় যে কামুর "প্লেগ"-এর মতোই সর্বব্যাপী এই নাটকের অশুভশক্তি। স্বভাবজ কুপ্রবৃত্তি (ন্যাচারাল ডিপ্রেভিটি) এবং সহজ সুমতি (ন্যাচারাল গুডনেস)—এই দুই বিপরীত মেরুর উপর আবর্তমান লীয়রের জগৎ : যার এক প্রত্যন্তে দাঁড়িয়ে আছে এই ক্যাপটেন, অন্যতে কর্ন্‌ওয়লের অবাধ্য ভৃত্য।

ভিন্ন আস্বাদের প্রবন্ধ ড. নাগরাজনের "সীমোন্ হ্বাইল্ অন কিং লীয়ার : এ নোট"। এখানে লীয়রকে মুখ্যত নাটকরূপে নয়, একটি চিরন্তন মানবিক তথা আধ্যাত্মিক সমস্যার প্রতিবেদনরূপে দেখা হয়েছে কিছু মৌলিক খ্রীষ্টীয় তত্ত্বপ্রয়োগে।

লীয়রের জগতে, তার মর্মস্থলে বিরাজ করছে এক গভীর স্তব্ধতা। অন্যায়, অবিচার, নিপীড়ন, দুঃখ, শোক. যন্ত্রণা, বঞ্চনা এখানে এতই নিষ্ঠুর যে অনেকেই ড. জনসনের মতো এই ট্র্যাজেডিকে সহ্য করতে পারেন না। 'কেন এত কষ্ট ?' 'কেন এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে না। 'What is the cause of thunder ?' এবং 'Is there any cause in nature that makes these hard hearts ?' নাটকের বাহিরে এবং ভিতরে এই দুটি চরম ঘটনা, উন্মুক্ত প্রান্তরে গগন বিদীর্ণ করে যে নির্মম বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ আর ঝড়ের আবির্ভাব এবং কন্যাদের যে হৃদয়হীনতা সেই ঝড়ে অসহায় বৃদ্ধ রাজাকে ঠেলে বার করল, এই দুয়ের কী কারণ ? লীয়রের বারবার 'কেন ?' 'কেন ?' 'কেন ?' এই প্রশ্নের উত্তর নেই। (তুলনীয় : 'বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,/ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর'—রবীন্দ্রনাথ, "প্রশ্ন" : 'নবজাতক', শেষ পংক্তিদ্বয়) এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মচিন্তাবিদ্ শ্রীমতী সিমোন্ হ্বাইল্‌কে অনুসরণ করে ড. নাগরাজন যে আলোচনা করেছেন তার কেন্দ্রবিন্দু এই নীরবতা। এই নাটকের ভাববস্তুর খ্রীষ্টধর্মানুগতার সন্ধান মিলবে না তার ভাষায় বা চিত্রকল্পে, মিলবে মিতবাক্ কর্ডেলিয়ার চরিত্রের অন্তর্মুখী আবেগে (ইমপালশন)। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে নিপীড়িত মানবাত্মার যাতনাদগ্ধ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। লীয়র এবং গ্লস্‌টারের জগৎ থেকে ঈশ্বর অপসৃত। কিন্তু তাঁর অপসরণই প্রয়োজন জগতের অস্তিত্বের জন্য যাতে ঈশ্বরের থেকে আমাদের এই বিয়োগ বা ব্যবধান আমরা উপলব্ধি করি, আমাদের আত্মরতি বিসর্জন দিয়ে বিসৃষ্ট হই। এই বিসৃজন (ডিক্রিয়েটিং) হচ্ছে 'গ্রেস'-এর ক্রিয়া। গ্র্যাভিটি

অর্থাৎ অধোগতি বা অধোগামিতা থেকে 'গ্রেস'-ই মুক্তির উপায়। আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা বিনাশের জন্যে প্রয়োজন জীবন যা-কিছু আঘাত হানতে পারে তা সহ্য করা। এই নিঃস্বার্থ, নিয়ত আত্মাহুতির উদাহরণ কর্ডেলিয়া স্বয়ং। তাঁর অসাধারণ বাক্‌সংযম এরই প্রতীক। সামান্য ধর্ম এবং স্বধর্মের পার্থক্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে ড. নাগরাজন বলেন কর্ডেলিয়ার স্বধর্ম, তাঁর স্বয়ংবৃত সাধনা (ভোকেশন) হল সেই যাতনা সহ্য করা যা ঈশ্বরের থেকে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবে। এটা নিছক শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করা নয়। 'অ্যাফ্লিক্‌শন' কথাটি ড. নাগরাজন ব্যবহার করেছেন 'সাফারিং'-এর পরিবর্তে। (মূল ফরাসি শব্দ 'Malheur' আরো ব্যঞ্জনাপূর্ণ।) যে বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে লীয়র জানাচ্ছেন তাঁর তীব্র প্রতিবাদ, তারই মধ্যে নিযুক্ত রয়েছেন কর্ডেলিয়া তাঁর সাধনায়। যখন চরমনিপীড়নজনিত যাতনা আমাদের জড়ীভূত করে তখনই আসে আমাদের সুযোগ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের, যেভাবে জড়বস্তু (ম্যাটার) নীরবে পালন করে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা।

কর্ডেলিয়া যা-কিছু করেন, প্রেম এবং মমতাই তার মূলে। ঈশ্বরপরিত্যক্ত জগৎ উদ্দেশ্যহীন, নির্মমনিয়তিবদ্ধ। কিন্তু প্রেমাভিমুখী যে মানবাত্মা—তা এই নির্বোধ নির্মম নিয়তির ধ্যানে তলিয়ে গিয়ে যতই তার কঠোর শীতলতাকে আলিঙ্গন করবে ততই সৃষ্টির সৌন্দর্যের দিকে সে এগিয়ে যাবে। এডগার যে 'রাইপনেস'-এর কথা বলেছেন, তা হল এই প্রক্রিয়া।

লীয়রের আদৌ কোনো বিমুক্তি (রিডেম্‌শন) হয়েছিল কিনা, প্রবন্ধকার সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কর্ডেলিয়ার রূপান্তর অলৌকিক, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তা কালজয়ী এবং ঐশী দ্যুতিতে ভাস্বর। পিতার ক্ষেত্রে এডগার অবশ্য আরো সফল। তিনি যে কর্ডেলিয়ার থেকে আরো মহান বা আরো পবিত্র তা নয়। আত্মগোপন করে গ্লস্টারকে তিনি নিয়ে গেছেন হাত ধরে জীবনযন্ত্রণার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। আত্মপরিচয় দিয়েছেন একেবারে শেষে। তা জানার আনন্দে আর দুঃখে যেন এই মিলিত ভার সইতে না পেরে গ্লস্টার তখনই প্রাণত্যাগ করেছেন। এই প্রাণঘাতী আবিষ্কারে একটা সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন লেখক গ্লস্টার এবং লীয়রের মধ্যে। শেষ দৃশ্যে লীয়রেরও প্রাণবায়ু নির্গত হয় কর্ডেলিয়া তখনও বেঁচে আছেন মনে হতেই। গ্লস্টারের কাহিনী নাটকটির নিছক সাব-প্লট নয়।

অতীতকে লীয়র গ্রহণ করতে পারেন নি। উপস্থিত যে ক্ষণ সেখানেই কালের গতি রুদ্ধ, একথাও তিনি মানতে চান নি। নাটকের শেষ মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ প্রয়াতা কর্ডেলিয়ার প্রতি নয়, মুমূর্ষু লীয়রের দিকে। গ্র্যাভিটি এবং গ্রেস-এর মধ্যে যে পার্থক্য, পিতা ও পুত্রীর মধ্যেও তাই। যান্ত্রিক জীবনের অন্ধ গতিবেগ মেনে নিতে লীয়র অক্ষম হয়েছেন।

"Theatricality and mimesis in the Winter's Tale : The instance of 'taking one by the hand' "-শীর্ষক প্রবন্ধে ড. বিশ্বনাথন জ্যাকোবিয়ান যুগের একটি সুপরিচিত আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষিতে শেকসপিয়ারের নিজস্ব প্রয়োগের সার্থকতা বিচার করেছেন *WT* নাটকে একটি বিশেষ মুদ্রা বা ভঙ্গির পুনঃপুন ব্যবহারে। ওই যুগের নাট্যকলায় কিছু বাঁধাধরা রীতি আর পদ্ধতির ব্যবহার, চরিত্রচিত্রণ আর ঘটনাবিন্যাস সম্পর্কে নাট্যকারের একটি প্রচ্ছন্ন সকৌতুক সচেতনতা লক্ষিত হয়। নাটকটি যেন দর্শকেরই মতো এগুলির কৃত্রিমতা বা অতিনাটকীয়তা দেখছে একটু দূর থেকে। সমসাময়িক নাট্যকারদের থেকে শেকসপিয়ারের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে তিনি এই দ্বৈতরীতি—এই স্বেচ্ছানুসৃত কৃত্রিমতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা—এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর শেষ দিকের নাটকে যাতে দর্শকের মনে একই সঙ্গে দু-রকম সাড়াই জাগে। নাটকের মূল লক্ষ্য আর রীতি হল অনুকৃতি (মাইমেসিস)। শেকসপিয়ারের হাতে এই সহজ বাস্তবানুগতা ক্ষুণ্ণ হয় না সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম কৌশলাদির ব্যবহারে। বরং এতে প্রাকৃত আর অতিপ্রাকৃতের রোমান্সধর্মী সহাবস্থান সাধিত হয় অনায়াসেই।

WT নাটকে আগাগোড়া হাতধরার ভঙ্গির ব্যাপক ব্যবহারে লেখক তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। সমগ্র নাটকে এর আবির্ভাব তাঁর মতে দৃশ্যযতির (ভিজুয়াল পাংচুয়েশন) শামিল হয়েছে—অর্থাৎ বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করতে যতির যেমন ব্যবহার, নাটকে বা দৃশ্যকাব্যে তেমনি এই ধরনের মুদ্রার। তা ছাড়া, পরস্পরের হাতধরার মধ্যেই যেন রয়েছে একটা মিতালির অঙ্গীকার। নাটকের বিভিন্ন স্থানে উপচীয়মান ভাবের আর অর্থের নানা সূত্রের গ্রন্থি ওই দুই হাতে বাঁধা পড়ে। এটির ব্যবহারের অনেক বিচিত্র নিদর্শনের মধ্যে এখানে মাত্র দুটির উল্লেখ করে এই নাটকের দুই বিপরীত গোলার্ধের পারম্পর্য দেখানো যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে (I. II) হারমায়োনি নিছক সৌহার্দ্যে বোহিমিয়া প্রত্যাবর্তনে কৃতসংকল্প পলিক্‌সিনিসকে আরো কিছুদিন সিসিলির আতিথ্যগ্রহণে রাজি করানোর আর্জি দৃঢ় করার জন্য তাঁর হাত ধরছেন। এতে লেয়নটিসের সন্দিগ্ধ মনে কুটিল সংশয়ের ঝড় উঠল যার পরিণতি অতি ভয়াবহ। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মেষপালকদের উৎসবনৃত্যে ফ্লোরিজাল ও পার্ডিটা যখন পরস্পরের হাত ধরছেন তখন বিপরীত ছন্দের ব্যঞ্জনা। বেঠোভনের 'পাসটোরালসিমফনি' যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মনে পড়বে ওই সিমফনিতে 'স্টর্মে'র পর পঞ্চম ও অন্তিম মুভমেনট—'সঙ অভ থ্যাঙ্কসগিভিং'-এর মাধুর্য)। পরে এই দৃশ্যেই পলিক্‌সিনিসের প্রতিক্রিয়ায় যেন দেখি ক্ষুব্ধ লেয়নটিসের প্রতিফলন। আনন্দোদ্ভাসিত উৎসবের এই দৃশ্যটির ভাব, সুর, মেজাজ—সবই যেন সেই রোষাপ্লুত মুহূর্তে হঠাৎ একইভাবে পালটে গেল। তবু এই ছেদের পরিণতি কোনো বিচ্ছেদ নয়, নাটকের অন্তিম মিলনের সুর আর ছন্দ এতে ব্যাহত হয় নি। প্রথমার্ধের ক্রূর, বিধ্বংসী রূপের ধীরে-ধীরে মধুর পরিবর্তনের চরম সাক্ষ্য মেলে একদম শেষে যেখানে এই লেয়নটিসেরই নির্দেশে ক্যামিলো হাত ধরছেন পলিনার।

প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত, কিন্তু মূল যুক্তির শাখাপ্রশাখাবিস্তারে লেখকের উৎসাহের প্রাবল্যে কোথাও-কোথাও অবাঞ্ছিত বাহুল্য এবং অবান্তর, প্রায় অর্থহীন জটিলতা এসে গেছে। একটি নিদর্শন :

The multifacetedness of the illusion-reality intercommunication in the dance and the situation as a whole are (sic) something which resemble sic) the unified-field awareness and simultaneity of pattern-recognition characteristic of the 'electronic circuitry' indeed.

অথচ ওই একই দৃশ্যে (শিপ শেয়ারিং ফিস্‌ট) প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু কত সহজ আর মনোরম ভাবে ধরা পড়ে যেখানে পলিকসিনিস বলছেন পার্ডিটাকে :

Yet nature is made better by no mean
But nature makes that mean. So, over that art
Which you say adds to nature, is an art
That nature makes……
…… This is an art
Which does mend nature, change it rather, but
The art itself is nature.

এতে কি হৃদয়ঙ্গম হয়না সমগ্র নাটকটিতেই—সমগ্র সার্থক পাস্টোরাল সাহিত্যেই আর্ট এবং নেচার পরস্পরের হাত ধরে আছে? "উইনটারস টেল" নাটকটির গঠনরহস্যের মূল সূত্রটিও এই হ্যানডক্লাস্‌পে আছে।

"কোরিওলানাস" নাটকটি রাজনৈতিক বুলির ভাণ্ডার ('a storehouse of political commonplaces') বলে বর্ণনা

করেছিলেন হ্যাজলিট। তাঁর মতে, ডেমোক্রেসি এবং অ্যারিসটোক্রেসি, অল্প কয়েকজনের সুখ-সুবিধা এবং বহুজনের দাবি, স্বাধীনতা ও দাসপ্রথা, ক্ষমতা আর তার অপব্যবহার, যুদ্ধ আর শান্তি—এই সবেরই পক্ষে আর বিপক্ষে যেসব যুক্তি থাকতে পারে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শেকসপিয়ার এই নাটকে সেগুলি ব্যবহার করেছেন। এই নাটকের অনুসরণে বা ছায়াবলম্বনে রচিত পাঁচটি নাটক-নাটিকা শ্রীমতী অঞ্জনা দেশাই পরীক্ষা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে, "কোরিয়োলানাস ফ্রম শেকসপিয়ার টু অসবর্ন্"। বিভিন্ন মেজাজের এই নাটকগুলি হল যথাক্রমে : নেথম্ টেট-এর "দি ইনগ্রাটিচিউড অভ এ কমনওয়েলথ" (১৬৮২), জন ডেনিসের "দি ইনভেডর অভ হিজ কানট্রি" (১৯২০), হ্রনে লুই পিয়াশোর আলগা ফরাসি অনুবাদ (১৯৩২), ব্রেশ্‌টের জারমান অনুবাদ (১৯৫১), গুনটার গ্রাসের "দি প্লীবিয়ানস রিহারস্ দি আপরাইজিং" (১৯৬৬) এবং জন অসবর্নের "এ প্লেস কলিং ইটসেলফ রোম" (১৯৭৩)। ব্রেশটের নাটকের একটি রিহারশাল নিয়ে গ্রাসের নাটিকা। এটির সঙ্গে মেলিনা মেরকুরি-অভিনীত একটি ছায়াচিত্রের মনোগ্রাহী তুলনা করেছেন লেখিকা (পৃ. ৭৭ দ্রষ্টব্য : নোট ৯)।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে লেখিকার নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছদৃষ্টি প্রশংসনীয়। "কোরিওলানাস" নাটকটির গঠন-বৈশিষ্ট্যে শেকসপিয়ারের অভিপ্রায় কিভাবে ফুটে উঠেছে, অথবা রূপান্তরে উল্লিখিত নাট্যকারদের কারুর-কারুর হাতে তা কিভাবে বিকৃত হয়েছে, তিনি দেখিয়েছেন নির্ভীকভাবে। সামান্য একটি নিদর্শন : (পৃ ৬৯) টেট, ডেনিস এবং ব্রেশট—তিনজনেরই নাটকে কোরিওলানাসের রোমে তাঁর পরিবারবর্গের নিকট বিদায়গ্রহণ একটি অঙ্কের সমাপ্তি এবং অ্যানটিয়মে তাঁর আবির্ভাবে আরেকটি অঙ্কের প্রারম্ভ। শ্রীমতী দেশাই দেখিয়েছেন শেকসপিয়ারে প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী কোরিওলানাসের এই আগমন নূতন কোনো প্রয়াসের সূচনা নয়, বরং তা একেবারেই পূর্বপরিকল্পিত। অর্থাৎ অ্যানটিয়মে এলেন বলেই যে তিনি রোম আক্রমণে উদ্যত তা নয়, বরং রোম ছেড়েছেন বলেই এই উদ্যোগ। মূল নাটকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে কোরিওলানাসের সমগ্র নাটকে দুটিমাত্র স্বগতভাষণে একই সংকল্পের আভাস তিনি দেখিয়েছেন নিপুণ বিশ্লেষণে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ট্র্যাজিক দিকটি তাঁর সমীক্ষায় যেভাবে লেখিকা তুলে ধরেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টির প্রসার এবং গভীরতা প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থের আরেকটি প্রবন্ধে ব্যুর্ক্‌হার্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে লিবর্টিনিজমের যোগসূত্র স্থাপনের সম্ভাবনা বিচার করা হয়েছে। শ্রীমতী দেশাইয়ের প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি শেকসপিয়ারের আরো কাছে আমাদের নিয়ে যায় মনে হয়। গুনটার গ্রাসের "প্লীবিয়ানস" নাটকটির শেষ অঙ্কে কিছু কথোপকথন আছে যার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখিকা তাঁর প্রবন্ধটি সমাপ্ত করেছেন। উদ্ধৃতিটি এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ :

Boss : …We can't change Shakespeare unless we change ourselves.

Litthenner : You mean we're going to drop Coriolanus ?

Bose : He has dropped us. With contempt. From this day on we'll be at cross-purposes. …Only yesterday I was rich in words of vilification. Today I haven't a single one to fit him, you or myself.—And to think we wanted to demolish him, the colossus Coriolanus.

পরিশেষে একটি কথা। যখনই কোনো বিশেষ মতবাদ প্রয়োগ করে শেকসপিয়ারের নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি বা কোনো চরিত্র বিশ্লেষণ করি, আমরা বিস্মৃত হই সার্থক নাটক বা চরিত্র কোনো মতবাদের প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডনের জন্য সৃষ্ট নয়। অথচ অধিকাংশ সমালোচকই কোনো-না-কোনো মতবাদ বা থিয়োরিকে শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরেন। তার নিয়মানুগ প্রয়োগেই তাঁরা রত। এটাই যে অভ্রান্ত পদ্ধতি সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না তাঁদের মনে। কিন্তু

কোনো একটি বিশেষ তত্ত্ব বা তত্ত্ববাহী লেবেল দিয়ে শেকসপিয়ারের আস্বাদ মেলে না। ভালেরির উক্তি প্রাসঙ্গিক :

'it is impossible to think seriously with words such as Classicism, Romanticism, Humanism or Realism One cannot get drunk or quench one's thirst with labels on a bottle. (Mauvaises Penosees, Paris, 1942, p. 35)। ফ্রস্তের মন্তব্যও স্মরণীয় : 'A work in which there are theories is like on article on which the price tag has been left.'

আধুনিক কালের সাথে শেকসপিয়ারের যোগস্থাপনের আরেক প্রচেষ্টা আছে শ্রীসুধাকর মারাঠের প্রবন্ধে, "এলিয়ট অ্যানড শেকসপিয়ার; এ নিউ পারসপেকটিভ"। এলিয়টের কাব্যের সম্যক উপলব্ধির জন্য শেকসপিয়ারের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কী লাভ করেছিলেন জানা প্রয়োজন। এ ছাড়া শেকসপিয়ার পাঠের একটি ধারা এলিয়ট দেখিয়েছিলেন। এর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সাহিত্য-তত্ত্বের সংগতিও লক্ষণীয়। শ্রীমারাঠের বক্তব্য মুখ্যত এই দুটি। শেকসপিয়ারের ক্রমবিবর্তন এবং এলিয়টের স্থায়ী কীর্তি—দুটিরই মূল্যায়নের জন্য এই দুই কবির সম্পর্কপ্রণিধান একান্ত প্রয়োজন। কখনও-কখনও মনে হতে পারে যেন এলিয়ট নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছেন শেকসপিয়ার থেকে। এই আপাত বিরোধ বা বিচ্ছেদেও লেখক দেখেছেন গোপন আকর্ষণের ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে তিনি "প্রুফ্রক" থেকে সেই বহুশ্রুত উক্তিটি উদ্ধার করছেন : 'I am not Prince Hamlet, nor was meant to be.' লেখকের যুক্তি অবতারণার ধরন দেখে মনে হয় না, তিনি প্রকারান্তরে এটি এলিয়টের উক্তি মনে করেন না। এলিয়টের কবিতায় মাঝে-মাঝেই এই ধরনের খণ্ড আত্মজীবনী আবিষ্কার কিন্তু তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের বিরোধী। আমি বিশেষ তাঁর "ইমপারসোনাল পোয়েট্রি"-র তত্ত্বের কথা ভেবে বলছি। কিন্তু শ্রীমারাঠে নেমেছেন যেন এক ধরনের আইডেনটিফিকেশন প্যারেডের হোতা হয়ে। এলিয়টের কাব্যে শেকসপিয়ারের প্রতিধ্বনি বা ছায়া অনুসন্ধানে "গেরন্‌টিয়ন"-এ "ম্যাকবেথ" নাটকের নানা বিক্ষিপ্ত টুকরোর স্মৃতি কিভাবে প্রবেশ করেছে, খুবই অসাধারণ এবং অভিনব আবিষ্কারের ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন বহুল উদ্ধৃতিসহ। এই শ্রমসাধিত বিশ্লেষণ আমার একটু স্থূল এবং অপরিণামদর্শী ঠেকেছে। বিশেষ করে অতিপরিচিত এক ধরনের ইমেজ কলোকেশন মুঠোর মধ্যে ধরতে পারার নেশায় "জ্যু" "গোট" এবং "টাইগার"-এর সহাবস্থান (বা অনতিদূর অবস্থান) লেখককে নিঃসংশয় করেছে "গেরন্‌টিয়ন"-এর উৎস "ম্যাকবেথ" (iv i. 22-27, 33) : [আলোচ্য গ্রন্থের পৃ ৮১-৮২ দ্রষ্টব্য]। এখন দেখা যাক এলিয়টের ওই কবিতায় অর্থাৎ তার সামগ্রিক অর্থবিন্যাসে এগুলির তাৎপর্য কী।

কবিতাটির প্রবক্তা "অ্যান ওলড ম্যান" (গ্রীক Gerontion : 'Geron-এর diminutive, অর্থ 'a little old man') থাকেন যে জীর্ণ বাড়িতে তার বাতায়নে বসে থাকে এক ইহুদী :

"Spawned in some estaminet of Antwerp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London".

কবিতার প্রারম্ভে প্রথম-বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত জরাজীর্ণ ইউরোপের এই প্রতীকী বর্ণনা ('Here I am…A dull head among windy spaces')। শেষের পংক্তিটি বর্ণনার মিতবাক্ ক্লাইম্যাক্স। কবিকে তাঁর কবিতায় এই 'উইনডি স্পেসেস'কে সৃষ্টি করতে হয়েছে। কবিতাটি সুখ্যাত একটি ভিজ্‌ন্ (vision) এবং যদিও 'in a minor key", এপোক্যালিপ্‌টিক্ ঐতিহ্যেই এর রূপ নির্ধারিত।

এর পরেই আসছে এই শতাব্দীর প্রথম প্রলয় (হলোকস্ট)-এর পটভূমিকা এবং তার প্রতীকী চিত্রণ। 'Signs are taken for wonders।" এ যুগের মানুষ যে বিশ্বাস হারিয়ে আজ নিঃস্ব, সেই বিশ্বাসের উৎসে ফিরে গিয়ে

"ইতিহাসে"র প্রারম্ভে দেখি খ্রীষ্টের আবির্ভাব। খ্রীষ্টের জন্ম দিয়েই বর্ষপঞ্জীর সূচনা (anno Domini) : '…in the juvescence of the year came Christ the tiger'। এই হল 'the first coming'। পরে কবিতার চতুর্থ স্তবকে রয়েছে 'the second coming : 'The tiger springs in the new year।" দুটি উল্লেখে ভাষার সাযুজ্য, আপাত পুনরাবৃত্তি প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের পার্থক্য, ইতিহাসের আবর্তনকেই ফুটিয়ে তোলে। প্রথমে নেটিভিটি এবং পরে দ্য ডে অভ জাজমেনট-এর কথা বলা হয়েছে ঠিক উপরের পংক্তিতেই উল্লিখিত 'the wrath-bearing tree।' *The Revelation*, ch 14, 8, 10, 18-20, ch 16, 1, 19 দ্রষ্টব্য এই 'grapes of wrath'-এর প্রসঙ্গে। একটি উদ্ধৃতি : 'And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great vinepress of the Wrath of God' : ch. 14, verse 19। এর ঠিক বিপরীত হল 'the tree of life' : *Rev.* ch 22, 2 দ্রষ্টব্য।

এর নীচেই আছে এই সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা। এর সূচনা রেনেসাঁসে। '…depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas—এ সবই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রতীকী বর্ণনা। যাকে মনে করা যেতে পারে দ্য গ্রেট ব্রিট্রেয়াল, এ হল সেই সেক্যুলার হিউম্যানিজমের যুগ। এর পরিণতি মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যের অবক্ষয়। ("ক্যাথলিক" শব্দটির অর্থ "ইউনিভারসাল"), টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে-যাওয়া বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ভিড় আর তার দুঃসহ নিঃসঙ্গতা। খণ্ডিত, শৌখিন ফাঁকা ভাববিলাসের প্রবঞ্চিত আর প্রবঞ্চক দাসেদের ছায়ামূর্তি মিঃ সেল্‌ভেরো, হাকাগাওয়া, মাদাম দ্য তর্নকিস্‌ ইত্যাদি। শেষের ছবিটি ফ্রয়লাইন্‌ ফন্‌ কুল্‌পের যিনি স্পিরিচুয়ালিস্টের মিডিয়াম : Who turned in the hall, one hand on the door।' এর ব্যঞ্জনা ওই বন্ধ দরজায়, the door shut on faith।

ইতিহাস আর মানুষ অর্থাৎ ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী। ইতিহাস তো আর কিছু নয়, বিভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় প্রয়াসের সমষ্টিমাত্র। অথচ "ইতিহাসে"র এই পরিণতি ব্যক্তির কাছে অবাঞ্ছিত, ত্রাস এবং বিভ্রান্তির জনক। যেমন ধরা যাক এই যুদ্ধ যাকে বলা যেতে পারে চরম বিভ্রান্তি বা দ্য ফাইনাল কনফিউশন। আবার যুদ্ধকে যদি বীরত্বের নিদর্শন বা প্রদর্শনী ভাবি, দেখা যায় সেই বীরত্ব শুধু বিকৃত প্রবৃত্তিরই জনক। এই ভাঙাবাড়ি হল যুদ্ধোত্তর ইউরোপ তার মালিক ওই স্পনিং জু।

কবিতার শেষে আবার ভিড় করে আসে এইসব অ্যাটমাইজড্‌ ইনডিভিজুয়াল যাদের সমষ্টি আজকের সমাজ— De Bailhache, Fresca, Mrs Camel whirled/Beyond the circuit of the shuddering Bear/*In fractured atoms*। নৈর্ব্যক্তিক চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিকায়, সেই বিরাট শূন্যতায় ধুলোর মতো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিরা যারা আজকের সমাজ আর সভ্যতার বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার।

দুর্ভাগ্যবশত শ্রী মারাঠে "ম্যাকবেথ" থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি টুকরো জড়ো করে যেভাবে কবিতাটি, বিশেষ করে তার 'history' প্যাসেজটি ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সংশয় হয়, কবিতাটির সামগ্রিক অর্থ নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামিয়েছেন কিনা। উৎস-সন্ধানে তাঁর আলস্য সহজেই চোখে পড়ে। "জেরনটিয়োন" ছাড়া আরেকটি প্রসিদ্ধ কবিতা "দ্য হলো মেন"-এর শেষ অংশের সেই বহুশ্রুত ধ্রুবপদ (রিফ্রেন) "ফলস দ্য শ্যাডো"র উৎস-সন্ধানে অনুৎসুক লেখক আবিষ্কার করেছেন "Between the idea/And the reality-র ছক (প্যাটার্ন) *Julius Caesar* II. i. 63-65-এ (পৃ ৮০-৮১)। অনেকদিন আগে জেফ্রি টিলোটসিন দেখিয়েছেন পুনরাবৃত্ত "ফলস দ্য শ্যাডো" এসেছে সম্ভবত আর্নস্ট ডাউসনের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Non sum qualis eram bonae subregno Cynarae (সংক্ষেপে 'Cynara') থেকে :

Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara ! thy breath was shed…
… … …
But when the feast is finished and thy lamps expire,
Then falls thy shadow, Cynara ! the night is thine…

(*Essays in Criticism and Research*, p 155, Cambridge, 1942)

ওই বইয়ের পরের পৃষ্ঠায়, পৃ ১৫৬, নোটে টিলোটসিন জানাচ্ছেন, "টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট", ১০ জানুআরি, ১২৩৫-এ একটি চিঠিতে এলিয়ট তাঁর এই অনুমান সমর্থন করেছেন :

'The derivation (suggested) had not occurred to my mind but I believe it to be correct, because the lines (quoted) have always run in my head, and because I regard Dowson as a poet whose technical innovations have been underestimated.'

প্রসঙ্গত, ফরাসি সিমবলিস্টদের মতো এলিয়ট অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে অ্যাসোসিয়েশন ব্যবহার করেন না। সম্ভবত টি. ই. হিউমের প্রভাবে এবং অবশ্যই তাঁর স্বকীয় কবিমানসপ্রবণতায় তাঁর সিমবলের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট। শ্রী মারাঠের পদ্ধতি অনির্দিষ্ট অর্থাৎ খাপছাড়া এলোমেলো অ্যাসোসিয়েশনের উপর একান্ত নির্ভরশীল। এদিক থেকে তিনি এলিয়টের প্রতি সুবিচার করেন নি।

ড. সুকান্ত চৌধুরীর মূল্যবান প্রবন্ধটির ("শেকসপিয়রস ট্র্যাজিক লিবার্টিন্‌স") যুক্তিবিন্যাস মনে হয় কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েছে "libertine" শব্দটির চলতি মামুলি অর্থ এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতে তার যে একটি বিশেষ অর্থ আছে—এই দুয়ের মধ্যে একটু অনিশ্চিত পদক্ষেপে। নির্বাচিত ট্র্যাজিক চরিত্রগুলির মধ্যে কে বা আদৌ কেউ কোনো অর্থেই "libertine" রূপে অভিহিত হতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। প্রবন্ধটির প্রারম্ভে দুটি অর্থের মধ্যে পার্থক্য বিশদভাবে আলোচিত, তা সত্ত্বেও সংশয় ঘোচে না। যেমন "হ্যামলেট"-এ শেকসপিয়ার একদিকে রেনেসাঁস হ্যামলেট, অন্যদিকে প্রিমিটিভ নর্স বা ভাইকিং হ্যামলেটের সমাবেশ করেছেন নায়কের চরিত্রে, তেমনি ধরা যাক অ্যানটনির চরিত্রে যে সংমিশ্রণ (কমপোজিশন) আমরা দেখি সেটা একদিকে কঠোর রোমান দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমনকি পম্‌পির মতো চরিত্রের চোখেও প্রচলিত অর্থে "কামুক বা লম্পটে"র চিত্র; কিন্তু ঠিক তারই পাশাপাশি রয়েছে তাঁর উদার মহানুভবতার ব্যঞ্জনা। মূলত অধোগামী চরিত্রের মধ্যে মহত্তর ঊর্ধ্বগামী ভাবের যে অবতারণা, এমনকি লেখক ফোর্ডের নাটকে অবৈধ প্রেমের নায়ক-নায়িকার মানসে যে 'higher movement of the spirit' (পৃ ১০২) লক্ষ্য করেছেন তাও "libertine"-এর উন্নততর অর্থে নির্দিষ্ট হয় না। শেকসপিয়ারের চরিত্রগুলির সমগ্র রূপ শুধু "libertine" শব্দের লৌকিক এবং দার্শনিক শব্দযুগ্মের মধ্যে বিধৃত নয়। কবির কল্পনার সৃজনী ক্ষমতা একটি অখণ্ড এবং অনাহত রূপে বেঁধে রেখেছে কত বিচিত্র অসংগতি, আপাতবিরোধী মনোভাবের নৈরাজ্যকে।

ড. চৌধুরী অবশ্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রথমত শেকসপিয়ার এবং তাঁর সমকালীন বা উত্তরসূরী নাট্যকারদের এই বিশিষ্ট চিন্তাধারার (যাকে তিনি পাশ্চাত্ত্য সংশয়বাদের একটি প্রশাখারূপে চিহ্নিত করেছেন) প্রয়োগের—অনেক সময়ই খুব সস্তা ধরনের অপপ্রয়োগের—বিরাট পার্থক্য স্ফুট করতে। দ্বিতীয়ত, তিনি এখানে এই "libertine" চিন্তাধারার বিকাশকে রেনেসাঁস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অপরিসীম আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভিলাষী। তাঁর প্রথম দাবি তর্কাতীত। শেকসপিয়ারের হাতে এই-জাতীয় চরিত্রচিত্রণের উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ যদিও তাতেই সন্দেহ হয় চরিত্রগুলি এই-"জাতীয়" কিনা। গুণগত পার্থক্য অবশ্যই জাতিগত পার্থক্য। সাহিত্যে

শ্রেণীবিভাগ উঁচু দরের শিল্পীর সৃষ্টির মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় বক্তব্যে লেখকের দ্রুত ও দৃপ্ত পদক্ষেপ হয়তো অভ্রান্ত। তবু মনে হয়, তিনি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন—এই 'সেল্ফ-একস্প্রেশনের' 'সেল্ফ' কি 'ডিভাইডেড এগেন্স্ট ইটসেল্ফ' নয়? তাঁর দুটি দাবির বন্ধনসূত্র আরো দৃঢ়পিনদ্ধ হত যদি তিনি লক্ষ করতেন "লিবার্টিন" শব্দটির দুটি অর্থই অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপীড়ন এবং আত্মধিক্কারের দ্যোতনা থেকে মুক্ত। তার ক্ষত, যা অ্যানটনির বর্মের উপর আঘাতের থেকে গভীরতর, যার উৎস তাঁরই ভাষায় "The battery from my heart", এখানে অদৃশ্য।

অ্যানটনিকে অবশ্যই লিবার্টিন বলা যায়, বলাও হয়েছে, তবে শুধু প্রথম চলতি অর্থে (II, i, 22, পম্পির উক্তি দ্রষ্টব্য, পরেও লাইন ৩৮-এ আবার "The ne'er lust—wearied Antony")। দ্বিতীয় অর্থে তাঁর ট্রাজেডির সঙ্গে "লিবার্টিনিজম্" অর্থাৎ "ফ্রি-থিংকিংয়ে"র কোনো যোগই নেই। বরং তাঁর ট্র্যাজেডি হল এই যে 'he is not free in any way, least of all, to think'। তাঁর দ্বন্দ্বের উৎস কোনো ওয়ে অভ থিংকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং দুটি ওয়েজ অভ লাইফকে মেলাবার ব্যর্থ প্রয়াসে, রোমান এবং ইজিপশিয়ান।

ম্যাকবেথকে এই লিবার্টিনিজমের কাঠামোয় পুরতে গেলে তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে হয় সেখানে তিনি "cabin'd, cribb'd, confin'd", কারণ এটা সেই পুরানো গৎ 'Macbeth as the tragedy of ambition'-এর ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। দুটি ট্র্যাজেডিতেই শেকসপিয়ার দুই ধরনের আইডেনটিটি ক্রাইসিস উত্থাপিত করেছেন। প্রতি ট্র্যাজিক নাটকেই নায়কের নিজের নাম বা পরিচয়ের রেজোনান্স বা অনুরণন বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে। যখন ট্র্যাজিক নায়কের তরী নিমজ্জমান তখনই তাঁর সেল্ফ-অ্যাসারসন বা সেল্ফ-অ্যাফারমেশন: দ্রষ্টব্য *A & C* IV. xv. 15-16, *Ham* V. i. 280-1, *Lr* IV. vi. 109 এবং 203-4, *Oth* V. ii. 337-357। কিন্তু সেল্ফ-অ্যাফারমেশন এবং সেল্ফ-এক্সপ্রেশন এক নয়। সেল্ফ-এক্সপ্রেশনে যে অনিয়ন্ত্রিত স্বাতন্ত্র্যের ইলিউশন বা মোহ থাকে, সেল্ফ-অ্যাফারমেশনে তা নেই। একটি অ্যাক্নলেজ্‌ড নেগেশন্ অর্থাৎ অভাববোধ এর মানসপটভূমিকা, এবং তার কঠোর স্বীকৃতিই তাকে করে তোলে সোচ্চার।

লস্ অভ আইডেনটিটি প্রসঙ্গে ফিরে দেখি- ম্যাকবেথে এই আত্মপরিচয় বা আত্মাকেও হারিয়ে ফেলার ঘটনাটি নাটকের প্রথমার্ধে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই শুনি ম্যাকবেথের আর্ত স্বীকৃতি: '…and mine eternal jewel/ Given to the common enemy of man'। ডান্‌কান্‌হত্যা বলতে গেলে ম্যাকবেথের আত্মহনন। এই রূপক আত্মহননের সঙ্গে অ্যানটনি কিংবা ক্লিওপেট্রার আত্মহত্যার আছে মৌলিক পার্থক্য: অনুভূতির বৈভবে এবং নাটকীয় দৃশ্য হিসাবে। তা ছাড়া, দুটি নাটকে দু ধরনের আত্মসমর্পণ, ক্লিওপেট্রার কাছে আনটনির এবং মৃত্যুর কাছে ম্যাকবেথের। একথা বলছি এই কারণে যে আমরা সকলেই জানি, ডানকানকে হত্যা করেও সাফল্যের সুধাপানের সামান্যতম আস্বাদ থেকে ম্যাকবেথ বঞ্চিত। পানপাত্রে পড়ে আছে শুধু নিষ্ফল আক্ষেপের শুষ্ক তলানি। কিন্তু যে ফেনিল পানপাত্রের গাঢ়, তীব্র আকর্ষণ অ্যানটনি অনুভব করেছেন ক্লিওপেট্রার মোহময়ী মূর্তিতে, মৃত্যুও তা কেড়ে নিতে পারে নি। আর ক্লিওপেট্রা তো মৃত্যুকেই পান করলেন সেই অমৃতপাত্রে। তাঁর স্তনবৃন্তে বিষধর সর্প রূপান্তরিত মাতৃস্তনপায়ী শিশু। আবার দেখি, একদিকে মৃত্যু তাঁর রূপমুগ্ধ প্রেমিক, অন্যদিকে সূর্যদেব, যাঁর রতিদংশনে* তাঁর

---

* ক্লিওপেট্রার উক্তি: "Think on me,
That am with Phoebus' *amorous pinches.*"
And wrinkled deep in time. (*A & C*, I, v, 27-29)
"রতিদংশন" "amorous pinches"-এর ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও "নখক্ষতের" থেকে কম অসঙ্গত মনে হয়েছে আমার অনুবাদে।

ত্বক অসিত। জীবন এবং মৃত্যুর এই আসঙ্গ, যার মূল সুরটি অনন্ত লিপ্সা, রূপতৃষ্ণা—এ এক ভিন্ন আস্বাদের অভিজ্ঞতা। ক্লিওপেট্রার মানসচক্ষে অ্যানটনি অনন্য কেন তার ইঙ্গিত অ্যানটনির প্রচলিত "লিবার্টিন"-এর রূপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র:

O well-divided disposition !
He was not sad,… …
……he was not merry
……but between both.
O heavenly mingle ! Be'st thou sad, or merry,
The violence of either thee becomes,
So does it no man else. (*A & C* I. V. 55-61)

যে ঋতুর সঙ্গে ঠিক এর আগেই অ্যালেক্সস্ তুলনা করেছেন অ্যানটনির:

Like to the time o'the year between the extremes
Of hot and cold, he was nor sad nor merry,

তারই আরেক রূপ ক্লিওপেট্রা উদ্‌ঘাটন করেছেন অনেক পরে এই "সম্রাটের" স্বপ্নে:

For his bounty,
There was no winter in't ; an autumn 'twas
That grew the more by reaping. (*A & C* V. 2. 86-88)

(যে সমালোচকরা এই নাটকের ফসল তুলতে আসেন তাঁরা যেন এই শেষের কথাটি মনে রাখেন।)

ক্লিয়োপেট্রার বিষয়ে নাটকের প্রথম দৃশ্যেই অ্যানটনিও বলছেন:

…whom everything becomes, to chide, to laugh,
To weep ; whose every passion fully strives
To make itself in thee, fair and admired.

জীবন যেন দাঁড়িয়ে আছে ক্লিয়োপেট্রার রূপের মায়ামুকুরে তার শত বিচিত্র আর খণ্ডিত প্যাশনের প্রতিবিম্বকে অখণ্ড ও অপরূপ করে দেখতে। জীবনের এই পূর্ণবিকাশ এবং রূপান্তর পরম্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করার অবিরাম স্পৃহাই অ্যানটনি আর ক্লিওপেট্রার বন্ধনের গ্রন্থি। এও এক "knot intrinsicate" এবং মৃত্যুই একমাত্র পারে সেই গ্রন্থি মোচন করতে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে যে ফেনিল পানোচ্ছ্বাস তরঙ্গে-তরঙ্গে নাটকের লীলাভূমিকে আন্দোলিত করেছে, তা পর্যবসিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে একটি অদৃশ্য পানপাত্রে যার থেকে সুধাপান না করেও ক্লিয়োপেট্রা তাঁর এই স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুকে তুলনীয় করে তোলেন সক্রেটিসের হেমলক পানের সঙ্গে। যদিও সক্রেটিসের মতো তিনি বলেন নি "The unexamined life is not worth living" তাঁর মৃত্যুর এই দৃশ্য (V. ii, 278-311) সক্রেটিসেরই মতো মূল্যবোধের প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত, অভাবে নয়।

ড. চৌধুরীর সুচিন্তিত, সংবেদনশীল, সুরচিত প্রবন্ধে অ্যানটনির মৃত্যুদৃশ্য সম্বন্ধে মন্তব্যের অপ্রত্যাশিত কঠোরতা একটু বিস্ময়কর:

'He dies, moreover, in the pain and ignominy of a botched suicide brought on by his mistress's deceit, and the indignity of being hauled up by ropes to Cleopatra's

tower : she imposes upon him to the end. There is a curiously deprived, mortifying quality about the final hours of this great lover....His end proves to have much in common with Macbeth's or Coriolanus' aftər all." (p 113)

অ্যানটনি এবং ক্লিয়োপেট্রার প্রেম, বর্ণাঢ্য বিলাস এবং সর্বনাশ হোজে-মারিয়া দ্য এরেদিয়ার একটি সনেটে পুঞ্জীভূত একটি আশ্লেষের বর্ণনায় : আলিঙ্গনবদ্ধা ক্লিয়োপেট্রার তারকাপ্রভস্বর্ণবিন্দুখচিত বিশাল নীল চোখের মধ্যে অ্যান্টনি দেখছেন পলায়মানতরীবাহী অসীম এক সমুদ্র :

Et sur elle courbe', l'ardent Impevator
Vit dans ses larges yeux e'toile's de points d' or
Toute une mer immense o`u fuyaient des gal`eres.

(Heredia, Antoine et Cleopatre)

আমার মতো পাঠকের প্রশ্ন : সত্য কোথায়, অ্যানটনির 'ইগনোমিনিয়াস এন্ড'-এর ঐ নীতিনিষ্ঠ বিচারে, না এরেদিয়ার এই সনেটে ? মনে হয়, 'বিটুইন বোথ', এই দুয়ের মাঝখানে কোথাও ট্রুথ যেখানে 'ওয়েল-ডিভাইডেড'।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। প্রথমটি "পঞ্চভূত" গ্রন্থের অন্তর্গত "নরনারী" প্রবন্ধ থেকে—'ক্লিওপেট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যান্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশবিজড়িত ভগ্ন জয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যান্টনির উচ্চতা সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে।' (র. র. ২য় খণ্ড, পৃ ৫৫৮)

অন্যটি "দুই বোন" উপন্যাস সম্বন্ধে বিচিত্রায় মুদ্রিত (শ্রাবণ ১৩৪০) একটি পত্র থেকে—

'...সাহিত্য শ্রেয়স্তত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা পুতুল গড়বার কারখানা নয় এ কথাও কি বোঝাতে হবে। ম্যাকবেথ নাটকে দুটি মাত্র প্রধান পাত্র, ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ বলা বাহুল্য, দুজনের কাউকেই সুকুমারমতি পাঠকদের চরিত্রগঠনযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা চলবে না। অ্যান্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা শেকসপিয়রের প্রধান নাটকের মধ্যে অন্যতম। ক্লিওপ্যাট্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে স্থান পাবার অধিকারিণী হলেও তাকে সাধ্বীর আদর্শ বলা চলবে না। আর অ্যান্টনি আপন চরিত্রের অনিন্দ্য আদর্শে আধুনিক উঁচুদরের বাংলা নভেলের নায়কদের সমশ্রেণীভুক্ত নয়, একথা মানতেই হবে। (র. র., ১১শ খণ্ড, পৃ, ৫১৩)

গণমুক্তির স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ব্যর্থতার মহাকাব্য

বাংলাদেশে পাকিস্তানি আমলে ষাটের দশকের শেষদিকে জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসনের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে, দেশের পূর্ব অংশকে শোষণ করে পশ্চিম অংশকে সমৃদ্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালিদের আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে এমন এক পটভূমিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং যারা আন্দোলন বিরোধী এমন সব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে আনুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনলে নিম্নে-উল্লেখিত চরিত্রগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শহরের মহাজন রহমতউল্লা আন্দোলনবিরোধী। কারণ জলবৎ-তরল। পাকিস্তান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ব্যবস্থার অনেক সুযোগ-সুবিধা তিনি পেয়েছেন। তিনি ঢাকা শহরের বাড়িওয়ালা, গ্যারাজ-ভরতি রিকশার মালিক। সরকারের দেয়া ঠিকাদারির কাজে প্রচুর পয়সা করেছেন। বাড়ির ঠিকা ঝির দারিদ্র্যের সুযোগে ও প্রলোভন দেখিয়ে অনায়াসে তার দেহ ব্যবহার করতে পারেন। আবার সেই কারণে ঝি-গর্ভবতী হলে ওষুধ প্রয়োগ করে নিশ্চিন্তে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারেন। অন্য দিকে আবার বিধিমত নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি পালন করে পরকালের রাস্তা পরিষ্কার রাখাতেও তাঁর তৎপরতার অভাব নেই। ফলে জীবনে পাওনার আর তাঁর বাকি থাকে কী ? সুতরাং তিনি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী।

অনুরূপভাবে গাঁয়ের খয়বার গাজী-ও আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহ, আয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রাসির সমর্থক। কারণ তিনিও পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার গ্রামাঞ্চলীয় প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ছলে বলে কৌশলে অগাধ ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। থানা-পুলিশ, ইউনিয়ন বোর্ড, এম. এল. এ. এম. পি. ইত্যাদি সবই তাঁর হাতের মুঠোয়। গ্রামের গরিব মানুষদের পুরোপুরি তাঁর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র তিনি চালিয়ে যেতে পারেন অবাধে। তাঁরই নির্দেশে তাঁর সাকরেদ হোসেন ফকির যখন এইসব চাষীর গোরুগুলি চুরি করে যমুনার ডাকাত-মারার চরে নিয়ে গিয়ে খোঁয়াড়ে জমা করতে শুরু করে, সেই সময় এই খয়রার গাজীর বিরুদ্ধে চাষীদের অভিযোগের ভাষা নিম্নরূপ :

'ব্যাটা মানুষের গরু চুরি করে তার কাছ থেকেই জরিমানা আদায় করো। কারো জমিতে তারা বর্গা করতে না পারে সেই ফন্দি আঁটো ? সবাই এসে তোমার পায়ে পড়ুক। তুমি ইচ্ছামতো মানুষের ভিটাটুকু পর্যন্ত কব্জা করে তাকে তোমার গোলাম বানাও।'

শহরের আলাউদ্দিন মিঞা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। বয়সে তরুণ আলাউদ্দিন মিঞারও রিকশো গ্যারেজ আছে। তিনি অটোরিকশারও মালিক। কিন্তু তিনি আরো বড়ো হতে চান। সম্পর্কে মামা মহাজন রহমতুল্লার তুলনায় তিনি যুগের হাওয়া ভালো বোঝেন। তিনি জানেন পশ্চিম পাকিস্তানি বুরজোয়া আর তাদের প্রশাসকদের কব্জা ঢিলে করতে পারলেই তামাম সুযোগ সুবিধা এসে যাবে তাঁর মতো উঠতি বাঙালি বুর-জোয়াদের হাতে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের কব্জা ঢিলে করতে হলে জনসাধারণকে ক্ষেপানো চাই ; আন্দো-লনকে গণ-অভ্যুত্থানের আকার দেয়া চাই। আবার এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রম-জীবী জনসাধারণের হাতে চলে না যায়। মামা রহমতুল্লার মতো বাঙালি মহাজনদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনের বর্শামুখ যাতে ঘুরে না যায়। কারণ রহমতুল্লা আর আলাউদ্দিন মিঞার শ্রেণী-অবস্থান একই। কেবল রাজ-নৈতিক ধ্যানধারণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং শোষণের চাতুর্যগত প্রশ্নেই যা তাদের কিছুটা ফারাক।

গ্রামের আফসার গাজীও আন্দো-লনের সমর্থক। কারণ তিনিও উঠতি গ্রামীণ বাঙালি বুরজোয়া। আলা-উদ্দিন মিঞার মতো পারলামেনটারি রাজনীতির চাতুর্য তিনিও বোঝেন। তাই ছাত্রদের নিয়ে হৈ চৈ মিটিং মিছিল করে বেড়ানোয় তাঁর অদম্য উৎসাহ। তবে এই রাজনীতির নিয়ম অনুযায়ী অন্তত লোকদেখানো কিছুটা সংযত আচরণও তাঁকে করতে হয় না ও নিজের লাম্পট্যকে তিনি নির্লজ্জের মত সবার সামনেই ঘোষণা করেন। কারণ গ্রামে খয়বার গাজীর মতো তাঁরও ভূমিকা অপ্রতিরোধ্য। গ্রামে প্রবীণ আর নবীন এই দুই গাজীর ভূমিকার পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কারণ শহরের মতো পারলামেনটারি রাজনীতির সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ এখানে না

চিলেকোঠার সেপাই—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ইউনিভার্সিটি প্রেস, মতিঝিল, ঢাকা-২। ১২৫ টাকা

দেখালেও চলে।

শহরের আলতাফ আন্দোলনের একজন জঙ্গি নেতা। শহরের আনোয়ারও আন্দোলনের একজন সমর্থক। তবে তাঁর রাজনৈতিক মতামত ভিন্ন ধরনের। নিম্নোল্লেখিত কথোপকথন থেকে এদের মতাদর্শের ভিন্নতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

আনোয়ার বলে, "তাহলে ছয় দফাই তোমাদের ফাইনাল? ছয় দফা দিয়ে সাধারণ মানুষের লাভ কি হবে?"

আলতাফ জবাব দেয়, "আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। ছয় দফায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন করার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে একটি অঞ্চল আর একটি অঞ্চলকে শোষণ করতে না পারে। আমরা যা উপার্জন করবো খরচ করবো আমরাই। আমাদের টাকা পাচার হয়ে যেতে পারবে না। ট্যাক্স বসাতে পারবো আমরা। বাইরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবো আমরা। ...ওয়েস্ট পাকিস্তানি আর্মির পেছনে বাঙালির রক্ত পানি করা টাকার অপচয় আর ঘটবে না। আমরা আলাদা আর্মির কথাও বলেছি।"

আনোয়ার বলে, 'হ্যা, বাঙালি আর্মির পেছনে পিপলের টাকা খরচা হবে, তাতে মানুষের লাভ কি?

'সেটা নির্ভর করবে আমাদের ওপর। বাঙালি আর্মি আমাদের লোক, আমাদের মানুষের সেনাবাহিনী। আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের নির্যাতন করবে কেন?'

'শোষণ কি কেবল আঞ্চলিক?'

'এখানে প্রধানত এবং প্রথমত তাই।'

'তাহলে কোটি কোটি বাঙালি যে হাজার হাজার বছর ধরে এক্সপ্লয়টেড হয়ে আসছে সে কার হাতে? দেশের ভেতরেই এক্সপ্লয়টার থাকে, বিদেশীর কোলাবোরেটার থাকে। গ্রামে গ্রামে থাকে। জমিতে থাকে, মিল ফাকটরি হলে সেখানেও থাকবে। ট্যাক্স বসাবার রাইট চাও? কে বসাবে? কার ওপর? এই দুই বাঙালি কি একই ধরণের? ...ট্যাক্স বসাবার রাইট পিপল পায় না, পিপলের রাইট শুধু ট্যাক্স দেওয়ার। বাঙালির হাতে পাওয়ার চাও তো? মানে বাঙালিদের এক্সপ্লয়েট করার লাইসেন্স চাও?'

বক্তব্য বিশদ করার জন্য আনোয়ার আরো বলেছেন, 'তুমি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছো আলতাফ। ওয়েস্ট পাকিস্তানের একটা সেকশনের এক্সপ্লয়টেশনের কথা অস্বীকার করে কে? ...আমার কথা হলো এই যে মানুষের এই আপদার্জ কি খালি বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটাবার জন্য? বাঙালি ভদ্রলোকের চাকরির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে?'

গ্রামের আলিবক্সও আন্দোলনের নেতা। তবে তার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের চেহারা একেবারে গুণগতভাবে আলাদা। শহরে বিপ্লবপন্থী আনোয়ারের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন নিম্নরূপ :—

আলিবক্স বলেন, 'আপনার ঢাকাত বস্যা বড়ো বড়ো কথা কন আর পার্টি ভাঙেন। মতিন ভাই আমাগরে এলাকায় আসলো, দল থ্যাকা ভালো ভালো কয়েকটা কর্মী আলাদা হয়্যা গেলো। এরকম করলে কাম হয়? জনগণতান্ত্রিক কন আর স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক কন উপনিবেশ কন আর আধাউপনিবেশ কন, গাঁয়ের মধ্যেকার শয়তানগুলাক খ্যাম করবার না পারলে কোনো কাম হবো না।'

আনোয়ার বলেন, 'সে তো বটেই। কিন্তু এইসব শয়তানের মুরুব্বিরা তো থাকে ঢাকা ইসলামাবাদ—।'

'গাঁয়ের মানুষ তো অগোরে চেনে না। আর এই শয়তানগুলা খ্যাম হলে মুরুব্বিরা দাড়াবো কোন জমির উপরে? আমরা পুবের চর এলাকাত সব একসাথে শয়তান খতমের কামে নামছি। ...তা এই সারকেল অফিসার কন আর তশীলদার কন আর এম. এন. এ. মন্ত্রী যাই কন না এদের ভরসা হলো আপনাগোরে ওটি খয়বার গাজী, আমাগোর এলাকাত হামিদ তালুকদার, মাদারী আখন্দ। আবার খয়বার গাজীর বারো আনা ভরসা হোসেন ফকিরের উপরে। এই শয়তানগুলাক খ্যাম করবার পারলে এম. এন. এ. মন্ত্রী কারো ক্ষমতা নাই সে এই এলাকায় যমুনার পুব পশ্চিম কনট্রোল করে।'

'তখন পুলিস মিলিটারি ক্যাম্প করবে আপনার পাশের এলাকায় না হলে পাশের জেলায়।'

'তা ঠিক।' আলিবক্স আনোয়ারের সঙ্গে একমত হয়েও হতাশ হয়-না, 'তাই তো কই কি সোগলি যার যার এলাকায় কাম করলে শয়তানগুলাক খ্যাম করা যায়, তখন পুলিশ মিলিটারি পাত্তা পাবে কোটে?'

আলিবক্স গ্রামের চাষার ছেলে, স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে চেংটু, করমালী, বান্দু শেখ ইত্যাদিরা একেবারে নিঃস্ব চাষার ছেলে।

শহরের খিজির আলিও আন্দোলনের জঙ্গি কর্মী। সে রিকশো চালায়। আলাউদ্দিন মিঞার গ্যারেজে রিকশো, অটোরিকশোর কলকব্জা ঠিকঠাক করে। তাই তার হাতে সব সময় থাকে ইসক্রুপড্রাইভার আর প্লায়ার। বস্তিতে তার জন্ম। বাপ যে তার কে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। মা তার মারা গেছে মহাজন রহমতুল্লার লালসার শিকার হয়ে। ঢাকায় আন্দোলনের জনসমুদ্র তৈরি করে খিজিরের মতো লোকেরাই। রাস্তায় কোনো মিছিলে দশজন ছাত্রকে শ্লোগান দিতে দেখা গেলে তাদের সঙ্গে জুটে যায় কম করেও পঞ্চাশজন 'পিচ্চি'। ঢাকায় এই পিচ্চি কথার অর্থ হল স্ট্রীট আরচিন। খিজিরও ছিল এই স্ট্রীট আরচিন। এখন তার বউয়ের ছেলে জুম্মন স্ট্রীট আরচিন। জুম্মনের বাপ খিজির নয়, অন্য আর-একজন। জুম্মনের মতো হতভাগারাই মিছিলের দল ভারী করে শ্লোগানের আওয়াজকে করে তোলে গগনবিদারী। মনে-মনে তারা স্বপ্ন দেখে এই আন্দোলনের শেষে আছে তাদের অভিশপ্ত জীবন, অপমান, লাঞ্ছনা, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান। তাই সুযোগ পেলেই শুধুমাত্র পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, তামাম মহাজনদের জুলুমের বিরুদ্ধেই খিজিরের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু ঠিক তেমন-তেমন মুহূর্তেই আন্দোলনের নেতা আলাউদ্দিন মিঞা ধমক দিয়ে ওঠেন,—'খচরামো করার জায়গা পাইলি না, না? এইগুলি কি কস হারামজাদা, এইগুলি কি? খামোশ মাইরা থাক।'

শহরের ওসমান গণি আমাদের অতিপরিচিত সরল সাদাসিধে শিক্ষিত দুর্বলচিত্ত মধ্যবিত্ত ভালো মানুষ। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আবার বাঙালিসুলভ ভাবাবেগ, কল্পনাপ্রবণতা আর রোমানটিকতা নিয়ে রহস্যময় চরিত্রও বটে। তিনি ঠিক শহুরে মানুষও নন। শৈশব কৈশোর তাঁর কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার এক গণ্ডগ্রামে। তাঁর বাবা, মা ইনডিয়ার সেই গ্রামেই থাকেন। বর্তমানে এই ওসমান গণি পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী, মহাজন রহমতুল্লার চিলেকোঠার ঘরে ভাড়া থাকেন। আক্ষরিক অর্থে 'চিলে কোঠার সেপাই' আসলে তিনিই।

মিছিল দেখলেই ওসমান গণির তরুণ হৃদয়ের আবেগ উথলে ওঠে। কিন্তু খিজিররা যখন তামাম মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলে তখন তিনি ঠিক সায় দিতে পারেন না। যার কারণ নিতান্তই ব্যক্তিগত। পুলিশ আর সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে যখন অত্যাচার করে, টিয়ারগ্যাস, লাঠি-গুলি চালিয়ে মৃত্যু বর্ষণ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে তরুণ গণির ক্রোধ গুমরে-গুমরে ওঠে। কিন্তু এই অত্যাচারের অবসানকল্পে আলতাফ, আনোয়ার ও আলিবক্সদের ভিন্ন ভিন্ন মত এবং পথের কোন্‌টা যে ঠিক তা নির্ধারণ-করতে না পেরে তিনি কেবলই স্বপ্ন দেখেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের আত্মপরায়ণতা। প্রেমে কিংবা রণে সর্বত্রই রয়েছে তাঁর ভীরুতা। তিনি কামোত্তেজনা প্রশমিত করেন ক্যালেনডারের বিশ্বসুন্দরী কিংবা প্রতিবেশিনী রানুর শরীরকে কল্পনায় বিদ্ধ করে হস্তমৈথুনের সহায়তায়। তাঁর সংগ্রামী স্পৃহা সাবলিমেশনের পথ খোঁজে দিবাস্বপ্নের ঘোরে। তাই মিটিং-এ আয়ুবের প্রতিকৃতি দাহ হলে তাঁর মনে হয় আয়ুবশাহী খতম হয়ে গেল। ঢাকায় মানুষের ক্রোধ প্রত্যক্ষ অগ্নিসংযোগে লেলিহান হয়ে উঠলে মিলিটারি যখন হোস পাইপ দিয়ে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে, স্বপ্নপ্রবণ গণির মনে হয় বুড়িগঙ্গার গতি ঘুরিয়ে দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে বটে—কিন্তু আন্দোলনের আগুন এমনই অপ্রতিরোধ্য যে বুড়িগঙ্গার স্রোতোধারাও তার স্পর্শে জলে উঠছে। শেখ মুজিবের মুক্তির পর রেসকোর্সের ময়দানের সমুদ্রবৎ জনসভা শেষ হয়ে গেলে এই ওসমান গণির চোখেরও স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে 'আগুন কোথায়? নদী কি শেষ পর্যন্ত আগুন নিভিয়ে ফের নিজের খাতে ফিরে গেছে? আগুনের খোঁজে গোটা মাঠ ঘুরে ওসমান এপাশে এসে রাস্তায় নামে। মাঝে মাঝে ছাত্রদের এক একটি দল নাচতে নাচতে ইউনিভার্সিটির দিকে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আগুন কোথায়? এই কয়েকদিনে কারফ্যু দিয়েও আগুন নেভানো যায় নি। আজ এতো মানুষ বেরিয়ে এলে কি শালার আগুন একেবারে নিভে গেলো?' স্বপ্ন আর বাস্তবের এতখানি দুস্তর ফারাকের উপলব্ধি ওসমানের সহনশক্তি অতিক্রম করে যায়। তিনি মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

খিজিরের মতো সর্বহারারা আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণজাগরণের মধ্যে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল তা খিজিরের বহুকাঙ্ক্ষিত সন্তানসম্ভাবনা হয়ে জুম্মনের মায়ের গর্ভে উঁকিও মেরেছিল। কিন্তু গণমুক্তির সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত সফল হয়। মিলিটারির গুলিতে খিজির মারা পড়ে। ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ জুম্মনের

মায়ের গর্ভপাত ঘটে যায়।

গাঁয়ের বৈরাগী ভিটার দুশোবছর কিংবা তারও বেশি দিনের পুরাতন বটগাছটা শেষ পর্যন্ত টিঁকেই থাকে। আলিবক্সের অনুগামীরা তার অসংখ্য ঝুরির অনেকগুলি কেটে ফেলে গণ-আদালত বসিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিষ্কৃত স্থানে বসে আফসার গাজীদের মিটিং।

তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে উনিশশো উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে নিহিত গণমুক্তির সম্ভাবনা সঠিক পথ নির্দেশ এবং সর্বহারাশ্রেণীর প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে এইভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আনোয়ারের মতো সচেতন বুদ্ধিজীবী শেষ পর্যন্ত নানা মধ্যবিত্ত সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধই থেকে যায়। তাঁর মুক্তবুদ্ধি "চিলেকোঠার সেপাই"-এর মতো কেবল স্বপ্নই দেখতে থাকে।

গণ-অভ্যুত্থান এইভাবে তার সমস্ত ডাইমেনশন নিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে "চিলেকোঠার সেপাই" নামের অসাধারণ উপন্যাসে। উপন্যাসের লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর লেখক। আলোচ্য উপন্যাসের গণ-অভ্যুত্থান তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আয়ুবশাহীর স্বৈরাচারী শাসনবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হলেও পরবর্তী গণ-অভ্যুত্থানগুলির চরিত্র এবং পরিণতিও প্রায় একই রকম। উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনের সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতা, বিশেষ-বিশেষ চরিত্রের অদ্ভুত স্বপ্নময়তা এবং অসংখ্য ঘটনার প্রতীকী ব্যঞ্জনার এমন নিখুঁত মেলবন্ধন বিশ্বসাহিত্যে খুব অল্পই দেখা যায়। ভাষা এবং উপন্যাসের আঙ্গিক গঠন হয়েছে দৃঢ়ভাবে কনটেনটের অনুগামী। ফর্‌ম্‌ নিয়ে খামোখা কসরত করার হালফ্যাশান কোথাও চোখে পড়ে না। ডায়ালগ রচনাতেও বাস্তবতাকে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেয়া হয় নি। বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ডায়ালগ। কিছুটা নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল :—

'বসেরা তাদের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে এবং ওপরওয়ালারা অফিসের এক নম্বরের কামরায় চারদিক আলো করে বসে দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।'

'ক্যাওস কনফিউশন কন্টিনিউ করলে ফিউচার ইজ ভেরি ব্লিক। পলিটিক্স যাই থাক, নাথিং সাকসিডস উইদআউট ডিসিপ্লিন।'

'রিমোট কর্ণারে তো ক্যাওস আরো বেশি।'

'এভরিবডি মাস্ট বি রিজনেবল। এ্যানার্কি শুড নেভার বি এ্যালাউড টু কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিওড।'

'এখন গভর্মেন্টের ছাখা দরকার এই আনরিজনেবল পিপলকে কনট্রোল করতে পারে কে? হি এ্যাণ্ড হি শুড বি টেকন ইনটু কনফিডেন্স।'

মাতৃভাষাপ্রীতির অনেক পরাকাষ্ঠা দেখানো সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষিত বাঙালির ভাববিনিময়ের ভাষার চেহারা যে এই-রকম দাঁড়িয়েছে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাস্তব অবস্থাকে অনুধাবন করার জন্য লেখকের এই নিষ্ঠা কিন্তু কেবলমাত্র আপাতদৃষ্টিগ্রাহ্য স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি এর গভীর অন্তর্লোকেও ডুব দিয়েছেন অনায়াসেই। তাই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির তত্ত্বজিজ্ঞাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, ভাবালুতা, বাস্তববিমুখ স্বপ্নাশ্রয়ী পলায়নপ্রবণতা—এই সবই আশ্চর্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে "চিলেকোঠার সেপাই" এই নামকরণের মধ্যেই। এই নামকরণের মধ্যে লেখকের নিজস্ব শ্রেণী-অবস্থানকেও একটি অভিধা দেয়ার অভীপ্সার ইঙ্গিত বহন করে। পরিশেষে পুনরায় উল্লেখ করতে হয়; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই উপন্যাস কোনো বিশেষ স্থানকালে সীমাবদ্ধ না থেকে এই উপমহাদেশে ইদানীংকালের সমস্ত গণ-অভ্যুত্থান এবং গণমুক্তির স্বপ্নসম্ভাবনার ব্যর্থতার দর্পণ হয়ে উঠতে পেরেছে, এমন উক্তি করলে বোধ হয় খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না।

আবদুর রউফ

পরাবাস্তববাদ ও জীবনানন্দ

"…কেউ বলেছেন এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনতার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়' [জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভারবি]। নিজের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে এই অনুভবঋদ্ধ উচ্চারণ স্বয়ং জীবনানন্দেরই। একজন কবি যে সব সময় তাঁর রচনার সঠিক চরিত্রলক্ষণ শনাক্ত করতে পারবেন, তা নয়। তবে জীবনানন্দের ওপর এ ব্যাপারে আমরা বোধহয় কিঞ্চিৎ আস্থা রাখতে পারি। তিনি শুধুমাত্র কবি নন, কবিতাবিচারের ক্ষেত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য অনুপেক্ষণীয়। তাঁর "কবিতার কথা" তার প্রমাণ। তাই, খুব সঙ্গত কারণেই, যথেষ্ট বিস্মিত বোধ করতে হয় যখন দেখা যায় যে তাঁর ছাড়পত্র-পাওয়া কোনো আংশিক সত্যই পূর্ণসত্যের ধূসর প্রচ্ছায়া ছড়িয়ে তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রতিমার অবয়ব প্রায় অচেনা করে দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি (যা মূলে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় - অনুমোদিত শ্রীমতী ভট্টাচার্যের গবেষণানিবন্ধ বলে কথিত) সেই বিস্ময়ের বিপন্নতা নিয়ে আসে। অসংখ্য-উদ্ধৃতি-কবলিত প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চংক্রমণ একটিমাত্র শব্দকে ঘিরে। তা হল পরাবাস্তববাদ বা সুররিয়ালিজম। স্বীকার করতেই হয় যে, পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে এমন দীর্ঘ এবং বিস্তারিত আলোচনা—বিভিন্ন দিক দিয়ে তার চরিত্রলক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত ও আলোকপাত—গ্রন্থটিতে একটি প্রশংসনীয় মাত্রা-সংযোজন ঘটিয়েছে। পরাবাস্তববাদী বিভিন্ন কবি-শিল্পীর চিন্তাভাবনা এবং মতামতের সঙ্গে গ্রন্থকারদ্বয় নিবিড়ভাবে আমাদের পরিচয় করাতে চেয়েছেন। অন্তত এই কারণেই তাঁরা অশেষ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন।

গ্রন্থকারদ্বয়ের অভিমত—আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ চরিত্রলক্ষণ হল পরাবাস্তববাদ তাঁদের ভাষায় 'পরাবাস্তববাদীদের বলা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ আধুনিক' (পৃ ৩৪)। জীবনানন্দ দাশও নিঃসন্দেহে বাঙলা কাব্য-কবিতার জগতে আধুনিকত্বের অবিসংবাদী প্রতিনিধি। তাঁদের ধারণা প্রতীচ্যের পরাবাস্তব চিন্তাভাবনায় নিষিক্ত হয়ে তাঁর রচনা এ শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছে। অতঃপর তাঁরা জীবনানন্দের সমস্ত কাব্য-কবিতার মধ্যে বিশ্লেষণী অনুসন্ধান চালিয়েছেন —তাঁর ভাষায়, চিত্রকল্পে, উপমা-রীতিতে, বক্তব্যে—কোথায়-কোথায় কিভাবে পরাবাস্তবতার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা পরাবাস্তববাদী কবি-শিল্পীদের উদ্ধৃতিসহযোগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

তাঁরা মন্তব্য করেছেন, 'পরাবাস্তববাদ-প্রণোদিত শাব্দিক স্বয়ংক্রিয়তার বিভিন্ন পদ্ধতি যখন জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত হ'লো, স্বপ্নময় অনুপুঙ্খ, কল্পনাপ্রতিভার আশ্চর্য দ্যুতি, কবিতা-নির্মাণের অদৃষ্টপূর্ব পদ্ধতি ও চেতনার অপরিমেয় সম্ভাবনা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে জন্মান্তর ঘটিয়ে দিলো।…এজন্যে কবি-পুরোহিত জীবনানন্দকে প্রতীচ্যের পরাবাস্তব থেকে দহনক্রিয়া ও স্ফুলিঙ্গ আহরণ বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ নিতে হয়েছে… বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য ঋণ-স্বীকার ছাড়া এবিষয়ে তিনি কিছুই স্পষ্ট করে বলতে চান নি। আত্মমুখী কবি, অন্তত জীবনানন্দের মতো, যে তুরুপের তাস পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাইবেন না —তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই' (পৃ ৫৪-৫৫)। কিংবা 'জীবনানন্দ যদিও স্পষ্টভাবে তেমন-কোনো প্রভাবের কথা স্বীকার করেন নি, একটু আগে আমরা বলেছি, তাতে কিছু আসে যায় না। জেমস জয়েসও রাবেল-এর কাছে ঋণ স্বীকার করেন নি; কিন্তু তাতে প্রভাব অপ্রমাণিত হয় নি' (পৃ ৫৫-৫৬)।

ঋণের ব্যাপারে অবশ্য বাঙালির একটা চিরায়ত ঐতিহ্য আছে। নতুন করে এতে আর লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। বাঙালির সামাজিক ইতিহাস বলে যে সমাজের এককালের শীর্ষমণি ব্রাহ্মণটি পর্যন্তও বাঙালিকে ধার করে আনতে হয়েছিল বাঙলার বাইরে থেকে। আলোচ্য গ্রন্থটি থেকে আবার

আধুনিকতা জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব—তপোধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্না ভট্টাচার্য। নবার্ক, ডি. সি. ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৭০০০৫৯। প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৩, জানুয়ারি ১৯৮৭। চল্লিশ টাকা।

জানতে পারলাম যে আমাদের কাব্য-কবিতার আধুনিকতার বীজধানটিও আমাদের মননকর্ষিত নয়—প্রতীচ্যের পরাবাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে আহরিত। এবং বোধকরি লজ্জা ধারের ব্যাপারে ততটা নয়, যতটা সেই ঋণ অস্বীকারের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায়। এখন দেখা যাক এই অভিযোগ কতখানি শিরোধার্য।

পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের জন্মক্ষণ স্থির করা হয়েছে (পৃ ২২) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। এর চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে অন্য একজন পণ্ডিত বলেছেন, 'জার্মান রোমান্টিকেরা যে-জগতের উন্মোচন করেছিলেন, সেই জগতের উদ্ভট, বীভৎস, আজব উপকরণকেই সুররিয়ালিস্টরা তাঁদের অন্ধকার উন্মাদনার জগৎ রচনায় ব্যবহার করলেন' (আধুনিক কবিতার দিগবলয়: অশ্রুকুমার সিকদার, পৃ ৪-৫)। রোমানটিসিজম এবং সুররিয়ালিজমের মৌল লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলে এই উদ্ধৃতির যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

রোমানটিসিজমের মৌল লক্ষণগুলি কমবেশি আমাদের সবারই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ থেকেই আমরা তার কিছু-কিছু উদাহরণ নিতে পারি। সেগুলো হল : ব্যক্তিমানুষের আত্মনিঃসরণ ('হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' কিংবা 'কাহারে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা'), কল্পনার স্তবস্তুতি ('আজন্ম সাধনধন সুন্দরী আমার, / কবিতা কল্পনালতা'), স্বপ্ন ও ঘুমের অনুষঙ্গ ['ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা / তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা'), ইতিহাসমুখিতা ('আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে') ইত্যাদি।

পরাবাস্তবতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং মৌল লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা এই-সমস্ত চরিত্রলক্ষণেরই রূপান্তরিত রূপ লক্ষ করব। সর্ববিধ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ অবক্ষয়জনিত কারণে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিমানুষের কাছে নিঃস্ব, রিক্ত, বন্ধ্যা-মরুভূমি বলে মনে হল। সমগ্র বহিঃপৃথিবী তার অস্তিত্বের প্রতি ভীষণ বিরূপ বোধ হল। সর্বব্যাপী নাস্তির দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে সে নিজেকে নিঃসীম নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং আপাদমস্তক সংশয়াচ্ছন্ন বোধ করল। স্বাভাবিক কারণেই তখন তার আত্মাভিমানী শিল্পী-সত্তা বিরূপ, ভগ্ন বহির্জগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মন নিয়ে সে ফিরে এল মনের কাছে। ডুব দিতে চাইল মনের গভীরে—অবচেতনে—আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় 'যেখানে এ্যাবসার্ডই সত্য আর অন্ধকারই আলোর সারাৎসার' (পৃ ২২)। সাধারণ বিচারবুদ্ধি যাকে অসম্ভব বা বিসদৃশ বলে জানে কল্পনার উদ্দেশ্যে আগ্রহদীপ্ত স্তোত্রমালা নিবেদন করে স্বপ্ন আর ঘুম কিংবা জাগ্রত নিদালির ঘোরে সেই অসম্ভব বিসদৃশের জগতে সাদৃশ্যের 'স্বতঃস্ফূর্ত, জেদী ও উদ্ধত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলো তারা [পরাবাস্তবাদীরা]' (পৃ ১৫৩)। ইতিহাস বা প্রত্নকল্পমুখিতাও লক্ষণীয় হল তাঁদের আচরণে।

উপরের আলোচনা থেকে একথাই স্পষ্ট হয় যে পরাবাস্তববাদিতা আসলে রোমানটিকতারই চরম অভিব্যক্তি। তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করেই নিলাম যে জীবনানন্দের সমস্ত কিছুতেই পরাবাস্তবতার লক্ষণ সংক্রামিত। কিন্তু পরাবাস্তববাদ যদি রোমানটিসিজমেরই উত্তরাধিকার হয় তাহলে জীবনানন্দকে তার জন্যে প্রতীচ্যের কাছে প্রাথমিক পাঠ নিতে হবে কেন। আমাদের নিজেদের কি রোমানটিসিজমের ঐতিহ্য কিছু কম ছিল ? জীবনানন্দের কাব্যধারা বিশ্লেষণ করে তাই আমরা দেখতে পাই যে তাঁর 'কবিতা আপাতভাবে যতো অভিনবই লাগুক না কেন, তিনি বাংলা কবিতার প্রবাহ-বিচ্যুত নন কিছুতেই' (শুদ্ধতম কবি : আবদুল মান্নান সৈয়দ : নলেজ হোম : ঢাকা : পৃ ৮৮), এবং আরও বলতে পারি 'বস্তুত পরাবাস্তব উপর্যুক্ত আন্দোলনের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিলো না ; যদিচ তাঁর কবিতাবলীর একাংশে পরাবাস্তবতার নিহিত সংক্রাম ঘটে গিয়েছিল' [তদেব : পৃ ১৩৫]।

স্বাভাবিক কারণে এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে : জীবনানন্দ কি তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর রোমানটিসিজমেরই পুনরাবৃত্তি ? তাঁর মধ্যে কি এমন কিছু ছিল না যা তাঁকে রোমানটিকদের থেকে সুনিশ্চিতভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে ? ছিল ; অবশ্যই ছিল। ছিল বলেই আজ 'তিনি একটা ইনস্টিটিউশন—সংস্থা' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ : প্রথম খণ্ড : বেঙ্গল পাবলিশার্স) ; তিনি 'কবিদের কবি' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : তদেব : দ্বিতীয় খণ্ড)। রোমানটিকরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বিদ্রোহের সুর জাগিয়েছিলেন, নানান দিক দিয়ে তাকে সম্ভাব্যতম শেষ-স্তরের ট্রাজিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। রোমানটিক কবিদের যা ছিল নিছক আত্মজ্ঞান, তাকে আত্মসচেতনতার চরম সূক্ষ্মতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। এবং এই করতে গিয়ে প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সমকালের বিশিষ্ট মানস-ভাবনাগুলিকে তিনি সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছিলেন তাঁর রচনায়। যা তাঁর আঙ্গিকে, ভাষায়, চিত্রকল্পে অসংখ্য নতুন মাত্রা সংযোজন ঘটিয়েছে—যা বিশ-শতকের সমস্ত আধুনিক কাব্যেরই চরিত্রলক্ষণ।

এখন দেখা যাক, আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটিতে জীবনানন্দের কাব্য-কবিতায় কিভাবে পরাবাস্তবতার লক্ষণ শনাক্ত করা হয়েছে এবং তা কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য। অসংখ্য উদাহরণ-উদ্ধৃতির মধ্যে স্থানাভাবে আমরা দু-একটি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব।

আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র একটি ইস্তাহারের উদ্ধৃতি দিয়ে (পৃ ১১০) গ্রন্থকারদ্বয় জানিয়েছেন পরাবাস্তববাদীরা সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্বপ্ন এবং স্বয়ংক্রিয় লিখন-পদ্ধতির ওপর। কোনোরূপ সৃষ্টিকর্মেই স্বপ্নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরাবাস্তববাদীদের ক্ষেত্রে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সচেতন সত্তা যুক্তি-শৃঙ্খলে বন্দী ; পায়ে-পায়ে তার সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন তোলা। কিন্তু পরাবাস্তববাদীরা যেন বলতে চেয়েছিলেন 'If a work of art is to be truly immortal it must pass quite beyond the limits of the human world, without any sign of common sense and logic' (পৃ ৩০)। সেটা সম্ভব স্বপ্নে। স্বপ্ন সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন তোলে না ; সে সর্ব-সমন্বয়ী। জাগ্রত অবস্থায় যে-সমস্ত বস্তু বা ভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বা অন্বয়বিস্তার অকল্পনীয়—স্বপ্ন তাদের মধ্যে অনায়াস সেতুবন্ধন ঘটিয়ে দেয়। ফলে অভাবিত বস্তু-ভাব-সম্বন্ধের পরিমিশ্রণে সৃষ্টি হয় বিচিত্র স্বাদ-বর্ণ-গন্ধের নানারূপ চিত্রকল্প। জীবনানন্দেও তার প্রকাশ ঘটেছে পাখির নীড়ের মতো চোখ কিংবা উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতার মধ্যে। তাই গ্রন্থকারদ্বয় বলেছেন 'জীবনানন্দের চিত্রকল্প যেভাবে আশ্চর্যের চকিত দ্যুতি বিকিরণ করছে, কবিতার গোটা আবহ যেভাবে হয়ে উঠেছে নিদালির ঘোরে আচ্ছন্ন, পরিবর্তমান এবং যেভাবে অবচেতনার প্রতীকী বর্ণিলতা দেখা যাচ্ছে বারবার—তাতে পরাবাস্তবের অনুষঙ্গ স্পষ্টত অভিব্যক্ত' (পৃ ৭৯)। জীবনানন্দের কাব্য-কবিতায় স্বপ্নের অনুষঙ্গ অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তাকে মাত্র অবচেতনার তাগিদ বলে চিহ্নিত করাও যথার্থ নয়। স্বপ্ন রোমানটিক ব্যক্তিমানুষের শেষ আশ্রয়বিন্দু হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। বিরূপ বিশ্বে যে মানুষ নিজেকে জানে নিয়ত একাকী কিংবা জীবনের স্থির লক্ষ্য পিশাচের উপজীব্য হওয়া ইত্যাদি জানা হয়ে গেলে তখন মানুষের আত্মাভিমানী শিল্পী-সত্তা স্বপ্ন ছাড়া আর কোথায় আশ্রয় খুঁজবে! সুতরাং জীবনানন্দের স্বপ্নাক্রান্তি কতটা পরাবাস্তবপ্রণোদিত আর কতটা রোমানটিক ব্যক্তিসত্তার চরম আর্তি—তা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

উপমা আর চিত্রকল্পের ব্যাপারেও অন্য কথা বলা যেতে পারে। অবিরল বস্তু বা ভাব-সম্বন্ধই যদি পরাবাস্তবতার গোত্রচিহ্ন হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথকেও তো সুররিয়ালিস্ট বলতে হয়। জরিমানা-দেওয়া মাইনের সঙ্গে ছাতার অবস্থার তুলনা, ভাগ্যের সঙ্গে ঘোলা জলের ডোবার, কিংবা রজনীগন্ধায় গরিবের মতো ফুল ধরা, নিরীহ দিনগুলোর ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকা—এসব দৃষ্টান্ত তো রবীন্দ্রনাথেও আছে। তিনিও কি প্রতীচ্যের পরাবাস্তব থেকে এগুলো আত্মসাৎ করেছিলেন ?

জীবনানন্দের কাব্যভাষা সম্পর্কেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মন্তব্য : 'জীবনানন্দ যে শুধু ক্লান্তিহীন নিরীক্ষার পথে গিয়ে কবিতার ভাষাকে জীবন্ত সত্তার অসামান্য মর্যাদা দিতে পারলেন, তার পেছনে পরাবাস্তববাদী শিল্পভাবনার ভূমিকা নিতান্ত গৌণ নয়' (পৃ.১৫২)। পরাবাস্তবপ্রভাবিত ভাষার নানারকম চরিত্রলক্ষণ নির্দিষ্ট করেছেন তাঁরা ; যেমন—শব্দ দিয়ে নিঃশব্দকে ছোঁওয়া, শব্দের চারদিকে জ্যোতির্ময় শূন্যের বলয় রচনা, বিপরীত শব্দবন্ধের পাশাপাশি সংস্থানের দ্বারা ভাষায় নতুন গতি আর মাত্রা যোগ ইত্যাদি। একথা ঠিক যে শব্দচয়ন এবং সংস্থানে জীবনানন্দের ভাষায় একটি অদৃষ্টপূর্ব শিল্পিতা লক্ষ করা যায়। উপরোক্ত লক্ষণাবলীও তাঁর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দবন্ধে হয়তো অনুপস্থিত নয়। এমন কি আপোলেনিয়ার কবিতায় চিত্রশিল্পের মাত্রা যোগ করতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার সার্থক আবিষ্কারও জীবনানন্দে দৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু মাত্র তাতেই কি জীবনানন্দের ভাষা পরাবাস্তবপ্রভাবিত প্রমাণিত হবে ? প্রত্যেক সার্থক কবিই তাঁর প্রতিভার পরশমণির ছোঁওয়ায় মরচেধরা শব্দে নতুন হিরণ্যদ্যুতি সঞ্চার করেন। জীবনানন্দও তাই করেছিলেন—এমন ভাবলেই বোধহয় তাঁর প্রতি সুবিচার হবে।

গ্রন্থকারদ্বয় অন্যত্র মন্তব্য করেছেন 'সত্য ও প্রতীয়মানের অপূর্ব কোলাজ

আরাগঁ, ব্রেতোঁ, ডেনো বা সোপোর কবিতায় যে-ভাবে পাই—জীবনানন্দের কাব্য-ভাষাও সেই অনির্বচনীয়ের আভাস নিয়ে আসে।…বাক-প্রতিমার কাঠামো ভেঙে চিন্তার সুসংবদ্ধতা ছিন্ন করে কিছু কিছু শব্দ হঠাৎ যেন রকেটের মতো উৎক্ষিপ্ত হয়েছে অনন্তে' (পৃ ১২১-২২)। পরাবাস্তববাদী কাব্যভাষার অন্যতম প্রধান চরিত্রলক্ষণ হল এই গতির উদ্দামতা। কেননা, পরাবাস্তববাদীদের কাছে 'গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ আত্মিক স্বাধীনতার বিলুপ্তি' (পৃ ১৪৬)। এই গ্রন্থে জীবনানন্দের কাব্য-ভাষাতেও সেই দুর্মর গতির কথা উল্লেখ হয়েছে একাধিক বার 'শব্দ বন্ধনহীন মুক্তির আবেগে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে' (পৃ ১৩৮)। জীবনানন্দের ভাষার এই গতির ব্যাপারে আমরা কোনো মন্তব্য না করে মাত্র একটি উদ্ধৃতির উপহার দিতে চাই বুদ্ধদেব বসু থেকে : 'উদ্দাম জলস্রোতের মতো তোড় এর নেই ;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে ঠেকে উদাস, অলস গতিতে বয়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি' [পৃ ৮৪ : বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ : নবার্ক]।

এ ছাড়াও পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে আরও নানাভাবে জীবনানন্দের সাদৃশ্য অনুভব করেছেন গ্রন্থকারদ্বয় ; যেমন—প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাস পুরাণ লোককথা এ ব্যাপারটিকে কোনো বাহ্যপ্রভাব-ঘটিত না বলে বিষ্ণু দে-র অনুসরণে বলা যায় 'প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা' [সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : পৃ ৪৯]) ইত্যাদির প্রয়োগ, পাখির প্রতীকী ব্যবহার (পৃ ১৪৫), ভালোবাসাকে শঠ ও প্রবঞ্চক পৃথিবীর বিরুদ্ধে এক দুর্মর বিদ্রোহ হিসেবে জানা (পৃ ১২৩) ইত্যাদি। এমনি সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসংখ্য ব্যাপারে জীবনানন্দে পরাবাস্তববাদের প্রভাব লক্ষ করেছেন তাঁরা।

জীবনানন্দ দাশে যে স্যুররিয়ালিজমের প্রভাব আছে তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে ভাবে তাঁর কাব্য, কবিতা, ভাষা, শব্দ, চিত্রকল্প, প্রতীক প্রভৃতি প্রায় সমস্ত কিছু থেকে পরাবাস্তবতার চিহ্ন খুঁজে বার করা হয়েছে, তাতে কিছুটা বিস্মিত হতে হয়। পরাবাস্তববাদী চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ছাড়া কোনো কাব্য-কবিতা বুঝি সার্থক হতে পারে না। জীবনানন্দের রচনাতেও তাই যেখানে যেটুকু উৎকর্ষ আছে তা সবই পরাবাস্তবতার প্রসাদপুষ্ট। এ ধারণার সমর্থনে গ্রন্থকারদ্বয় যেভাবে অনর্গল উদ্ধৃতি উপহার দিয়েছেন তাতে তাঁদের বৈদগ্ধ্য প্রমাণিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কবির সেই "সমারূঢ়" কবিতাটিকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সমস্ত কিছুকে পরাবাস্তবতার দাঁড়িপাল্লায় ফরমুলা-মাফিক ওজন করা জীবনানন্দের প্রতি কতটা সম্মানজনক সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

গ্রন্থটির এক জায়গায় গ্রন্থকারদ্বয় উল্লেখ করেছেন 'স্মরণ করা যেতে পারে, কোনো সার্থক রচনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব্রেতোঁ-র মতে ছিল surrealist' (পৃ ১০৩)। জানি না ব্রেতোঁর সেই মত গ্রন্থকারদ্বয়েরও অভিমত কিনা। কিন্তু জীবনানন্দের রচনাকে সার্থক প্রমাণ করতে তাঁরা তাঁকে আপাদমস্তক পরাবাস্তববাদী প্রমাণ করতে যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টার নমুনা দেখালেন তাতে জীবনানন্দের আর-একটি উক্তি মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন 'কাব্য চেনবার আস্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাবপদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়' (জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা : ভারবি)। জানি না, এখানেও তাই হল কি-না। জীবনানন্দকে যথার্থরূপে দেখব এবং দেখাব বলে গ্রন্থকারদ্বয় যখন পরাবাস্তবতার বৈদগ্ধ্যপ্রভা বিস্তার করতে ব্যস্ত তখন তার অন্তর্নিহিত অন্ধকারের আড়াল দিয়ে কবি এবং তাঁর কাব্য-সত্য মুখ টিপে হাসতে-হাসতে তাঁদের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরকেও এড়িয়ে গেলেন বোধহয়।

পরিশেষে উল্লেখ করব গ্রন্থটির পর্যাপ্ত মুদ্রণপ্রমাদের কথা। বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধমূর্তি সংস্থাপিত করে এখানে আমরা তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পারি :

ক. 'চালের ধূসর গ [ে] ন্ধ তরঙ্গেরা রূপ হয়ে…' পৃ ৭৬,

খ. 'সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে সে [য] ই পাখি দেয় ধরা' পৃ ৭৯,

গ. "এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গু [গু] ঞ্জরনময়!" পৃ ১৫৮।

এ ছাড়া কবি-প্রযুক্ত যতিচিহ্নের ওপরেও স্থানে স্থানে যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে।

বিস্ময়চিহ্নের বাহুল্যের বিস্ময়কে ছাড়িয়ে তীব্র হয়ে ওঠে ক্ষোভ যখন

দেখি কবির কোনো ছত্রের মধ্যে সংস্থাপিত হয়েছে নতুন কোনো শব্দ ; যেমন

> সকল লোকের মতো [শব্দ] বীজ বুনে আর / স্বাদ কই! ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে, / শরীরে মাটির গন্ধ মেখে, / শরীরে জলের গন্ধ মেখে, (পৃ ১২৯)

কিংবা কোনো ছত্রের ভিতর দিয়ে বেমালুম উধাও করে দেওয়া হয়েছে কোনো শব্দ ; যেমন

> যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ / শেষ সোনালী হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন ;/তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে/শত-শত মৃগীদের চোখের [ঘুমের] অন্ধকারের ভিতর! (পৃ ৮৬)

প্রথম উদাহরণে বন্ধনীভুক্ত শব্দটি সংযোজিত এবং দ্বিতীয়টিতে বর্জিত। এ ছাড়া "মহাপৃথিবী" কাব্যের "শ্রাবণ-রাত" কবিতার নিম্নোদ্ধৃত ছত্রকটিকে "মনে হয়" নামক কবিতার অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে [পৃ ১৯৩]।

> চোখ তুলে আমি / দুইস্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম ;/সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।" (পৃ ৮৬)

"মনে হয়" শিরোনামে কবির কোনো কবিতা বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ-র "মহাপৃথিবী"-তে স্থান পায় নি।

শেষ করার আগে বলব গ্রন্থটিতে 'আনখশির' শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগ যেমন শব্দটির মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটিয়ে আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে, ঠিক তেমনি 'নিষ্ণাত' শব্দটির অন্তত বারো-চোদ্দোবার প্রয়োগ আমাদের কৌতূহলও জাগিয়েছে। এ ধরনের গুরুগম্ভীর এবং অপ্রচলিত শব্দাসক্তি অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

ক. ["নিষ্ণাত" শব্দটির অর্থ "চলন্তিকা" অনুযায়ী—পারংগত, বিশেষ দক্ষ…]

খ. "তিনিই 'প্রাশস্ত্যতম' আধুনিক" পৃ ১৪ [প্রাশস্ত্যতম শব্দটি চলন্তিকাতে পাই নি]

গ. "পুরোনো ও নতুনের নিরন্তর 'আপান-প্রসন'" পৃ ৬২ [আপান কথাটির অর্থ পানভূমি ; মদের দোকান ; কিন্তু .প্রসন শব্দটিকে চলন্তিকায় পাইনি]

ঘ. "কবি তখনো আত্মারাম আত্মক্রীড় হয়ে ওঠেন নি" পৃ ১১৫

ঙ. 'বাকনির্মিতি কবির আত্মপ্রকাশের প্রতিটি ধাপকে তিমির-'নিষণ্ণ' আলোয় উদ্ভাসিত করেছে।' পৃ-১৪২ [নিষণ্ণ শব্দটির অর্থ : উপবিষ্ট ; শায়িত]।

জয়কৃষ্ণ কয়াল

স্নেহলতার মৃত্যু : একটি আন্দোলনের জন্ম

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

'একটি ১৪ বছরের মেয়ের একজন শিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। ছেলের বাবা যে পণ চায় মেয়ের বাবা তাহার সমস্তটা যোগাড় করিতে না পারিয়া শেষে নিজের বসতবাটীটি পর্যন্ত বন্ধক দিবার বন্দোবস্ত করেন। তাহার বিবাহের জন্য পিতামাতা সর্বস্বান্ত ও গৃহহারা হইতেছেন, এই চিন্তা বালিকাকে ব্যাকুল করে। সে বাপ-মাকে ঘোর দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে মুক্তি দিবার জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে।' ("প্রবাসী" / ফাল্গুন ১৩২০)

চোদ্দ বছরের এই মেয়েটির নাম স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়। সে আত্মহত্যা করেছিল আজ থেকে ৭৪ বছর আগে, বাঙলা ১৩২০ সালের ১৬ই মাঘ (৩০ জানুয়ারি, ১৯১৪ খ্রী)।

ব্রজগোপাল নিয়োগী-সম্পাদিত "মহিলা" পত্রিকা (ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪) থেকে স্নেহলতা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এইরকম : তার পিতার নাম হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাদের বাড়ি ছিল কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে, ৪৩/১ রাজবল্লভ স্ট্রীটে। স্নেহলতার যেখানে বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল সেখানে পাত্রপক্ষের দাবি ছিল ৪০০ টাকা নগদ আর ১২০০ টাকার মতো অলংকার। এই টাকা যোগাড় করা হরেন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত তিনি বাড়ি বাঁধা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। পিতার এই অবস্থা দেখে স্নেহলতা নিজেকে ধ্বংস করে পিতাকে মুক্তি দেবার কথা ভেবেছিল আর তাই ১৬ই মাঘ দুপুরে সে 'কেরোসিন তৈলে সাড়ীখানি সিক্ত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। অগ্নি লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য জ্বলিয়া উঠিল।'*

২

পণ-যৌতুকের পীড়নে সর্বস্বান্ত-হতে-বসা পিতামাতাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে কন্যার আত্মহত্যার ঘটনা এই প্রথম নয়। স্নেহলতার মৃত্যুর পর পত্রপত্রিকায় যেসব লেখা বেরিয়েছিল, তাতে এরকম আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নেহলতা ইতিহাস হয়ে আছে ; তার কারণ একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেই সময়কার বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে যে আলোড়ন—"ভারতী" পত্রিকার ভাষায় 'দেশ-ময়' যে একটা 'হাহাকার'—পড়ে গিয়েছিল, তার নজির স্নেহলতার মৃত্যুর আগে বা পরে খুব বেশি নেই। বলা যেতে পারে, বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত এমন কোনো পত্র-পত্রিকা ছিল না, যেখানে স্নেহলতার মৃত্যু এবং সেই প্রসঙ্গে পণপ্রথা নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয় নি। ১৯১৪ ফেব্রুয়ারির "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি—সেখানে প্রায় প্রতিদিনই এ বিষয়ে কিছু-না-কিছু লেখা আছে। স্নেহলতাকে নিয়ে লেখা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "মৃত্যু-স্বয়ম্বর" (প্রবাসী / চৈত্র ১৩২০) কবিতাটির কথাই বেশি করে শোনা যায়। কিন্তু আমরা সন্ধান করে দেখেছি, অন্তত আরও পাঁচজন কবি স্নেহলতাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রমথ

সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ

চৌধুরী ("সাহিত্য" / ফাল্গুন ১৩২০), গোবিন্দচন্দ্র দাস ("নব্য ভারত" / ভাদ্র ১৩২১), কালিদাস রায় ("মানসী" / বৈশাখ ১৩২১)। এ ছাড়া প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত ("নব্য-ভারত" / ফাল্গুন, ১৩২০) এবং "বামাবোধিনী"-তে (আষাঢ় ১৩২১) জনৈকা মহিলা-কবি স্নেহলতাকে নিয়ে কবিতা লেখেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি (১৯১৪)-র "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় 'স্নেহলতা' নামে একটি ইংরেজি কবিতাও প্রকাশিত হয়। স্নেহলতার মৃত্যুর বছরটিতেই যে রবীন্দ্রনাথ "হৈমন্তী", "স্ত্রীর পত্র", আর "অপরিচিতা"-র মতো গল্প লিখলেন, তার কারণও—প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীতে যদিও সেরকম কোনো ইঙ্গিত নেই—অনেকে মনে করেন স্নেহলতার মৃত্যু।

স্নেহলতার স্মরণে কলকাতায় অন্তত দশ-বারোটি সভা হয়েছিল। সেইসব সভায় উপস্থিত ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র (প্রাক্তন বিচারপতি) এবং লালমোহন বিদ্যানিধি-র মতো ব্যক্তিরা। ২২ ফেব্রুয়ারি ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি সভা হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা-র মতো তুলনায় রক্ষণশীল সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা (১৮ ও ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪) থেকে জানতে পারি, পূর্ববাঙলার ময়মনসিংহ আর বিহারের মজঃফরপুরের মতো জায়গাতেও প্রতিবাদসভা হয়েছিল। সুতরাং স্নেহলতার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া কেবল কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই ঢেউ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মনে করতে পারেন, 'আমাদের গ্রামাঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছেছিল। সর্বত্রই স্নেহলতার আলোচনা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার উপর সমাজের অত্যাচার ও পণপ্রথার নিন্দা ধ্বনিত হতে লাগল।' ("চলমান জীবন", ১ম খণ্ড / পৃ. ১৩-১৪)

সভাসমিতিগুলি কেবল স্নেহলতার আত্মার শান্তি কামনা করেই তাদের কর্তব্য শেষ করে নি, পণপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা-ধিক্কার যেমন ছিল, তেমনি ছিল কী করে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ ঘটানো যায়—সে বিষয়ে আলোচনাও। আর অধিকাংশ সভাতেই, অবিবাহিত যুবকেরা অগ্নিসাক্ষী করেই শপথ করেছিলেন, তাঁরা বিবাহে পণ নেবেন না ; এমনকি পিতামাতা যদি নিতে চান, তাহলে তাঁরা তার বিরোধিতা করবেন ("অমৃতবাজার পত্রিকা" / ১৮ ফেব্রুয়ারি ; "প্রবাসী" / চৈত্র, ১৩২০)। "ভারতী" / (চৈত্র, ১৩২০) পত্রিকার ভাষায় : 'বাংলাদেশের চারি-দিকে সভাসমিতি বসিতেছে। স্থানে স্থানে অবিবাহিত যুবকগণের নিকট হইতে এই প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইতেছে যে, বিনা পণে বিবাহ করিতে হইবে।' ২১ ফেব্রুয়ারি আহূত কলেজ স্কোয়ারের বিখ্যাত সভাটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই সভার উদ্দেশ্য হল : 'to devise means to stop the social evil of extorting marriage dowry' ; পণপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনও (Anti-Marriage Dowry League) গড়ে তোলা হয়। ("অমৃতবাজার" / ১৯ ও ২১ ফেব্রুয়ারি)

৩

এটা মনে রাখতে হবে যে, পণপ্রথার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশ অন্তত এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই সরব হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ "দেনাপাওনা" গল্প লিখেছিলেন গত শতকের শেষেই (১৮৯১ খ্রী) ; ১৯০৫ খ্রী প্রকাশিত হল গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটক, যার বিষয় ছিল 'বাঙালীর কন্যাবিবাহে অর্থপণ দানরূপ ব্যাপারের বীভৎসতা প্রদর্শন।' বাঙলা ১৩০৭-৮ নাগাদ "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পণপ্রথাকে ব্যঙ্গ করে 'ভ্যালুপেয়েবল বর' নামে একটি নকশা লিখেছিলেন আর স্নেহলতার মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছিলেন একটি তীব্র শ্লেষের কবিতা : 'থাকুক আমার বিয়া' ("প্রতিভা" / শ্রাবণ ১৩১৮)—যেখানে মেয়েটি সরাসরি ঘোষণা করেছিল : 'বাবা ! থাকুক আমার বিয়া / আমি চাইনে এম. এ বি. এ কিনতে হয় যা / টাকা দিয়ে / ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া···'। "নব্যভারত" (চৈত্র ১৩২০) পত্রিকার একটি লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে, গোবিন্দচন্দ্রের এই কবিতাটি চুনের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছাপা হয়ে 'কলি-কাতার রাস্তায় রাস্তায় বিলি হইয়াছিল।' পণপ্রথা বিষয়ে পত্রপত্রিকায় লেখাও চলছিল। বীরেশ্বর সেন নামে জনৈক ব্যক্তি "ভারতী"-তে (ফাল্গুন ১৩১৯) পণপ্রথার সমর্থনে ঘোরতর আপত্তিকর একটি প্রবন্ধ লেখেন—পরবর্তী সংখ্যাতেই তার তীব্র প্রতিবাদ করেন সুবোধচন্দ্র সরকার। স্নেহলতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় স্বীকার করা হয়, পণপ্রথা নিবারণের জন্য গত বিশ-তিরিশ বছর ধরেই 'বিবিধ প্রকার চেষ্টা হইতেছে' এবং এমনই পরিহাস যে, স্নেহলতাকে যখন পুড়ে মরতে হচ্ছে সেই সময়ই নারী-বিষয়ক পত্রিকা "বামাবোধিনী" (প্রতিষ্ঠাতা—উমেশচন্দ্র দত্ত)-তে 'বিবাহে পণগ্রহণ' নামে একটি রচনা ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করলে এটাই দাঁড়ায় যে, পণপ্রথার বিরোধী একটা মনোভাব স্নেহলতার মৃত্যুর আগে থাকতেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তত একটা ছোটো অংশের মধ্যেও গড়ে উঠে-ছিল—স্নেহলতা নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে সেই চাপা বিক্ষোভের বারুদে একটি স্ফুলিঙ্গ ছুঁইয়ে দিয়ে যায়।

কিন্তু স্নেহলতার আত্মহত্যাকে বাঙালি মধ্যবিত্ত কী চোখে দেখেছিল ? তার মৃত্যুর পর এত যে সভাসমিতি—নিন্দা-ধিক্কার, এত যে সব প্রতিবাদী রচনা—তার মূল সুরটি কী ছিল ?

*কোনো-কোনো পত্রিকায় স্নেহলতার মৃত্যুর তারিখ ৩১ জানুয়ারি বলা হয়েছে।

খুবই বিস্ময়ের কথা যে, আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে স্নেহলতা গোটা সমাজের মুখে তার যে প্রতিবাদটা ছুঁড়ে মেরেছিল, সমকালীন লেখকদের চোখে সেটা তেমন বড়ো হয়ে ধরা পড়ে নি। তাঁরা বরং 'স্নেহলতাকে 'সতী' বা 'দেবী' ভেবে নিয়ে তার ত্যাগের মহিমা কীর্তন করতেই বেশি আগ্রহ বোধ করেছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরীর মতো যুক্তিবাদী লেখকের কলমেও স্নেহলতা 'স্বয়ম্বরে' বরণ করেছে 'বৈশ্বানরে / দেবতার আলিঙ্গন করি অঙ্গীকার।' কালিদাস রায় স্নেহলতাকে সম্বোধন করেছেন 'দেবি' বলে আর তার মনে হয়েছে, বালিকার এই ত্যাগ বঙ্গভূমে জাগাবে 'গৌরবের স্মৃতির শোণিমা'। ১৫ ফেব্রুয়ারি কালীঘাটের একটি সভায় স্নেহলতার মৃত্যুকে 'জহর' বলে বর্ণনা করা হয় ("অমৃতবাজার" / ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪), "মাহিষ্য মহিলা" পত্রিকার (মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২০) একটি রচনায় 'বাঙ্গালী কুমারীর' এই 'জহরব্রত'-র দৃষ্টান্তে উদ্ধেগ প্রকাশ করা হয় আর "যমুনা" পত্রিকার চৈত্র (১৩২০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "স্নেহলতার পুণ্য কাহিনী" স্মরণ করে লেখা একটি উপাখ্যান—যেখানে দেখানো হয়, অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার সময় বালিকার 'মুখ চোখ দিয়া এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল।' "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত পত্রগুলিতে অনেক সময়ই স্নেহলতার মৃত্যুকে 'heroic death' বলা হয়েছে; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেও স্নেহলতা কীর্তিত হয়েছেন 'অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ' বলে।

অবশ্যই এর পাশাপাশি তীব্র মন্তব্যও ছিল। যে নিষ্ঠুর প্রথার পীড়নে স্নেহলতাকে প্রাণ দিতে হল তার বিরুদ্ধে ধিক্কার নিন্দা-ধিক্কার, তিক্ত সমালোচনা, কখনও-কখনও গোটা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল। যেমন কালিদাস রায় কবিতাটি শুরু করেছিলেন 'এই সমাজের মাথার পরে হানো দারুণ বাজ'—আহ্বান দিয়ে। প্রমথ চৌধুরী স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 'শাস্ত্র-কারাগারে' বন্দী সমাজের দাস্য মনোভাবের কথা; গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে লিখেছিলেন, 'ছাইকপালী' মেয়ে 'একেবারে বাঙ্গলা মুলুক ছেয়ে' আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। "প্রবাসী"তে (ফাল্গুন ১৩২০) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পণপ্রথাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন এইরকম ভাষায়: 'কেহ যদি···বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতে বাপমাকে টাকা লইতে দেন তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি!' আর ধীরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী ("প্রবাসী" / চৈত্র ১৩২০) বিয়ের নামে এই 'জঘন্য অর্থগৃধ্নুতার' সমালোচনা করতে গিয়ে তুলে ধরেছিলেন এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নটি: যে কন্যাকে চায় না, টাকা চায়, 'সেই অর্থপিশাচ কি আমার কন্যার সুপাত্র?' কিন্তু সব মিলিয়ে রচনাগুলির মধ্যে চড়া আবেগ যতটা ছিল, স্নেহলতার আত্মবলিদানের জন্যে হাহাকার যতটা ছিল, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গি ততটা ছিল না। বরং বলা যায়, এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে পণপ্রথা বিষয়ে যে অজস্র লেখা বেরিয়েছে, তার মধ্যে বেশ কিছু তীব্র সমালোচনা এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত ছিল। অবশ্য এই লেখাগুলির মধ্যেও পরস্পরবিরোধিতার অনেক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৫

পণপ্রথার মতো এ-রকম একটা নিষ্ঠুর ব্যবস্থার ভয়াবহতা যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার মূলে আছে, অনেকেই মনে করেছিলেন, মেয়েদের বাল্যবিবাহের বাধ্যবাধকতা। আচারভিক্তিক হিন্দু সমাজ কন্যার পিতার ওপর এই অনুশাসন চাপিয়ে দিয়েছে; ফলে সমাজে নিজের মান বাঁচাতে মেয়ের বাপ পণের দাবি মেনে নিয়ে যেমন করে হোক মেয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতে চায়; সমাজের এই চাপই পণপ্রথাকে মদত দিচ্ছে: 'আমি যে আমার কন্যাকে নির্দিষ্ট বয়সের উপর আমার ঘরে রাখিতে পারি না, রাখিলে আমার মাথা যায়।···হুতরাং যে তাহার আদর জানে না, যে তাহাকে চায় না, তাহারই হাতে দিতে হইবে; সর্বস্ব পণ করিয়াও আমি ইহা করিতে বাধ্য।' (ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী / "প্রবাসী", চৈত্র ১৩২০) কিন্তু যদি 'বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে ব্যস্ত না হই, যদি অবস্থানুযায়ী পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হই' তাহলে এ প্রথা থাকে না। (রসিকলাল রায় / "নব্যভারত", চৈত্র ১৩২০) 'বঙ্গীয় কায়স্থ সভা'র পক্ষ থেকেও বাল্যবিবাহপ্রথার বিরোধিতা করা হয় ("কায়স্থ পত্রিকা", মনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত; চৈত্র ১৩২০) এবং "ভারতী"-তে শ্রী নিস্তারিণী দেবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা

করেন: মায়েরা যদি 'প্রতিজ্ঞা করেন মেয়েকে বড় করিয়া বিবাহ দিব, চিরকুমারী রাখিব সেও স্বীকার তবু পণ দিব না, তবেই স্নেহলতার আত্মহত্যা সার্থক হইবে।' (চৈত্র ১৩২০) "বামাবোধিনী" (বৈশাখ ১৩২১)-তেও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হয়।

বস্তুত শেষের এই আহ্বানটি—প্রয়োজনে মেয়েকে আইবুড়ো রেখে দেবে, তবু পণ দেবে না—সেই সময়কার অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। গোবিন্দচন্দ্র দাস স্নেহলতার মৃত্যুর আগেই এই ধ্বনি তুলেছিলেন "থাকুক আমার বিয়া" কবিতায়, যেখানে বলা হয়েছিল, দরকার হলে সারাজীবন কুমারী থেকে মেয়েটি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বা মেরী কার্পেণ্টারের আদর্শে 'দীনের সেবায়' জীবন সমর্পণ করবে, কিন্তু বিয়ের নামে 'অমন পশু কিনব নাকো কাণা কড়ি দিয়া'। স্নেহলতাকেও তিনি 'দেশের সেবা'-র মতো 'পুণ্যকীর্তি'-র কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২১) সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একই মত পোষণ করেন।

কিন্তু এই দৃপ্ত আহ্বানটির মধ্যে দারুণ একটা তেজ প্রকাশ পেলেও, এটা কতদূর বাস্তবসম্মত তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায়। হাজার বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা হিন্দু সমাজ কন্যার পিতার এই ঔদ্ধত্য সহ্য করবে, ভাবতে কষ্ট হয়। ঠিক যেমন অবিবাহিত যুবকেরা পণ নেবে না বলে শপথ করলেও, কার্যক্ষেত্রে তারা যে সেই শপথ রক্ষা করতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যুবকদের শপথগ্রহণের এই ব্যাপারটিকে অবশ্য অনেকেই বাঁকা চোখে, কেউ-কেউ বা বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখেছেন; যেমন "ভারতবর্ষ" পত্রিকার চোখে এটা ছিল 'আমাদের গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সমাজের' একটা 'হৈ-চৈ' (মাঘ ১৩২১)। "ভারতী" (চৈত্র / ১৩২০) এবং "প্রবাসী" (চৈত্র / ১৩২০)-তেও এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এই যুক্তিতে যে, 'যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন তাহারা সকলেই যে কার্য্যকালে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন এমন কথা জোর দিয়া বলা যায় না।' এইসব যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েও, আমাদের একটু বিস্ময় জাগে যে, এই আপাত আনুষ্ঠানিক (ritualistic) ব্যাপারটির ভেতর দিয়ে সেদিনের তরুণসমাজ তাদের যে প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তার প্রতীকী মূল্য কোনো লেখকের কাছেই খুব বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি।

মেয়ের বিয়ের বয়স কমানোর দাবিটি স্বভাবতই জোরালো বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর মতো ব্যক্তি "বঙ্গলী" পত্রিকায় এরকম দাবি তুলেছেন দেখে "যমুনা" পত্রিকার (বৈশাখ ১৩২১) উদ্বেগের শেষ ছিল না। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সভায় জনৈক বক্তা খোলাখুলিই জানিয়েছিলেন যে, এর ফলে মেয়ের ওপর বাপমায়ের নিয়ন্ত্রণ আর থাকবে না; অতএব এই নিয়ম চালু হলে সমাজের সমূহ সর্বনাশ। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র (২৪ ফেব্রুয়ারি) সম্পাদকীয়তেও বাল্যবিবাহের সমর্থন করা হয়।

বাঙালি যুবকদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারই পণপ্রথার মূল কারণ—এরকম একটি ধারণাও কোনো-কোনো রচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'থাকুক আমার বিয়া' কবিতাটিতে এরকম একটি ইঙ্গিত ছিল; পরবর্তী কালে এই মত প্রকাশ করেছে এমন রচনাগুলির মধ্যে আছে: 'সমাজ প্রসঙ্গ' ("যমুনা", বৈশাখ ১৩২১) এবং 'কন্যাবিবাহ সমস্যা' ("ভারতবর্ষ", মাঘ ১৩২১) "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকাতেও (বৈশাখ ১৩২১) পণপ্রথার সঙ্গে 'পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের' সম্পর্ক দেখানো হয় এবং মনের 'কামনারি' দূর করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে 'ধর্মশিক্ষা', 'সদাচার শিক্ষা'-র প্রসার এবং সেই সঙ্গে 'পাশ্চাত্ত্যভাবের অবাধ গতি রোধের' প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়।

পণপ্রথার সমালোচনায় অন্যান্য যে কয়েকটি কারণ দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে আছে, পুরোনো একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপ, ফলসা মেয়ের প্রতি ছেলেদের অত্যধিক আকর্ষণ ("অমৃতবাজার" / ২৪. ২. ১৯১৪) কৌলীন্যপ্রথা ("কায়স্থ পত্রিকা" / চৈত্র ১৩২০) কন্যার পিতার শিক্ষিত জামাই করার ঝোঁক ("যমুনা" / বৈশাখ ১৩২১) ইত্যাদি।

স্বীকার করতে হবে, এইসব আলোচনার ভেতর থেকে এমন কিছু-কিছু যুক্তি, মন্তব্য, সুপারিশ উঠে এসেছিল, যা আজকের বাঙালি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেও রীতিমতো প্রগতিশীল বলে মনে হবে। "প্রবাসী" এবং "ভারতী"-তে নারীর অধিকার এবং মর্যাদার কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়। পণপ্রথাকে 'জাতীয় কলঙ্ক' বলে চিহ্নিত করে প্রবাসী লেখে: যুবকদের উচিত 'প্রেমের পাত্রীকেই' কেবল বরণ করা এবং 'বাপমা-ও যদি অধর্ম

করিতে বলেন তাহা করা উচিত নয়' (ফাল্গুন ১৩২০)। নগেন্দ্রনাথ রায় 'ভারতী'-তে (বৈশাখ ১৩২১) স্বেচ্ছা-বিবাহের সমর্থনে মন্তব্য করেন, স্বেচ্ছাবিবাহ প্রচলিত হলে অন্তত 'মেয়ের জন্ম সমাজের পক্ষে দুর্ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' "কায়স্থ পত্রিকা" স্ত্রী-পুরুষের 'একই প্রকার সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা'-র দাবি তোলে (চৈত্র ১৩২০) এবং রসিকলাল রায় তাঁর বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে 'পাত্রপাত্রীদের মধ্যে স্বেচ্ছানির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন', 'জাতি-ভেদ উচ্ছেদ', বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রচলন এবং জাতাভিমান বর্জনের ওপর জোর দেন। ("নব্যভারত" / চৈত্র ১৩২০)

আলোচনা যেখানে জাতিভেদ বা কৌলীন্যপ্রথার বিনাশ দাবি করছে, সেখানে বলা যায় প্রায় হিন্দু সমাজের গোড়া ধরেই টান দেওয়া হচ্ছে। মেয়ের বিয়ের বয়স বাড়ানোর দাবিও তথাকথিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত একটি অনুশাসনকে চ্যালেনজ জানাতে পেরেছিল।* সব মিলিয়ে পণপ্রথা বিষয়ে এইসব আলোচনা-সমালোচনায় ঘাত-প্রত্যাঘাতে বিশ শতকের প্রথম পর্বের বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বেশ বড়ো রকম একটা নাড়া খেয়েছিল—রীতিমতো একটা বিতর্কের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল,—এমন অসমান নিশ্চয়ই অসংগত হবে না। "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা"কে 'বিবাহ ব্যাপারে পণপ্রথা নিবারণের ব্যবস্থা করা হউক' বলে বিধান দিতে হয়েছিল, কবুল করতে হয়েছিল, ব্রাহ্মণ-দের 'বিভিন্ন মেলে' সম্পর্ক চলবে—তাতে 'কৌলীন্যের কোন হানি হইবে না' ("ব্রাহ্মণসমাজ", ফাল্গুন ১৩২০)। কৌলীন্যপ্রথাকে 'অতি মহৎ' বলে মনে করলেও "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" এই প্রথার বিলোপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিল ("কায়স্থ সমাজ" / চৈত্র ১৩২০)। যুবকরা পণ নেবে না বলে শপথ করছে এবং মেয়ের বিয়ের বয়স বাড়াতে হবে বলে দাবি তোলা হচ্ছে—এইসব 'হুজুগে' রক্ষণশীল সমাজের বিধাতারা রীতিমতো প্রমাদ গণতে থাকেন এবং সম্ভবত সেই কারণেই তাঁরা স্নেহলতাকে 'সতী' বা 'দেবী' বানিয়ে তার 'মর্ম্মরমূর্ত্তি' স্থাপন করতে চান। ("প্রবাসী"/ বৈশাখ ১৩২১) কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণতি কী দাঁড়ায়? সেই সময়কার বাঙালি মধ্যবিত্ত—অন্তত তার বুদ্ধিজীবী সমাজটিও-কি চেয়েছিলেন, পণপ্রথা সমূলে বিনাশ হোক? সেইরকম কোনো অবিসংবাদিত দাবি কি এই উত্তপ্ত বাদ-প্রতিবাদের আবর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত উঠে আসতে পেরে-ছিল?

৬

স্নেহলতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা এবং সভা-সমিতি-র বক্তৃতাগুলির মধ্যে একটি সামান্য লক্ষণ আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে পেতে পারি, তা হল : পণপ্রথার মতো 'অতি তামসিক ও জঘন্য' একটি ব্যবস্থার নির্বিবাদ নিন্দা। সতেন্দ্রনাথ দত্ত তিক্ত বাঙ্গে বলেছিলেন—'কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা / পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়'; "মহিলা" পত্রিকায় এই প্রথাকে বর্ণনা করা হয়েছিল 'মাংস ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়' বলে (মাঘ ১৩২০) আর "কায়স্থ পত্রিকা" (ফাল্গুন ১৩২০) পণ যারা চায় তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল : 'এই সকল অর্থলোলুপ নরপিশাচদিগকে আপনারা সমাজের কোথায় স্থান দিবেন?'

সুতরাং নিন্দা-ধিক্কারের ভাষা যে যথেষ্ট তীব্র হয়েছিল, সন্দেহ নেই। পণপ্রথার মতো নির্মম একটা ব্যবস্থা যে রহিত হওয়া উচিত—এরকম একটা মনোভাবও মোটামুটি প্রকাশ পেয়েছিল ; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, এই প্রথার একে-বারে আগাপাশতলা উচ্ছেদের দাবি তোলা উচিত কিনা, তাই নিয়ে কোনো নির্দ্বিধ, নির্বিবাদ মত পাওয়া যায় নি। যুক্তিগুলি মোটামুটি এসেছিল এ-রকম : বলপূর্বক পণ আদায় নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়া উচিত কিন্তু পিতা 'প্রিয়তম দুহিতাটিকে' তার বিয়ের সময় যে সব 'আভরণ তৈজসপত্র ও অর্থ' দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। তা যৌতুক নয়, ভালবাসার দান। ("নব্যভারত"/-প্রাগুক্ত ; "ভারতী" / চৈত্র, ১৩১৯)। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, "ভারতী" পত্রিকার (ফাল্গুন ১৩১৯) একটি রচনায় বরপণের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, পাত্র যদি বিবাহিত জীবনের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য বা পড়াশোনার খরচ মেটানোর জন্য পণ নেয়, তাতে দোষ নেই। এই রচনাটির প্রতিবাদ প্রকাশিত হলেও, সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী কিন্তু ধনী পিতা কন্যাকে 'স্নেহপূর্বক' যা দেন—তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখতে পান নি। তিনি এমন যুক্তিও দেখিয়েছিলেন যে, পণপ্রথার চাপ থাকলে মেয়ের বিবাহের বয়স বাড়বে আর তাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সাহায্য হবে। 'পণকে 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ' বলতেও স্বর্ণকুমারীর আপত্তি ছিল (চৈত্র, ১৩১৯)। অন্যদিকে নারীদের জন্য চিহ্নিত "বামাবোধিনী" পত্রিকা পণপ্রথার সমালোচনায় এইটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছিল যে, এই প্রথায় 'ব্যক্তি-বিশেষের উপকার হইলেও যখন উহা সাধারণ বিশেষের অনিষ্টকর তখন উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য।' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩২০) এর পাশাপাশি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পণ-প্রথার ঘোরতর সমালোচনা করলেও পিতা যদি 'নিজের সঙ্গতিমত মূল্য' দিয়ে 'সৎপাত্র ক্রয় করতে পারে—তার মধ্যে দোষণীয় কিছু খুঁজে পান নি ; আর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ("প্রবাসী" / চৈত্র ১৩২০) মনে করেছিলেন, কন্যার যেহেতু পিতৃধনে অধিকার নেই, তাই 'বিবাহের সময় কন্যাকে কিছু অর্থ দেওয়া পিতার উচিত বলিয়াই মনে হয়।'

অবশ্যই এর বিপরীতে 'বরপণ নারীর পক্ষে অপমান'—এমন কথা বলার মতো লেখকও ছিলেন (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত/"ভারতী", বৈশাখ ১৩২০) এবং "বামাবোধিনী"-তে শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র পুত্রের মায়েদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন : 'এস আমরা পণ করি—আমাদের স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যাপক্ষকে পীড়নপূর্ব্বক কদাপি অর্থ গ্রহণ করিব না'। (বৈশাখ, ১৩২১) কিন্তু সব মিলিয়ে পণপ্রথার আমূল উচ্ছেদের দাবি যেমন জোরদার হয়ে উঠতে পারে নি, তেমনি সত্যিসত্যিই এই প্রথাকে কি-ভাবে সমাজ থেকে বেঁটিয়ে বিদেয় করা যায় সে-বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট ভাবনা বা নিশানার পরিচয়ও বিশেষ পাওয়া যায় না।

* নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'পণপ্রথা' নামের দেশাচারটির আদৌ কোন শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ("ভারতবর্ষ" / বৈশাখ ১৩২১)

৭

আজ থেকে সাত দশক আগের একটি সামাজিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সে আন্দোলনের মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধিতা, এমনকি ত্রুটিও খুঁজে বের করা সম্ভব। যেমন, এটা তো বলা যেতেই পারে যে, উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে নবোদ্ভিন্ন বাঙালি বুদ্ধিজীবীকুল যেমন তাদের ভাবনায় আশ্চর্য স্ব-বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, পণপ্রথা বিষয়ের আলোচনাও সেই টানাপোড়েনের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত ছিল না। আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে উদারনৈতিকতার যে মূল্যবোধ তাঁরা আহরণ করেছিলেন, তা-তে পণপ্রথার মতো নির্মম একটি সামাজিক প্রথাকে তাঁরা অন্তর থেকেই ধিক্কার দিতে পেরেছিলেন ; কিন্তু উলটো দিকে সামন্ত-তান্ত্রিক ধ্যানধারণার যে অবশেষ তখনও তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, তার প্রভাবেই সম্ভবত তাঁরা 'শুধু হাতে' মেয়ের বিয়ে দেওয়ার দাবিটিকে মেনে নিতে পারেন নি। আবার মেয়েকে বেশি বয়স অব্দি বাপের ঘরে রেখে দিলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে—এমন আশঙ্কার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব ন্যায় নীতির ধারণা যেমন ছিল, তেমনি পুরুষশাসিত সমাজের বহুযুগচর্চিত ধুরন্ধর মনোবৃত্তিটিও যে এর পিছনে কাজ করে নি—তাই বা বলা যায় কী করে! কিন্তু কথা হল, এ আলোচনা আজ আমরা করতে বসেছি বড়ো মারাত্মক এক সময়ে—যখন সাত দশক পরে পণপ্রথার পীড়ন তো কমেই নি, বরং সমাজের বুকের ওপর চার হাত-পা মেলে তা দাঁড়িয়ে আছে এক বীভৎস শঠতা আর নিষ্ঠুরতা নিয়ে। আমাদের বিস্ময় জাগে, চুয়াত্তর বছর আগের প্রশ্নগুলি আজও আমাদের সমাজে কী ভয়ানকভাবে প্রাসঙ্গিক!

বিজ্ঞপ্তি

গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার প্রতিবেদন স্থানাভাবে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। এটি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও বামপন্থী সাহিত্যচেতনা

সাহিত্যের সীমারেখা বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী মানদণ্ডে ভাগ করা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কোনো লেখা হয় সাহিত্যপদবাচ্য, আর নয়তো প্রচারধর্মী। যা সত্য তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, এবং সত্যের কোনও ডান বা বাম চরিত্র নেই। সুতরাং এই অর্থে সাহিত্যের দক্ষিণপন্থা বা বামপন্থা বলে ভাগটাও অনেকের কাছে অনেকটা কৃত্রিম। কিন্তু প্রচলিত সাধারণ অর্থে দক্ষিণ আর বাম—এই দুই ধারায় রাজনীতিতে ভাগ করা হয়। বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজের যে সত্য ধরা পড়ে সেই সত্যকে প্রতিফলিত করা বা সেই সত্যের প্রতি চেতনা আর আগ্রহ সৃষ্টি করার কাজ সাহিত্যিক জাতসারে অজাতসারে করে যান। দীর্ঘদিন ধরে একদল আদর্শবাদী ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন এই বামপন্থী ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। তাঁদের লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছে যে সাহিত্য, তাকে নিঃসংশয়ে বামপন্থী সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায়, এবং এতে তার সাহিত্যমূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় না।

একটি সমাজ বা দেশের সাহিত্য সেই দেশ এবং সমাজের এক ধরনের দলিল। সমাজের মানুষ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক টানা-পোড়েন, সুখদুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি সেই সমাজের সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আর নিজের সমাজকে বিশেষভাবে চিনতে পারে। বুঝতে পারে সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা। ব্যক্তিমানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তার কথা বলে বা লেখে। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি অবশ্য ব্যক্তির একান্ত অভিজ্ঞতা শুধু নয়, বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতাই ব্যক্তি তার শিক্ষা আর পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। তার সাহিত্য এই চিন্তা-ভাবনার ফসল। বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা এবং বৈপ্লবিক সাহিত্য বলব তাকেই যা অচলায়তনকে ভেঙে যুগভাবনাকে প্রতিফলিত করে, যা ভবিষ্যৎ উত্তরণের শক্তি যোগায় এবং মনস্কতা গঠন করে। বিপ্লব একটি সামাজিক ব্যাপার। এটি শুধু রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয় বা দলীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং দলীয় শাসনের অধীনে না থেকেও বা শুধু প্রলেতারিয়েত-সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। থাকলেই বরং বেশি আশ্চর্য হতে হত। কিন্তু যুগ এবং সমাজের আপেক্ষিক মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী না হলেও সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পথে যাঁদের লেখা অনেক অনুপ্রেরণার উৎস, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে একটি ফল্গুধারার প্রবাহ আমাদেরই অজ্ঞাতে বইয়ে দিয়ে গেছেন যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। করলে ইতিহাসচেতনাকে বিসর্জন দেওয়া হবে। রবীন্দ্রনাথ সমাজের নীচুতলার মানুষদের কথা বলেন নি বলে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই অভিযোগ মেনে নিয়ে 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের' বেদনা উদ্ধারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন 'মাটির কাছাকাছি কবি'কে। এ দেশে তারপর এই মাটির কাছাকাছি কবি-সাহিত্যিক এবং প্রলেতারীয় সাহিত্য-শিল্প আমরা কতটুকু পেয়েছি, এবং প্রলেতারিয়েত-রাই বা এই শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে কত-টুকু সচেতন, তা একটু ভেবে দেখা দরকার।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সূচনা ও ১৯১৭ সালের অকটোবর বিপ্লব আমাদের দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে কিছু পরিবর্তন এনে-ছিল। অকটোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তৈরি হল সাম্যবাদী দল। সূচনা হল নতুন সামাজিক আন্দো-লনের। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির শোষণের রূপ আরও প্রকট হয়ে উঠল।

সারা বিশ্ব জুড়ে যে-সমস্ত প্রগতি-শীল মানুষ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-ধ্বনি তুলেছেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ আর ১৯২১ সালে যুদ্ধফেরত কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা বিপ্লবী এবং গণচেতনাসম্পন্ন মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" (১৯২২) "পুনশ্চ" (১৯৩২) এবং অন্যান্য বহু রচনায় যে প্রগতিমূলক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ তা পরবর্তী যুগে কোনও কোনও কবি-লেখক বহন করেছেন এবং বামপন্থী আলোচনার অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ করেছেন, এ কথা সত্য। এঁদের সকলেই যে বামমার্গী বা সাম্য-বাদী ছিলেন তা নয়। বস্তুত বিষয়বস্তু দিয়ে বিচার না করে শুধু দলের খাতায় নাম লিখিয়েছেন কিনা বা অন্য কোন্ কোন্ কাগজে লেখেন, তা দিয়ে কারও প্রগতিশীলতা যদি মাপতে বসি তা হলে সব হিসেবনিকেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বৈপ্লবিক সাহিত্য বৈপ্লবিক চেতনার প্রতিফলন ও বৈপ্লবিক চেতনার স্রষ্টা। বৈপ্লবিক সাহিত্য বিপ্লবীদের লড়াই করবার হাতিয়ার। এই সাহিত্যের পাঠক কারা? এ প্রশ্ন তাই স্বাভাবিক। সাহিত্যের পাঠক সবাই। কিন্তু বৈপ্লবিক সাহিত্য পৌঁছতে চেষ্টা করে শ্রমিক, কৃষক আর সাধারণ গরিব মানুষদের মধ্যে। বৈপ্লবিক সাহিত্যের পাঠক আর লেখকদের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সচেতনতা একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু। এখন শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে যদি বৈপ্লবিক মনের লেখকের অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাবে শ্রমিককৃষকদের মধ্য থেকে বিপ্লবী লেখক দুরের কথা, পাঠকও প্রায় অনুপস্থিত। বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি এঁদের দলে মধ্যবিত্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর বেশিকাল ধরে একদল বিপ্লবী সাহিত্যিক তৈরি হয়েছেন, যাঁদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা আর সততা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এঁদের উৎপন্ন ফসল শ্রমিক-কৃষকদের ঘরে কতটা পৌঁছেছে, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। নিরক্ষর এই বিশেষভাগ মানুষের কাছে কিভাবেই বা তাঁরা পৌঁছবেন? অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যতই গর্বের হোন না কেন, যে-মানুষদের কথা তাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কি কোনও পরিচয় এঁদের আছে? দোষটা অবশ্য এঁদের নয়। বিপ্লবের নামে আমরা আমাদের দেশে হাজার-হাজার শ্রমিক-কৃষককে বিভিন্ন

"শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ও বামপন্থী সাহিত্যচেতনা" রচনাটি আমরা এই আশায় প্রকাশ করলাম যে, এর দ্বারা একটি সুস্থ বিতর্কের সূচনা হবে।—সম্পাদক

বিতর্ক

রাজনীতি নিয়ে না লিখেও বৈপ্লবিক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব, যেমন করে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে-অর্থে আমরা বেশ কয়েকজন লেখকের সাহিত্যকে বৈপ্লবিক সাহিত্য বা বামপন্থী সাহিত্য বলি, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সে-অর্থে বামপন্থী ছিলেন না। চলতি হাওয়ার পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই বৃহত্তর অর্থে প্রগতি-শীল ছিলেন। সে বিপ্লবে বাইরের আগুন না থাকলেও ভেতরের দহন ছিল; ছিল অগ্নিশিখার প্রোজ্জ্বল আলোক, সমগ্র সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বারবার নানা প্রশ্ন উঠেছে বলেই এই সহজ কথাগুলো আর-একবার বলতে হল। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে রবীন্দ্র-নাথের ব্যবহারিক ও শ্রেণীগত জীবনের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা ছিল।

সময়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে দেখলেও এর নেতৃত্ব মুখ্যত পেটি-বুর্জোয়াদের হাতেই থেকে গেছে। পেটিবুরজোয়া বুদ্ধিবিচারকে অতিক্রম করে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীসচেতন বিচারবুদ্ধি আন্দোলনের লাগাম ধরতে পারে নি। ভারতীয় বৈপ্লবিক রাজ-নীতির ক্ষেত্রে, মার্কসীয় সমীক্ষায় যে সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে, বৈপ্লবিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই সীমাবদ্ধতা আছে। রাজনীতির ব্যাধি আর জড়তা সেখানেও আছে। 'বামপন্থী' বা 'বাম-পন্থা' শব্দটির বহুল প্রচলনে এর উৎপত্তিগত ইতিহাস নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। 'বিপ্লবী' আর 'বাম-পন্থী' সব একাকার হয়ে গেছে। বাম-পন্থা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময়ে। এংটেট জেনারেলের সভায় আপোসহীন গোষ্ঠী হঠাৎই সভা-পতির বাম দিকের আসনগুলি দখল করে বসে। উচ্চবিত্তশালীদের প্রতি-নিধিরা এঁদের থেকে অনেক দূরে সভাপতির ডানহাতের আসনগুলিতে বসেন। এইভাবেই রাজনীতিতে বাম আর দক্ষিণ—এই দুই বিশেষণ চালু হয়ে যায়। সংসদীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী বিশেষণে ভূষিত দলগুলি বিপ্লবপন্থী আর বিপ্লব-বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়েছে। দক্ষিণ-পন্থীদের মতন বামপন্থীরা সংসদের রাজনৈতিক পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও 'বিপ্লবী'। 'বামপন্থা'র চাকচিক্য এঁদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দো-লনের সঙ্গে-সঙ্গে বিপ্লব করবার ইচ্ছে অনেকদিন ধরেই মিলেমিশে আছে। তাই বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা স্রোত বরাবরই এখানে অনেক মানুষ-কেই প্রভাবিত করেছে। অনেক লেখক সাহিত্যিক লিখেছেন যাঁরা আশু সংসদীয় রাজনীতির বাইরে বৃহত্তর অর্থে বিপ্লবের স্বপ্ন লালন করেছেন। এই বামপন্থী আন্দোলনের স্রোতে যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যে-সাহিত্য সেই আন্দোলনকে অনু-প্রাণিত করেছে, তাকেই আমরা বাম-পন্থী সাহিত্য বলতে পারি। বামপন্থী সাহিত্য অ্যানটি-এসটাবলিশমেনট সাহিত্য। এই অ্যানটি-এসটাবলিশ-মেনট সাহিত্য বামপন্থী হলেও প্রধানত পেটিবুরজোয়াদের হাতেই তা লেখা হয়েছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছর

ধরে একদল পেটিবুরজোয়া লেখক বিপ্লবী স্বপ্ন নিয়ে কলম ধরেছেন এবং ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মধ্যবিত্তের ছাউনিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার আরেক দল আদর্শবাদী বিপ্লবকামী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। এভাবেই ভিন্ন-ভিন্ন লোকের একটাই মিছিল একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ে জলে ভিজে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এর যে কোনও অসাধারণ মূল্য নেই, তা নয়। বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বার্থে এর মূল্য অপরিসীম। মধ্যবিত্ত লেখকও তাঁর স্বশ্রেণীর গণ্ডি থেকে অনেক প্রগতিশীল কাজ করে যেতে পারেন, অনেক প্রগতিশীল রচনা সৃষ্টি করতে পারেন। বস্তুত অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এটা তাঁরা করেছেনও। কিন্তু তাঁরা অপরের হয়ে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর ব-কলমে বিপ্লব সম্পন্ন করে দিতে পারেন না। মধ্যবিত্তের পাড়ায় বিপুল-ভাবে এই সাহিত্যের কাটতি হলেও না। এমনকি মার্কসবাদে বিশ্বাস রেখেও নয়। আসলে বৈপ্লবিক সাহিত্যের বিকাশ আর পরিণতি এবং বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—সবটাই নির্ভর করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের এবং রাজনীতির গতিপ্রকৃতির ওপর। বৈপ্লবিক রাজনীতি বা বৈপ্লবিক আন্দোলনই বৈপ্লবিক সাহিত্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করবে। বৈপ্লবিক সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ভবিষ্যতের মতোই নির্ভর করবে একটি বিপ্লবী পার্টির ওপর। কোনো বামপন্থী বা বিপ্লবী চিত্রপরিচালক বা প্রকাশক যদি দেখেন যে তাঁর ছবি বা প্রকাশিত বইগুলির ওপর রাজনৈতিক হামলা হচ্ছে এবং দেশের মানুষ এ সম্পর্কে নির্বিকার বা ভয়ে চুপ করে আছেন তাহলে, সেই পরিচালক ও প্রকাশক তাদের সং বৈপ্লবিক চেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে নেবেন। অথবা বিপ্লবীদের গোপনে তাঁর ছবি দেখাবেন। কিন্তু সেই দলের যদি অস্তিত্ব না থাকে বা বৈপ্লবিক কাঠামো না থাকে, তবে পেটিবুরজোয়া চিত্রপরিচালক বা প্রকাশক ক্রমশই তাঁদের বিপ্লবের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকবেন।

বৈপ্লবিক সাহিত্য এবং বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র নির্ভর করবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশকে নিয়ে গঠিত বিপ্লবী পার্টির ওপর। শ্রমিকশ্রেণীর এই অগ্রণী অংশই হল 'class for thems:lves'। এই সচেতন অংশ যদি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে উঠে না আসে তবে মধ্য-বিত্তের ভিড়ে বিপ্লবী দল তার লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসতে বাধ্য। শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন উপস্থিতি সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। শুধু পেছন থেকে আন্দোলনের মদত জোগানো শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-দায়িত্ব নয়, নেতৃত্বের লাগাম ধরাও তার গুরু দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মধ্যশ্রেণীর মধ্য থেকেই বৈপ্লবিক রাজ-নীতির কথা অসংগঠিত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং তাঁদের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। শুধুমাত্র শ্রমিকদের ভেতর থেকেই বিপ্লবী মানুষের অনু-সন্ধান করতে হবে—এ চিন্তা অবশ্য অতিবাম চিন্তা বা ভুল চিন্তা। মধ্য-শ্রেণীর আদর্শবান সৎ মানুষও স্বশ্রেণীর গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারেন, তবে সেটা একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস। বস্তুগতভাবে (অবজেকটিভলি) মধ্যশ্রেণী বিপ্লবী-শ্রেণীভুক্ত নয়। এঙ্গেলস বলেছেন,

'এরা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য। শুধু-মাত্র কোনো বিজয় অর্জন করার পর শুঁড়িখানায় তাদের চিৎকার-চেঁচামেচির কোনো শেষ থাকে না। তৎসত্ত্বেও এঁদের মধ্যে খুব ভালো ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেন।' ("পেজানট ওঅর ইন জারমানি", ভূমিকা।)

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্ব থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে। শ্রমজীবী মানুষের জন্য যে-সাহিত্য তৈরি হবে, তার উপাদান শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি থেকে সংগৃহীত হবে। সুতরাং এর সৃষ্টিকর্তা শ্রমিকসম্প্রদায়ভুক্ত না হলে রাজনীতির গলদ বা অপূর্ণতা প্রকাশ পাবে। আমাদের দেশে বাম-পন্থী বা বৈপ্লবিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক বা কৃষকের ঘর থেকে আসা পাঠক বা লেখকের কোনো নাম চোখে পড়ে না। এখানে অর্ধশতাব্দীরও বেশি হল কমিউনিসট পার্টি তৈরি হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নি। 'অখ্যাত জনের নির্বাক মনের মর্মের বেদনা উদ্ধার' করার জন্য বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক এসেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই অখ্যাত জনের মধ্য থেকে কবি-সাহিত্যিক উঠে আসেন নি। সাধারণ গ্রাম্য মানুষেরা লোকসংগীতের মাধ্যমেই তাঁদের সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করেছেন নানাভাবে। আজ পর্যন্ত এঁদের মধ্য থেকে কোনও নতুন সুর-রচয়িতা বা সংগীত-রচয়িতাকে আমরা পাচ্ছি না। শহরের সঙ্গে আজ গ্রামের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য শহরের কালচার গ্রামকে গ্রাস করে চলেছে দ্রুতগতিতে। 'টেকনোলজি' শুধু দ্রব্য-সম্ভারই উপহার দিচ্ছে না, সমস্ত মানবিক সম্পর্ককেও 'দ্রব্যে' পরিণত করেছে। সস্তার পচা নাচ-গান, যাত্রা, থিয়েটার-সিনেমা গ্রাম্য জীবনের স্বাভাবিকতা বা সাবলীলতাকে নষ্ট করে ফেলছে। সম্প্রতি ভি. ডি. ও. র দৌলতে যাচ্ছেতাই সমস্ত পর্নোমার্কা ছবি গ্রামের বেড়ার ঘরে কুটিরশিল্পের মতন প্রসারিত হচ্ছে। 'পথের পাঁচালী'-র বায়োস্কোপের বাক্সের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অসভ্য সংস্কৃতি। যে রাজ-নৈতিক শক্তি দিয়ে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করা যেত, তাও অনুপস্থিত। রাজনৈতিক চিন্তার দৈন্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাব এত প্রকট যে এর মধ্যে ঝকঝকে সুন্দর প্রগতিশীল সাহিত্য খুব বেশি তৈরি হতে পারে না; হলেও তা কৃত্রিম। জোর করে কোনো কিছু আরোপ করার চেষ্টাকে লুকোনো যাবে না। চল্লিশের দশকে যখন বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উত্তাল সময়প্রবাহ চলছিল সেই সময়-কার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপ-লব্ধি করে লিখেছিলেন: 'লেখকরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত, পাঠকরাও তাই। …সর্বহারার মধ্যে শিক্ষার বিস্তার নেই, যদি সামান্য কিছু থাকেও তা হলে তা আজও আমাদের সাহিত্য পর্যন্ত পৌঁছয় না।…মধ্যবিত্ত লেখে, মধ্যবিত্ত পাঠক পড়ে।…আমাদের লেখা হয়ত গণ-মানসের কাছে পৌঁছয় না, হয়ত আমাদের ভাষা ও প্রকাশ তাদের কাছে দুর্বোধ্য—তবুও এদের আশ্রয় করে গণ-সাহিত্য আমাদের রচনা করে যেতেই হবে।' ("নতুন সাহিত্য," দ্বিতীয় সংকলন, ১৩৫৫ বৈশাখ। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী বিতর্ক সাহিত্য' —তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭২)

মধ্যবিত্ত মানসিকতা নিয়েই মধ্যবিত্ত মানসিকতার অনেক বাধা অতিক্রম করার যে প্রচেষ্টা সে সময়ের সাহিত্যিকরা ও শিল্পীরা করেছিলেন, তার মধ্যে হয়ত কোন কপটতা ছিল না। কিন্তু তার লক্ষ্য নিয়ে সে সময়ই নানা কথা উঠেছিল। নারায়ণ গঙ্গো-পাধ্যায় বলছেন: 'সে সাহিত্য যাঁদের নিয়ে লেখা তাঁদের কাছে কতটা পৌঁছবে সে জন্য বিচলিত হয়ে নয়, লিখতে হবে দেশের এই বিদ্রোহী সর্বহারা শক্তি সম্পর্কে মধ্যবিত্তকে সচেতন করে তোলবার জন্যই। তার কারণ সর্বহারা বিপ্লব ছাড়া মধ্যবিত্তের বাঁচবার পথ নেই।' কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হবার পর দীর্ঘ ষাট বৎসর অতিক্রম করে গেছে। যাঁদের জন্য লেখা তাঁদের কাছে লেখা পৌঁছল কিনা তা নিয়ে 'বিচলিত না হয়ে' বসে থাকলে বামপন্থী সাহিত্য ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে কিন্তু বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে ব্যর্থ হবে। সে ক্ষেত্রে বিপ্লবী লেখকের ভবিষ্যৎ মধ্যবিত্ত লেখকের শ্রেণীগত অসীমতায়, অপ-মৃত্যুতেই; গণবিপ্লবের অগ্রদূতের ভূমিকায় নয়।' ("নতুন সাহিত্য", দ্বিতীয় সংকলন বৈশাখ ১৩৫৫—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক—ধনঞ্জয় দাশ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭৯) প্রশ্নটা তাই দাঁড়াচ্ছে এই যে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীসম্ভূত' লেখক আজ কতখানি 'সচেতন বৈপ্লবিক কর্ম-পন্থার অনুসরণ' করতে পেরেছেন? আজও তো সেই চিরপরিচিত মধ্যবিত্ত লেখক ও বামপন্থী নেতারা শ্লোগান পালটে-পালটে মঞ্চ দখল করার রাজ-নীতির মধ্যেই ডুবে আছেন। রাজ-নৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'প্রলেতারিয়েত'রা অনুপস্থিত। একটা অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা মাঝে-মাঝে শোনা যায়। ব্যাখ্যাটা এই যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হলেই রুশদেশের মতন শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষার দরজা সব একসঙ্গে খুলে যাবে। মুক্তচিন্তা আর শিক্ষার আলোকশিখা তাঁদের আপনি স্পর্শ করবে। তার আগে সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত পালটাতে হবে। আসলে বিপ্লব হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া বা প্রোসেস। মনের অনেক রুদ্ধ দরজা-জানালা খুলতে-খুলতেই বিপ্লবের সিংহদুয়ারে এসে পৌঁছোনো যায়। শিক্ষা সেখানে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সেই দায়িত্ব পালনে মধ্যবিত্তরা 'সচেতন বৈপ্লবিক কর্মপন্থার' অনুসরণ করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মধ্যবিত্তরা বিপ্লব করে না। মধ্যবিত্তরা স্বশ্রেণীর স্বার্থে এবং ব্যক্তিগত অহংকার থেকে অনেক সময় মঞ্চটাকেই দখল করে রাখে। ভারতীয় কমিউনিসট দল অনেকটাই সেভাবে এই মঞ্চটাকে মধ্যবিত্তদের মঞ্চে পরিণত করেছে। সমীক্ষায় দেখা যাবে যে, ভারতের কমিউনিসট দলের নেতৃত্ব ১৯৩০ আর ১৯৪০-এর দশকে প্রায় সবটাই এসেছে উঁচু মধ্যবিত্ত ঘরানা থেকে। ১৯৪৩ সালে সি. পি. আই-র প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৯২ জন প্রতিনিধিই ছিলেন জমিদার, ব্যবসায়ী ও মননশীল সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রায় প্রত্যেকেরই (৯০%) কলেজি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় ছিল। নেতৃত্বের এই গঠনবিন্যাস ও গঠনপ্রক্রিয়ার একটি পরিবর্তনও আজ পর্যন্ত তেমন ঘটে নি। সংগ্রাম তাই মধ্যবিত্তের স্বার্থবোধে অনুপ্রাণিত। তাই 'মধ্যবিত্তসম্ভূত' বহু

শিল্পী-সাহিত্যিক অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। সত্তর দশকের ‘নকশালবাড়ি’ আন্দোলনের সময় নতুন করে যে-আশা সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিফলন হয়েছিল নতুন কবিতায় গল্পে উপন্যাসে। এমনকি সে সময় জেলখানার দেওয়ালেও উৎকীর্ণ হয়েছিল অনেক বৈপ্লবিক কবিতা। কিন্তু সেও সেই মধ্যবিত্ত সৎ মানুষেরই কবিতা। তাঁদের অনেকেই আজ আবার ফিরে এসেছেন নিজেদের শ্রেণীকক্ষে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতার অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী। বাইরের উত্তাপ না থাকলে মনের উত্তাপও কমে যাবে। পঞ্চাশের দশকেও মধ্যশ্রেণী থেকে যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যে সংখ্যায় গায়ক, শিল্পী, আর সাহিত্যিক এসেছিলেন, সে-রকম ধারাও আর সৃষ্টি হচ্ছে না। এর কারণ শ্রেণীসচেতন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অভাব এবং পেটিবুরজোয়া নেতৃত্বের দাপট। এর কারণ সংসদীয় রাজনীতির ঘোলাজলে মৎস্যশিকার আর বিপ্লব একই সঙ্গে দুটোকে মিশিয়ে ফেলে সুবিধাবাদের রাজনীতি।

সংগ্রাম থেকে সাহিত্যশিল্পকে আলাদা করে দেখা ভুল। তাই সাহিত্যশিল্পের বস্তাত্বকে রাজনৈতিক বস্তাত্ব থেকে আলাদা করে দেখাও ভুল। এই প্রসঙ্গে চীনের বিপ্লবী নেতা মাও সে তুং যা বলেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

‘In our struggle for the liberation of the Chinese people there are various fronts among which there are the fronts of the pen and of the gun, the cultural and the military fronts …Liberation and art have been an important and successful part of the cultural front' (Yenan Forum). তিনি আরও বলেন: ‘Our writers and artists must make it their duty to shift their roots and move gradually towards the workers.’

আমাদের দেশে সংকীর্ণতাবোধ সাম্যবাদী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সঙ্গী। এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে সাম্যবাদী নেতারাও অবহিত। কমিউনিস্ট নেতা ই. এম্. এস্. নাম্বুদিরিপাদ তাঁর “মার্কস্‌বাদ ও সাহিত্য” পুস্তিকায় পরিষ্কার লিখছেন—‘কেউ কেউ মনে করত, প্রত্যেক লেখক প্রগতিশীল কিছু লিখলেই তাকে ভাবগত দিকে থেকে, প্রগতিশীল আন্দোলনে নীতি ও আদর্শে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। ধরে নেওয়া হত, প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ নন এমন লেখার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে না।…মার্কসবাদ-লেনিনবাদ স্বীকার করে, বৈপ্লবিক আন্দোলনে সচেতনভাবে বিশ্বাসী নয়, এমন লেখকও থাকতে পারেন, যাঁরা নিজের অজান্তে লেখক হিসাবে বিপ্লবী ভাবধারা প্রকাশ করে থাকেন।…মার্কস ও এঙ্গেলস বালজাকের লেখার বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুর অত্যন্ত মূল্য দিতেন, তাঁর প্রতিবৈপ্লবিক ধ্যানধারণার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও। লেনিন রুশ লেখক তলস্তয়ের প্রশংসা করতেন আর বলতেন তাঁর লেখা ‘রুশ বিপ্লবের দর্পণ’ যদিও ভাবগত দিক থেকে তলস্তয় প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের অনুসরক ছিলেন। এই বিচারশক্তি আজ কতজন ‘মার্কসবাদী’ সমালোচকের আছে তা বিশেষভাবে ভাববার বিষয়। এবং যদি না থেকে থাকে তবে তা কেন নেই ও কোন্ গভীর সংকীর্ণ রাজনীতির আবর্তের স্রোত এজন্য দায়ী তা আরও বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়।

পুলকনারায়ণ ধর

যোসেফ ব্রডস্কি

অভিজিৎ করগুপ্ত

১৯৮৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন নির্বাসিত রুশ কবি (বর্তমানে মারকিন নাগরিক) যোসেফ আলেকজান্দ্রোভিচ ব্রডস্কি। এবারও ছিটকে গেলেন গুনটার গ্রাস, মারিও ভারগাস ঝোসা বা নাদিন গার্দিমারের মতো বহু-আলোচিত সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত হলেও সুইডিশ আকাদেমির বিচারে ব্রডস্কিই এই মুহূর্তে যোগ্যতম ব্যক্তি। সাতচল্লিশ-বছর-বয়সী এই রুশ কবির কবিতায় নির্বাচকরা লক্ষ করেছেন ‘মেধা, সংবেদনশীলতা এবং দূরদৃষ্টির’ এক মহান সমাবেশ। আকাদেমির অন্যতম সদস্য অ্যালেনের ভাষায়, ‘Reading Brodsky is like standing on top of an existential hill and looking down on two worlds, two empires.’ তবে ব্রডস্কির প্রশস্তিতে বোধহয় সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন ডাফিল্ড হোয়াইট। মিড্‌ল্‌টাউনের ওয়েসলেয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের এই অধ্যাপক বলছেন, ‘যোসেফ ব্রডস্কি এক বহুজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব…। ওঁর সমকালীন প্রজন্মের অনেকের চোখেই ব্রডস্কি দেবতা।’

এ বছরের নোবেল-জয়ীকে নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার একটি মহলে উচ্ছ্বাস আর আনন্দের স্রোত যখন প্রায় উন্মাদনার স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধীরে-ধীরে জন্ম নিচ্ছে আর-একটি ধারণার বীজ—চরিত্রে যা প্রথমটির সম্পূর্ণ বিপরীত। সুইডিশ আকাদেমির ‘বিচার’ এবং ব্রডস্কির কবিপ্রতিভার গভীরতা সম্পর্কে শুধু সন্দেহপ্রকাশই নয়, বহু মানুষই আজ এই রুশ কবির পুরস্কারপ্রাপ্তিকে রাজনৈতিক কারসাজি বলে মনে করছেন। এহেন ধারণার অঙ্কুরোদগম হয়েছে যোসেফ ব্রডস্কির জন্মভূমি রাশিয়াতেই। একদা যাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল ‘pornographic and anti-Soviet poetry’ লেখবার অভিযোগে, আজ তাঁরই মাথায় বিশ্বজয়ীর শিরোপা—এ দৃশ্য নীরবে সহ্য করা কোনো প্রশাসনের পক্ষেই সম্ভব নয়। রাশিয়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ব্রডস্কির এই পুরস্কারপ্রাপ্তিকে খুব খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে নি সোভিয়েত রাশিয়া। মসকোয়, সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জেরাসিমভের মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্রডস্কির নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ শুনে ভদ্রলোক বলছেন, ‘tastes of Nobel committee are strange sometimes’। আসলে, বৃহৎ শক্তিবর্গের সার্বিক প্রতিযোগিতা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রকেও নিষ্কলঙ্ক থাকতে দেয় না। চাপান-উতোর, এই অস্বস্তিকর বিতর্ক কোনোভাবেই সাহিত্যবিচারের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

সত্তরের দশকে সোলঝেনিতসিনকে নিয়ে উত্তাল উন্মাদনার পাশাপাশিই আমরা দেখেছিলাম এরকমই একটা ভিন্নধর্মী সমান্তরাল প্রবাহকে। অবশ্য সেই বিতর্কের তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। রুশপন্থী আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক গাস্ হল্ তো একটা পুস্তিকাই লিখে ফেলেছিলেন—‘শাখারভ সোলঝেনিতসিন ফ্রড: হোয়াট ইজ বিহাইনড দি হিউ অ্যান্ড ক্রাই’। নামকরণ থেকেই লেখকের বক্তব্যের অভিমুখ পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু ব্রডস্কিকে নিয়ে গাস্ হলের মতো কেউ বিশ্লেষণে বসবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে—জেরাসিমভের মন্তব্যের কথা মনে রেখেই একথা লিখছি। কারণ ১৯৭০ আর ১৯৮৭ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। গরবাচভের রাশিয়ায় এখন ‘গ্লাসনস্ত’-এর ঝড়। নির্বাসিত ব্রডস্কিও এখন আর সেদেশে অবশ্য বর্জনীয় নন। সেক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি সাহিত্যপত্রিকা ‘নোভিমির’-এ ব্রডস্কির কিছু কবিতা প্রকাশ সম্পর্কিত আলোচনার প্রশ্নই উঠত না। শুধু ব্রডস্কি নয়, অতীতের বহু নির্বাসিত এবং নিষিদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টিকেই ফিরিয়ে আনছেন রাশিয়ার বর্তমান প্রশাসকরা। কয়েকদিন আগে আংশিকভাবে পুনর্বাসিত হল পাস্তেরনাকের “ড জিভাগো”। জন্মভূমির রাজনৈতিক বাতাবরণের এই নতুন অভিমুখ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ব্রডস্কি, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক খুব একটা উৎসাহিত নন। এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে উনি বলছেন, ‘কবিতা, উপন্যাস—এ সবই একটা জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। একদিন এদের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মানুষের কাছ থেকে, আর আজ সেই লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রকৃত অধিকারীর হাতে। সংস্কৃতির প্রকৃত দাবিদার জনগণের এজন্য কৃতজ্ঞবোধ করার কোনো কারণ নেই…।’

১৯৭১ সালের ৪ঠা জুন রাশিয়া থেকে নির্বাসনের মুহূর্তেও ব্রডস্কি জানতেন না উনি কোথায় চলেছেন।

ভিয়েনা বিমানবন্দরে আরদিস্ প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান সাহিত্যের অধ্যাপক কার্ল্ প্রসকার ব্রডস্কিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'যোসেফ, কোথায় যেতে চাও?' সদ্য-নির্বাসিত কবির উত্তর ছিল, 'Jesus, I haven't the slightest idea'। এর পর কেটে গেছে পনেরোটি বছর। পিছনে-ফেলে-আসা বৃদ্ধ বাবা-মা, শিশুপুত্র, বেশ কিছু বন্ধু এবং জন্মশহর লেনিনগ্রাদের স্মৃতি এই দীর্ঘ সময় ধরে বার বার ওঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নির্বাসনের কিছুদিন পরেই তাই চিঠি লিখেছিলেন রাশিয়ার তদানীন্তন কর্ণধার ব্রেঝনেভ্‌কে: 'প্রিয় লিওনিদ ইলিচ···যে-কোনো দেশেরই রাষ্ট্রকাঠামোর চেয়ে তার ভাষা অনেক বেশি প্রাচীন এবং অপরিহার্য। রুশই আমার ভাষা···। রাশিয়ান নাগরিকত্ব হারাতে চলেছি বলেই রুশ কবি হিসেবে আমার পরিচিতি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আবার ফিরে আসব—এটাই আমার বিশ্বাস।'

যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হবার পর বহুবার উনি সোভিয়েত সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বৃদ্ধ বাবা-মাকে আমেরিকায় বেড়াতে আসার অনুমতি দেবার জন্য। প্রতিবারই নাকচ হয়েছে। ব্রডস্কি-দম্পতির কেউই আজ জীবিত নেই। আশাহত, বিষণ্ণ যোসেফের আজও মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে লেনিনগ্রাদের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। কিন্তু না, রাশিয়ায় গিয়ে নয়—'quite frankly I'd rather they come here to see me'. দীর্ঘ পনেরো বছরের নির্বাসনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত ব্রডস্কিকে বদলে দিয়েছে; স্বদেশ সম্পর্কে উনি এখন লক্ষণীয়ভাবে নিস্পৃহ এবং উদাসীন: 'I don't believe in that country any longer. I'm not interested. I'm writing in the language, and I like the language.' জন্মভূমির প্রতি এই বীত-শ্রদ্ধাকে যুক্তিসিদ্ধ করবার তাগিদেই টমাস মানের উদাহরণ টেনে এনে বলেন, 'টমাস মান জারমানি থেকে ক্যালিফরনিয়া আসার পর তাঁকে জারমান সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে উনি বলেছিলেন: "আমি যেখানে, জারমান সাহিত্যও সেখানে।" নিঃসন্দেহে কিছুটা গর্বিত উক্তি; কিন্তু একজন জারমানের পক্ষে একথা বলা সম্ভব হলে আমার পক্ষেও সম্ভব।' কেন এভাবে বদলে যায় মানুষ?—কেন এভাবে বদলে গেলেন ব্রডস্কি? একমাত্র ইতিহাসই এর উত্তর দিতে পারে। ব্রডস্কি পৌঁছেছিলেন পশ্চিমের মুক্ত দুনিয়ায়। কিন্তু সত্যিই কি তিনি সুখী? তা-ই যদি হয় তবে 'মুক্ত' এবং 'সুখী' ব্রডস্কির কলম থেকে কেন "Lullaby of Cape Cod"-এর মতো কবিতা নির্গত হয়? তৃপ্ত ব্রডস্কি কেন লেখেন—'Having sampled two / Oceans as well as continents, I feel that I know / What the globe itself must feel: there's no where to go.'

*

১৯৪০ সালের ২৪ মে লেনিনগ্রাদের এক ইহুদি পরিবারে জন্মেছিলেন ব্রডস্কি। বাবা কাজ করতেন নৌ-বিভাগে। সম্ভবত এই চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পরই আলেকজান্দার ব্রডস্কি সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারের জীবিকা বেছে নেন। বাবার চাকরি হারানো সম্পর্কে যোসেফের ধারণা, ওই কর্মচ্যুতি ছিল,···'in accordance with some seraphic ruling that Jews should not hold substantial military rank.' ব্রডস্কির জীবনে মা মারিয়ার প্রভাবই বেশি। ভদ্রমহিলা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই বিদুষী। মূলত এই অনুবাদিকার আয়ের উপরই নির্ভর করতে হত ব্রডস্কি পরিবারকে।

ব্রডস্কির শৈশব এবং কৈশোরের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। অনুসৃত মতাদর্শের তাত্ত্বিক বিচারে ওদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—এককথায়, সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই পরিচালিত হয় ব্যষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে। কিন্তু চারপাশের এই বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে কোনোদিনই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে পারেন নি ব্রডস্কি। ওঁর সংবেদনশীল, নির্জনতাপ্রিয় কবিসত্তার দৃষ্টিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের চিত্রটি বহুলাংশে নৈরাশ্যজনক। সোলঝেনিতসিনের মতো না হলেও ব্রডস্কিও জন্মভূমির সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ। লেনিনগ্রাদের এই ইহুদি কবির চোখে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামো হল: '…a very confined realm. The rest of the world is just pure geography, an academic dicipline, not the reality.'

যোসেফ ব্রডস্কির শৈশবের বাতাসে ছিল বারুদ আর মৃত্যুর আতঙ্ক। বয়ঃসন্ধিতে এসে মুখোমুখি হলেন এক সর্বগ্রাসী অনুশাসনের। প্রথাগত শিক্ষার প্রতি ব্রডস্কির অনীহার উৎস খোঁজবার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু জানার প্রয়োজন হয় না। স্বভাব-বিষণ্ণ এবং অন্তর্মুখী বালক যোসেফ এক শীতের সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন লেনিনগ্রাদের রাস্তায়। আর ফেরেন নি বিদ্যায়তনিক শিক্ষার জগতে। সেটা ১৯৫৫; ব্রডস্কি তখন পনেরো বছরের কিশোর। বস্তুত এই সময় থেকেই শুরু হয় যোসেফের প্রকৃত শিক্ষা। একই সঙ্গে চলতে থাকে পোলিশ আর ইংরেজি ভাষার চর্চা এবং সাহিত্যপাঠ। ওই সময়ই ব্রডস্কি পরিচিত হন ফ্রানৎস কাফকা এবং উইলিয়ম ফকনারের রচনাবলীর সঙ্গে। এসবই পড়েছিলেন পোলিশ ভাষায়। এর পরই ব্রডস্কির হাতে আসে চেসলো মিলোজ-এর কবিতা। এই পোলিশ কবি সম্পর্কে ব্রডস্কির উচ্ছ্বাস যেন একটু বেশি-ই। ওঁর মতে মিলোজ হলেন, এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি, সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ।' ১৯৫৬ সাল ব্রডস্কির জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। ষোলো বছরের কিশোর ব্রডস্কি তখন ক্রমাগত চাকরি বদল করে চলেছেন আর প্রতিদিনই সমৃদ্ধ হচ্ছেন নতুনতর অভিজ্ঞতায়। সে সময় গোটা রাশিয়া জুড়ে চলেছে ইউরেনিয়াম খোঁজার এক ব্যাপক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম। হঠাৎই যোসেফের কাজ জুটে যায় একটি ভূতাত্ত্বিক গবেষক সংস্থায়। এই সংস্থার সঙ্গে ব্রডস্কি প্রায় গোটা রাশিয়া চষে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘদিন ছিলেন দক্ষিণের চান সীমান্তে—আমুর নদীর পারে। এ ছাড়াও ক্যাসপিয়ন হ্রদ অঞ্চল, মধ্য এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চল, তিয়েনশান এবং হিন্দুকুশ পর্বতমালা, এমনকি ইউরোপভুক্ত রাশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—সর্বত্রই ঘুরেছেন ব্রডস্কি। ঘুরেছেন আর স্বপ্নে রঙিন দুটি উজ্জ্বল চোখ দিয়ে দেখেছেন সে দেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে।

এর পরও অন্যান্য বহুবিচিত্র জীবিকায় লিপ্ত হয়েছেন ব্রডস্কি। এর মধ্যে মৃতদেহব্যবচ্ছেদের কাজও ছিল। পরবর্তী কালে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্রডস্কি বলছেন, 'আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল স্নায়ুতত্ত্ববিদ হবার। সাধারণ ইহুদি বালকের কাছে এটা একটা স্বপ্ন। কিন্তু আমার ইচ্ছের পিছনে কিছু নির্দিষ্ট কারণ ছিল। সেই কারণেই ওরকম বিচ্ছিরিভাবে শুরু করেছিলাম। একজন করোনার-এর সহকারী হিসেবে কাজ করতাম। মৃতদেহ চিরে অন্তর্গত প্রত্যঙ্গকে বের করা এবং খুলি ভেঙে মস্তিষ্ককে বাইরে আনাই ছিল আমার কাজ।'

জীবিকার সন্ধানে রকমারি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রডস্কির কলম থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল একের পর এক কবিতা। এ ছাড়া, মৌলিক রচনার পাশাপাশিই চলছিল অনুবাদকর্ম। ব্রডস্কি বরাবরই নির্জনতাপ্রিয়। সম্ভবত এই কারণেই তিনি চারপাশের সার্বিক অনুশাসন থেকে মানসিকভাবে নিজেকে সরিয়ে এনেছিলেন এক নিজস্ব মনন আর সৃষ্টির জগৎ-এ—যেখানে সম্পূর্ণভাবেই ব্রডস্কি একক, নিঃসঙ্গ। এহেন ব্যক্তি যে কেজিবি কর্মকর্তাদের চোখে সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ১৯৫৯ সালে ব্রডস্কিকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর দুবার ওঁকে পাঠানো হয় মানসিক হাসপাতালে। ওইসব দিনগুলির অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে মূর্ত হয়ে উঠেছে ব্রডস্কির কবিতায়।

কুড়ি বছর বয়স পেরোবার আগেই কবি হিসেবে ব্রডস্কির প্রতিভা এবং স্বাতন্ত্র্য বিদগ্ধ-মহলে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। যদিও সরকারি পত্র-পত্রিকায় ব্রডস্কির কবিতা ছাপা হত না। এই তরুণ কবির সাহিত্যচর্চাকে কখনোই সুনজরে দেখে নি সোভিয়েত সরকার। ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকায় ব্রডস্কিকে 'সেমি-লিটেরারি প্যারাসাইট' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্রডস্কির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, ওঁর 'অশ্লীল এবং সোভিয়েত-বিরোধী কবিতা' যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। এরপর এই 'বিপজ্জনক' কবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দেরি করে না সোভিয়েত প্রশাসন। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিনগ্রাদের আদালতে বিচার হয় ব্রডস্কির। শাস্তি হিসেবে তাঁকে সুদূর আর্কান অঞ্চলের এক 'প্রায় জনহীন' খামারে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম নির্বাসনে পাঠানো হয়। আর্কান খামারে থাকার সময় সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রির অবসরে ব্রডস্কি চলে আসতেন তাঁর নিজস্ব জগতে। সাহিত্যপাঠ, কবিতা লেখা এবং অনুবাদ—এই নিয়েই গড়ে উঠেছিল ব্রডস্কির বন্দীদশার রাতের জীবন। এই সময়ই ব্রডস্কির হাতে আসে অডেনের কবিতা। প্রথম পাঠেই অডেন মুগ্ধ করেছিলেন যোসেফকে। এদিকে ব্রডস্কিকে মুক্তি দেবার জন্য বেশ-কিছু সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী ক্রমাগত দাবি জানাতে থাকেন। মূলত এই চাপের কারণেই আঠারো মাস পরে মুক্তিলাভ করে উনি ফিরে আসেন লেনিনগ্রাদে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তির স্বাদ সেখানেও ছিল না।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে লেনিনগ্রাদ শহরে যোসেফ ব্রডস্কি এবং আরো দু-তিনজন তরুণ কবিকে নিয়ে গড়ে

উঠেছিল এক বন্ধুচক্র। পরবর্তী কালে এর নাম হয় "The Petersburg Circle'। এই বন্ধুচক্রের একজন ছিলেন এডজেনি রেইন, ব্রডস্কির ভাষায় যিনি 'the best poet Russia has today.' এঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শুধু কবিতা। বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ কবি আন্না আখমাতোভার সঙ্গে ব্রডস্কির পরিচয় ঘটে পিটার্সবুর্গ চক্র তৈরি হবার কিছুদিন আগে। সম্ভবত যেটা ছিল ১৯৬০ সাল। ব্রডস্কির জীবনে আখমাতোভার প্রভাব নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। যোসেফকে বন্দীশিবির থেকে ফিরিয়ে আনার পেছনে আখমাতোভার প্রয়াসও কম নয়। দিমিত্রি শস্টাকোভিচ্ এবং করণেই চুকোভস্কির সঙ্গে সেদিন আখমাতোভাও সোচ্চার হয়েছিলেন সরকারি বিচারের বিরুদ্ধে। ব্রডস্কির কবিতায় হয়তো আখমাতোভার চেয়ে ওসিপ ম্যানদেলস্তাম-এর গন্ধই বেশি ধরা পড়ে। তথাপি, প্রতিভাময়ী কবি আখমাতোভাও ব্রডস্কির কবিতা লেখার ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলছেন, 'Brodsky found in Akhimatova a living link to Russia's great poetic tradition.'

১৯৭১ সালের শেষদিকে ইসরায়েল থেকে দুটি সরকারি আমন্ত্রণ পান যোসেফ ব্রডস্কি। প্রস্তাব ছিল ওদেশে স্থায়ি-ভাবে বসবাস করার। কিন্তু ব্রডস্কি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি ওই প্রস্তাবে। এরপর ১৯৭২ সালের ৪ঠা জুন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ প্রায় জোর করেই তাঁকে তুলে দেন বিমানে। ব্রডস্কিকে নিয়ে ওই আকাশযান উড়ে যায় মধ্য ইউরোপের অস্ট্রিয়ার দিকে। ভিয়েনা বিমানবন্দরে প্রথমে মিলিত হন কারুল প্রফারের সঙ্গে। তিনিই ব্যবস্থা করেন অডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। সে এক ঐতিকহাসিক মিলন। বৃদ্ধ অডেন সোৎসাহে এগিয়ে দেন সাহায্যের হাত। ওঁরই ব্যবস্থাপনায় ব্রডস্কি যোগ দেন লন্ডনের আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে। তারপর চলে আসেন আমেরিকায়।

যুক্তরাষ্ট্রে এসে ব্রডস্কি বেছে নেন শিক্ষকতার কাজ। ১৯৭৭ সাল থেকে উনি মার্কিন নাগরিক। শিক্ষকতা, কবিতা লেখা এবং অনুবাদের কাজ—এই নিয়েই থাকেন সর্বক্ষণ। ১৯৮৮ সালে যোসেফ ব্রডস্কিকে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর অব লেটার্স" সম্মানে ভূষিত করা হয়; ১৯৭৯ সালে "আমেরিকান আকাদেমি অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স"-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ব্রডস্কির কবিতার ইংরেজি অনুবাদের নির্বাচিত সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। এটিই ওঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এরপর ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় "আ পার্ট অব স্পীচ"। ব্রডস্কির সমালোচনা-সংকলনের নাম "লেস দ্যান ওয়ান"। ১৯৮৬ সালের 'U. S. Book Critic Award'-এ সম্মানিত এই সংকলন সম্পর্কে সমালোচকরা বলেন, 'Joseph Brodsky's essays and reviews,...collected in "Less than One" (1984), are valuable in their own right ; brilliant, arrogant, and idiosyncratic ; they establish Brodsky as one of the finest poet-essayists of the 20th century.'

১৯৮৭ যোসেফ ব্রডস্কির জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। 'নোবেল পুরস্কার' নামক জাদুর স্পর্শে এই নির্বাসিত রুশ কবি প্রায় উত্তার মতো চলে এলেন আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের সামনে।

*

নোবেল পুরস্কার সংক্রান্ত বিতর্ক এবং জীবনচর্চার সংক্ষিপ্ত রূপরেখার পৃষ্ঠা সরিয়ে এবার অনিবার্যভাবেই আমাদের চোখ ফেরাতে হবে যোসেফ ব্রডস্কির কবিতার দিকে। ব্রডস্কি কী-রকম কবি? কোথায় লুকিয়ে আছে ওঁর শব্দ, ছন্দ এবং কল্পনার রহস্য?—এ প্রশ্নের সামনে না দাঁড়ালে, পরিশোধিত দৃষ্টি এবং অনুভূতি নিয়ে ওঁর কবিতাকে বিশ্লেষণ না করলে, নিঃসন্দেহে ব্রডস্কির প্রতি অবিচার করা হবে। ষোল থেকে সাতচল্লিশ বছর—মোটামুটি এই একত্রিশ বছর ধরে কবিতা লিখছেন ব্রডস্কি। এই দীর্ঘ সময়ের সাহিত্যকীর্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই, সংগত কারণেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে ব্রডস্কির চিন্তা এবং মননের মূল প্রবাহের মধ্যে। অনেকেই মনে করেন ব্রডস্কির জীবনের সেরা সময় গেছে ওঁর উনিশ বছর বয়সে। এ সম্পর্কে কবির ব্যক্তিগত অভিমত যথেষ্ট সরস—'I don't think I am a Rimbaud.'

ব্রডস্কি হয়তো সত্যি-সত্যিই র‍্যাঁবো নন। কিন্তু ওঁর গভীরতা, ওঁর বিশ্ববীক্ষা, সর্বোপরি ওঁর কবিতার রূপ, রস, গন্ধ এবং আকুতি আমাদের মুগ্ধ করে। "স্বাতন্ত্র্য" শব্দটি ব্রডস্কির কবিতা সম্পর্কে প্রয়োগ করার আগে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। পুশকিন থেকে ম্যানদেলস্তাম বা আখমাতোভা, অডেন থেকে এলিয়ট অথবা ইয়েট্স্, গ্যেটে থেকে টমাস মান—বহু-বহু পূর্বসূরির কণ্ঠস্বরকেই আমরা স্পন্দিত হতে দেখি ব্রডস্কির কবিতায়; কিন্তু সর্বত্রই কী অসাধারণ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রিত হয় সেই স্পন্দন, সেই অন্তর্লীন অতীত। আর ঠিক এই কারণেই যোসেফ ব্রডস্কি এক একক কণ্ঠস্বর। বিশ শতকের রুশ কবিতা সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনাই ওঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুইডিশ আকাদেমি ব্রডস্কির কবিতায় স্থান এবং কালের এক মহান ব্যাপ্তিতে অভিভূত হয়েছেন। নিজের লেখালেখি সম্পর্কে স্বয়ং ব্রডস্কিও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। 'কবিতা লিখতে বসে এই রুশ কবির কল্পনার প্রায় সবটাই জুড়ে থাকে "নেচার অব টাইম"। সুদীর্ঘ কবি-জীবনে বারবার আঙ্গিক বদলেছেন ব্রডস্কি; বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ভাবে পূর্বসূরিদের রচনা থেকে প্রেরণা পেয়েছেন লিখবার; কিন্তু সবসময়, প্রায় সবরকম পরিস্থিতিতেই অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে স্থান আর কালের প্রতি অসীম আগ্রহ। কেন ব্রডস্কি কবিতা লেখেন—এ প্রশ্নের উত্তরে উনি বলছেন, 'to show man the true scale of what is happening.' ব্রডস্কির কবিতার এই 'স্কেল'কে অনুধাবন করতেই ভুল করেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রশাসকরা। এ ব্যাপারে একজন সমালোচক যোগ্যই ভুল করেন নি—'The "scale" for Brodsky is never political but always personal, a poet which made him politically suspect in the Soviet Union.'

মহাকালের গ্রন্থি থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অমোঘ অনুরণনকে নিংড়ে বের করে আনেন ব্রডস্কি। বহমান সময়ের যন্ত্রণা, তার যাবতীয় আর্তি, উচ্ছ্বাস অথবা উন্মাদনাকে অনুভূতির চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে দেবার এক অদম্য তাড়না নিয়েই উনি ডুব দেন অতীতমন্থনে। 'A Halt in the Wilderness' কবিতায় এক ধর্মান্ধ গীর্জার পতনোন্মুখ, ক্ষয়িষ্ণু সত্তার মাঝেই ব্রডস্কি শুনতে পান আধুনিকতার নির্মম গুঞ্জন। ওঁর বহু কবিতাতে স্থানিক পরিধির মাঝেই বিন্যস্ত হয়েছে 'সময়'-এর স্বরূপ ও প্রকৃতি। 'ক্ষেত্র' এখানে কালেরই মাত্রা—তার অভিব্যক্তির আকর। 'A winter evening in Yalta', 'December in Florence, 'Autumn to Novenskaia' প্রভৃতি কবিতা ব্রডস্কির এই দার্শনিক প্রয়াসেরই উদাহরণ।

অধিকাংশ কবিতাতেই ব্রডস্কিকে আমরা দর্শক বা শ্রোতার ভূমিকায় পাই; খুব কমই উনি নিজেকে লক্ষ্য-বস্তুর সঙ্গে একাকার করে নেন। নিজের যাবতীয় সত্তাকে ঘিরে থাকা পরিমণ্ডল সম্পর্কে ব্রডস্কির প্রতিক্রিয়ায় অবশ্যই কিছুটা বিষণ্ণতার ছাপ আছে। ১৯৬২ সালে লেখা 'The Fire is Dying Down' নামক বাইশ লাইনের কবিতায় তরুণ ব্রডস্কিকে আমরা দেখি এক অসাধারণ দুঃসাহস সৃষ্টি করে স্থান আর কালের বাস্তব এবং অতীন্দ্রিয় অস্তিত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে। নিঃসন্দেহে এ এক অনুপম প্রয়াস।

ব্রডস্কির কবিসত্তার গভীরে প্রোথিত আছে যান্ত্রিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে নির্মম বিরূপতা।

এই কারণেই ওঁর কিছু কবিতায় প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ক্ষোভ এবং ব্যঙ্গের স্বর। মনে পড়ছে "Homage to Yalta"-র কয়েকটি পংক্তি—

'What troubles people in the atom age is—much less than things themselves—the way they are constructed. Like a child who clobbers dolly, then wails on finding the debris inside, we tend to take what lies in back of this or that event as nothing less than that event itself. To which there is a kind of fascination, in as much as things like motives, attitudes, environment, et cetra—all this is life. And life we have been trained to treat as if it were the object of our logical deductions.'

প্রায় একই চরিত্রের আর-একটি বিখ্যাত কবিতা "Monument"। এখানে ব্রডস্কির লেখনী কিছুটা তির্যক এবং ব্যঙ্গাত্মক। কবিতার শুরুতে ব্রডস্ক লিখছেন, 'Let's build a monument / at the end of a long city street'। আর অন্তিম পংক্তিতে এসে আমরা পাই একটি অসাধারণ স্তাটায়ার—'Let's build a monument to lies'। এই কবিতায় স্বার্থহীন ভাষায় এবং অপূর্ব ছন্দ ও শ্লেষের সমাহারে ব্রডস্কি আঙুল তোলেন একটি ভ্রান্ত সমাজকাঠামোর দিকে, যেখানে জীবন-চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো মিনার তৈরির মধ্যেও লুকিয়ে আছে ভণ্ডামির কুটিল উপস্থিতি।

শৈশব, কৈশোর, বাল্য অথবা যৌবন—সবসময়ই ব্রডস্কির অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে সন্দেহ আর বিদ্বেষের বিষাক্ত নিশ্বাস। মুক্তির স্বাদ তাই ওঁর কাছে এক স্বর্গীয় সম্পদ। ক্লান্ত, বেদনাদগ্ধ ব্রডস্কি 'The End of a Beautiful Era' কবিতায় লেখেন—'Only fish in the sea seem to know freedom's price'। আরও পরে

নির্বাসিত কবির বুকভরা হাহাকার চিরে বেরিয়ে আসে 'A Part of Speech'-এর মতো কবিতা যার অন্তিম স্তবকে এসে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। ব্যক্তিগত ও মানসিক আকাঙ্ক্ষার পর্দা সরিয়ে ব্রডস্কি আমাদের নিয়ে আসেন মুক্তির চিরন্তন বেলাভূমিতে। উনি লেখেন—

'Freedom / is when you forget the spelling of the tyrant's name / and your mouth's saliva is sweeter than Persian Pie, / and though your brain is wrung light as the / horn of a ram/ nothing drops from your pale-blue eye.

ব্রডস্কির মানস লোকের অবিচ্ছেদ্য সহচর ওঁর নিঃসঙ্গতা। ষাটের দশকের গোড়াতেই আত্মমাতোভা ব্রডস্কির কবিতায় তীব্র একাকিত্বের সুর আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুত আজও সে সুর অব্যাহত। মতাদর্শের কুটিল অভিঘাত, এবং চারপাশের অশান্ত জীবনপ্রণালীর রাহুগ্রাসে আচ্ছন্ন বিবেক ও চেতনা ব্রডস্কিকে ক্লান্ত করে, আর সেই কারণেই উনি মুখ ফিরিয়ে নেন চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার দিকে। বন্দী-শিবিরের নির্জন একাকিত্বও তাই ব্রডস্কিকে অধিত করে তোলে—

"Being itself the essence of all things, / solitude teaches essentials, how gratefully the skin / receives the leathery coolness of its chair."

ব্রডস্কির কাব্যদর্শন কোনো বিশেষ ভাবাদর্শের প্রতি অভিসারী নয়। ওঁর মতে, 'একজন কবির চোখে ধর্মতত্ত্ব বা মতাদর্শ কখনোই লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল নয়। বরং তত্ত্ব বা মতাদর্শের ওই বিন্দু থেকেই এক ভিন্নতর পথে, শুরু হয় তাঁর মেটাফিজিকাল যাত্রা।' কবিতা ব্রডস্কির কাছে যতটা না শিল্প, তার চেয়েও বেশি বিজ্ঞান। শব্দ, ছন্দ এবং অক্ষরমালা নিয়ে আবহমান কাল ধরে মানুষ চালিয়ে যাচ্ছে এক নিরবিচ্ছিন্ন অভিযান। কবিতা এই অভিযানেরই সর্বোৎকৃষ্ট ফসল। ভাষা, শব্দ এবং ছন্দ এই নিয়েই গড়ে উঠেছে ব্রডস্কির জগৎ। কবিতা লেখা ওঁর ক্ষেত্রে কোনো অমূর্ত চেতনার বৈধিক অভিব্যক্তি নয়; এ যেন জীবনধারণের প্রধানতম শর্ত। পুশকিন-পরবর্তী রাশিয়ান কাব্যজগতে এই সফলতম 'ইউরোপীয়' কবি তাই নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, 'Poetry is not an art or a branch of art, it's something more... poetry, which is the supreme linguistic operation, is our anthropological, indeed genetic goal.'

'কবিতা' সম্পর্কে ব্রডস্কির অভিমত একান্তভাবেই ওঁর নিজস্ব—তা নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন, অন্তত এই নিবন্ধের, নেই। বরং অন্যত্র চোখ ফেরানো যাক। স্থান ও কালের প্রতি ব্রডস্কির অশেষ আগ্রহ, ওঁর নিঃসঙ্গতা, ক্ষোভ অথবা উদাসীনতা—এসবই উল্লেখ করেছি। এবার অবগাহন করা যাক এই রুশ কবির কাব্যবিবেকের গভীরতম প্রদেশে। যোসেফ ব্রডস্কির কবিসত্তায় যে দুটি আপাত-বিরোধী কাব্যিক ঐতিহ্য এক অতুলনীয় সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। একদিকে রাশিয়ান কবিতার গদ্যপদী ঐতিহ্যের রহস্যময়তা, আর অন্যদিকে ইউরোপীয় মননের বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং বেদনানিক্ত আনন্দের আত্মিক উচ্ছ্বাস—এ দুয়ের সুষম বুননেই সৃষ্টি হয়েছে ব্রডস্কির কাব্যবিবেকের প্রতিটি কোষ।

এই অবস্থায় ব্রডস্কির কবিতার অন্তর্নিহিত রসকে যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে রাশিয়ান কাব্যজগতের বিবর্তন ও ক্রমিক উত্তরণকে; সেই-সঙ্গে অনুভব করতে হবে ইউরোপীয় মেটাফিজিকাল কবিদের নিগূঢ় 'বিভক্তবোধ'কে। সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকার সময় চারপাশের অতিমাত্রিক বাস্তবতাও ব্রডস্কির বহুবিধ অনুভূতির পারস্পরিক বিক্রিয়াকে স্তব্ধ করতে পারে নি। পিটার্সবুর্গ শহরের 'কোলাহল-মুখরিত প্রাঙ্গণ' এই বিক্রিয়ার সাবলীল গতিকে বারবার বিঘ্নিত করেছে। অকথ্য শারীরিক পীড়নের গ্লানিকেও উপেক্ষা করে নির্জন নির্বাসনের দিনগুলিকেই তাই শ্রেয় বলে মনে করেন ব্রডস্কি। যোসেফের নির্জনতাপ্রেম অথবা নিঃসঙ্গতা আসলে ওঁর চেতনা আর অনুভূতির ঐক্যেরই এক অপরিহার্য শর্ত। ওসিপ ম্যানদেলস্তাম বর্ণিত 'Judes christian culture' ব্রডস্কির ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য জানি না। কিন্তু এই প্রখ্যাত রুশ কবির অন্য একটি উক্তি আমাদের উৎসাহিত করে;—অন্তত ব্রডস্কির কাব্যালোকের আলোচনায় বসে। বহু সমালোচকই ১৯৮৭-র নোবেলজয়ীর কবিতায় নস্টাল-জিয়ার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। এই মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ নিয়ে কোন বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, নির্বাসিত ইহুদি কবি যোসেফ ব্রডস্কির কবিতায় যদি নস্টাল্‌জিয়ার ক্ষীণতম প্রকাশও লক্ষিত হয়, তবে সেই নস্টাল্‌জিয়া, সেই বেদনাবোধ, সেই সর্বাঙ্গক আকুতি ম্যানদেলস্তামের "নস্টালজিয়া ফর ওয়ারল্ড কালচার"-এরই সমগোত্রীয়।

সময় ও সমকালের চিত্রকলা

সলিল ভট্টাচার্যের একক চিত্রপ্রদর্শনী। কলকাতা তথাকেন্দ্র। ১৭-২৩ নভেম্বর ১৯৮৭।

শুভাপ্রসন্নর একক চিত্রপ্রদর্শনী। বিড়লা অকাদেমী। ১-৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭

জলরঙে দক্ষ চিত্রশিল্পী সলিল ভট্টাচার্য গত বিশ বছর ধরে একই থীমে ঘোরা-ফেরা করছেন। তাঁর ছবির কেন্দ্রে আকুল-আবিল পৃথিবীর রূপরেখা—এক ভয়ানক আকৃতি সব-সময় আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরে রাগে তাঁর ছবিকে। ফলে তাঁর সব ছবিরই নাম দেওয়া যায়: "আঁধার এ বসুধা"। সলিল ভট্টাচার্যের ছবি অনেকটাই থীম-প্রধান হওয়ায় থীমকে মুখ্য করে আলোচনা করা ঠিক হবে না; তাঁর ছবির কাঠামোই বড়ো। সমগ্র, সমকাল, ইতিহাস, মিথ, কাল্‌ট, আরকিটাইপ, এমনকি কোনো-কোনো চিত্রে টুকরো-টুকরো কাহিনী ছবির অঙ্গীভূত হলেও তাঁর ছবির বিশিষ্টতা উপস্থাপনায়। রেখার মোচড়ে, রঙের তাৎপর্যময় অভিব্যক্তিতে আর মানসিক দক্ষতায় তিনি আশ্চর্যভাবে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে যান। ছবিতে একাধিক ইমেজ ব্যবহার করেও ছবির কেন্দ্র থেকে সরে যান না, দর্শককে বিষয়-বিস্তৃতির ঘোরা-টোপে ফেলে নাজেহাল না করে ছড়িয়ে-থাকা নানা ইমেজ, প্রতীকের মাধ্যমে ক্রমশ ছবির ভেতর ঘরে টেনে আনেন।

বর্তমান প্রদর্শনীর ৩০টি জলরঙ ছোটো-মাঝারি ছবিতে সলিল কোথাও হালকা রঙ ব্যবহার করেন নি, রঙের ওপর রঙ চড়ান নি। প্রকৃতির অনুকরণ না করেও তাঁর রঙ-ব্যবহার অনেকটাই প্রকৃতির অনুকারী। গাঢ় কালো রঙ বীভৎসতা, নিবিড় তমসার যেমন ইঙ্গিত দেয়, তেমনি লাল রঙ ভয়ংকর, বিপ্লব, কিংবা অভ্যুত্থানের; সবুজকেও খানিকটা সরলতা—সজীবতার প্রতীক হিসেবেই নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও রঙ-রেখাকে মুঠোর মধ্যে এনে খেলোয়াড়ি আখরে ফুটিয়ে তোলেন মিষ্টি সুর। ফলে তাঁর ছবি ভয়ংকর সুন্দরের প্রতি-রূপ। 'শহীদ', 'স্ট্রাগল ফর এগজিস-টেন্‌স্', 'ইন দ্য ডার্‌কনেস', 'সুইসাইড', 'ফ্রাস্‌ট্রেশন', 'ড্যান্‌স অব ডেথ' প্রভৃতি ছবিতে কালো, লাল রঙ সাবেকি তাৎপর্যে ব্যবহার হলেও আলাদা চরিত্র নিয়েই তাদের স্থিতি। রঙের চেরা-চেরা পারস্পরিক সম্পর্ক শহীদত্বকে মহান কিংবা বর্তমানের

চিত্রকলা

পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত করে দেয়, 'স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্‌স্'-এ কালো-রঙ এমনই মুচড়ে ব্যবহার করেন যেখানে স্ট্রাগলের তাৎপর্যটি খুবই ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। সংগ্রামরত মানুষগুলির দেহের মোড়ক আর ঘন কালো-লাল রঙের বিপর্যস্ত ব্যবহার গোটা ছবিটিকে করে তুলেছে মারমুখী, জেদি। সলিলের ছবির কম্পোজিশন আর বিষয় এতই পরস্পর-নির্ভরশীল যে কোনোটিকে আলাদা করা যাবে না।

সলিল ভট্টাচার্যের বোধ পরিণতিতে স্থিত। সময়ের অবক্ষয়, জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ বারে বারেই এসেছে। অন্ধকারের পাশাপাশি অস্তিত্ব-সন্ধান আর মুক্তি-প্রয়াসও তাঁর ছবিতে স্পষ্ট। 'স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্‌স্' ছবিটিকে এই প্রদর্শনীর চরিত্রনির্ণায়ক ছবি বলে ধরা যেতে পারে। ১, ৬, ৭, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৯ সংখ্যক ছবিগুলি একটি সম্মিলিত অস্তিত্বের সংগ্রামের শ্লোগান তোলে। তীব্র অস্তিত্ববোধ, বিক্ষোভের পাশাপাশি ভারতীয় ধর্মবোধ, লোকায়ত জীবন-চেতনা সলিল ভট্টাচার্যকে পোক্ত জমি দিয়েছে। ভাঙাচোরা মানুষের আদলে লোকায়ত জীবন আঁকতে-আঁকতে এনে যায় চাপা বিক্ষোভ, বিক্ষোভ কখনো রূপ নেয় বিদ্রূপে। 'দি ডেজার্টেড সোল', (৭) 'দি সেন্ট' (৮) ছবিদুটিতে শিল্পী ধর্মীয় বোধের নবতর ব্যাখ্যা করেন। ৭ নং-এ ভয়ংকর কালো পটভূমিতে প্রার্থনারত তিনটি মুখ, ৮ নং-এ যিশুর ক্রশবিদ্ধ রূপের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মবোধের মিশ্রণে এক অদ্ভুত বিপর্যস্ত পারিপাট্য। 'ট্র্যাপ'-এ অস্তিত্বের প্রতীকী রূপ পাখি-ধরায়, অথচ পাখি-ধরাই মূল নয়, জৈবিক আর জীবনধারণের সামগ্রিক ভ্রষ্টতা-সন্ধান আঁকেন লাল-কালো-নীলের বর্ণময় অথচ কাটাছেঁড়া কমপোজিশনে। একেবারে নিতান্ত সাধারণ ছবিও উপস্থাপনাগুণে বিশিষ্টতা পায়: 'বেগার কি', ছবির কাঠামো এক আবছা ভাঙা থিলানের উপর রাজা, রাজার মাথায় ছাতা, ছাতার নীচে লতাপাতা দিয়ে পাগড়ি-মতোন এক ভাঙাচোরা গ্রামীণ মুখ। থিলান যেমন নাগরিক জটিলতার ইঙ্গিত দেয়, তেমনি, লতাপাতাঢাকা ভাঙাচোরা মুখটি খানিক গ্রাম্য সরলতাকেও ইঙ্গিত করে। নাগরিকতা আর গ্রাম্য সরলতা বা সবলতা ছবিটিকে এক আশ্চর্য সামর্থ্য দিয়েছে, এই ছবিটি ক্রমেই বিষয়-দেউলে ছবির জগতে একটি উদাহরণ। 'ফুট-বেয়ার' ছবির

মধ্যেও এই-জাতীয় স্বাবলবনের প্রাচুর্য। তিনি যে সময়ের ভ্রান্তিকেও খুব ভালো করে চেনেন, 'ছইসাইড' (১৭নং) ছবিটিতে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এই প্রদর্শনীর সব ছবিই বিমূর্ত। সলিলবাবু মূর্ত ছবিতে দক্ষ বলেই বিমূর্ত ছবিতে তাঁর দখল অবিসংবাদিত। বর্তমান চিত্রচর্চায় থীমের চেয়ে কাঠামোই বড়ো; সলিলবাবুও কাঠামোকে প্রাধান্য দিলেও থীমকে সমান গুরুত্ব দেন। সলিলবাবুর মাসটার মশাই আদিনাথ লাহিড়ীর নির্দেশ 'মানুষকে ভালোবাসো—মানুষকে যত গভীরভাবে ভালোবাসবে তত তোমার চিত্রকর হিসেবে উৎকর্ষ হবে' কখনই পরিত্যাগ করেন নি। শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, সমকালচেতনা, প্রজ্ঞা আর সর্বোপরি চিত্রমাধ্যমের উপর শিল্পীর পারদর্শিতার পরিচয় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আরএকবার উপস্থাপিত হল।

'এভস্,' 'ব্ল্যাক অ্যানড হোয়াইট', এবং ৯খানা বড়ো মাপের তৈলচিত্র আর চারখানা ছাপাই ছবি নিয়ে মোট ৪০খানা ছবির প্রদর্শনী করলেন শুভাপ্রসন্ন। বর্ণব্যবহার, মুখের অভিব্যক্তি, কমপোজিশন—সব মিলিয়ে প্রদর্শনীটি মনোহারী। চারকোল ও অ্যাক্রিলিনে আঁকা 'এভ্স' পর্যায়ে ডানাহীন পাখিগুলির নানা ভঙ্গিমায় বসে থাকা, আধ-বোজা-চোখের নিখুঁত অভিব্যক্তি খুবই সুন্দর। 'ব্ল্যাক অ্যানড হোয়াইট' পর্যায়েও নিত্যদিনের দেখা মানুষের নানা ভঙ্গি আর ভাবনার প্রকাশ। 'এভস' এবং 'ব্ল্যাক অ্যানড হোয়াইট' পর্যায়ের ছবিগুলি একই বিষয়ের দুভাবে সন্ধান। মুখের অভিব্যক্তি, আঙুলের মোচড়, হাত-পা বাহু—সব মিলিয়ে নিত্যদিনের দেখা জীবনকে ঘন টেকসচারে এঁকেছেন—ক্রমে কালো থেকে ঈষৎ লাল টেকসচারে চলে এসেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মুখেরও ভাব বদলাচ্ছে: এই ছবিগুলিতে শুভাপ্রসন্নর ঘনিষ্ঠ অন্বেষণ এবং তীব্র দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে।

প্রদর্শনীর উল্লেখ্য ছবি তেলরঙ ক্যানভাসগুলি। স্বচ্ছ তেলরঙের ওপর অস্বচ্ছ তেলরঙ ব্যবহার করায় ছবিগুলি হয়েছে খুবই উজ্জ্বল। 'মেটামরফসিস' (১, ২) ছবি দুটি প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য ছবি। 'রাইডার' ছবিতে ঘোড়ার- পিঠে-চড়া পরাজিত এক মুণ্ডহীন ধড়ের চুপাশে ভাসতে-থাকা লাল কাপড়ের প্রতীকে পরাজিত মানুষটির অভিব্যক্তি উঠে আসে। ঘোড়ার রঙটি অপূর্ব, জলজলে। মুণ্ডহীন ধড়ের উপর হালকা সবুজের ছোপ এনে ফসিলের আদল দিয়েছেন, ঘোড়াটি জীবন্ত জলজলে করে আঁকলেও তার ওপর হালকা সবুজের ছোপ দেওয়ায় ফসিলের ভাব এসেছে। বেঁচে থাকা অথচ ফসিল এই অতীত-বার্তমানিকতা অপর দুটি ছবি (মেটামরফসিস (১, ২)-এর মধ্যে স্পষ্ট। নীল আর খয়েরি রঙের অনিঃশেষ ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত আকাশের নীচে আশ্চর্য সুন্দর শ্যাওলাধরা পাথরের আদলে জমাটবাঁধা সঙ্গমরত মানব-মানবী, যেন পাথর কুঁদে বের করা হয়েছে তাদের। বর্ণব্যবহারে অনেকটাই বস্তুর অনুকরণ করলেও কল্পনার ঈষৎ ছোঁয়ায় সুন্দর ব্যঞ্জনা এসেছে। 'ল্যানডস্কেপ' (১২নং) চিত্রটিতে মানুষের আদলে গাছ এঁকেছেন। নামটি তুলে দিলে এই ছবিটিকেও 'ফ্লোটিং' (৩, ৪, ৫) পর্যায়ের ছবি হিসেবে নেওয়া যায়। ঝরে-পড়া জ্যোৎস্না কালো, ছাই আর হালকা-ধূসর, ঈষৎ সাদা বর্ণ দিয়ে আঁকা এই ছবিটি অপূর্ব। শুভাপ্রসন্নর নানা ছবিতে বারবার সবুজ মাঠ, দিগন্তবিস্তৃত গোধূলির আকাশ, রক্তের রঙে ইতস্তত ছড়ানো নুড়িপাথরের পটভূমি এসেছে।

শুভাপ্রসন্নর ছবি কোথাও স্বপ্ন দিয়ে রিয়েলকে ধরা, কোথাও রিয়েল দিয়ে স্বপ্নকে ধরা। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মুণ্ড, গোধূলির লাল আকাশ, ঝরে-পড়া জ্যোৎস্না, সবুজ মাঠ আর রক্তের রঙে রাঙা নুড়িপাথরের পটভূমিতে মুণ্ডহীন ধড়গুলি যেন আনন্দে চিৎকার করছে।

তৈলচিত্রের বিশাল ক্যানভাসে বার-বার দিগন্তবিস্তৃত অপার আকাশের তলায় উড়ন্ত, না হয় উড়তে-চাওয়া মুণ্ডহীন ধড়গুলির পাশে এভস্ পর্যায়ের ডানাহীন পাখিগুলির আকাশহীনতা একটি আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। শুভাপ্রসন্ন পাশাপাশি দুই বিপরীত অবস্থাকে রেখে এই সময়কে বিদ্রূপ করেছেন। যাদের আকাশ হাতের মুঠোয় সেই পাখিরা ডানাহীন, ফলে বিবর্ণ, কোথাও ভীত, ঘন টেকসচারে বন্দী; আর মুণ্ডহীন ধড়গুলি—যাদের জীবনের অস্তিত্বকেই শিল্পী (মুণ্ডহীনতায়) অস্বীকার করছেন—তারাই আকাশজয়ের আহ্লাদে মুখর! পাখিও মানুষের উপর এই-জাতীয় বিপরীত স্বভাব আরোপ করে শুভাপ্রসন্ন বর্তমান সময়ের অসারত্বকে প্রকাশ করেছেন। তবু বিষয়তাই এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত সুর। কিছুটা পরাবাস্তববাদ আর প্রতিচ্ছায়াবাদের সঙ্গে বাস্তববাদ মিলিয়ে প্রদর্শনীটির সমস্ত ছবিগুলি খুবই উঁচু মানের।

শেষে আর-একটি কথা—এই উজ্জ্বল প্রদর্শনীতে চারটি অনুজ্জ্বল গ্রাফিকস ছবির উপস্থাপনা বড়োই বেমানান ঠেকেছে। গ্রাফিকসেও শুভাপ্রসন্নর কাছে উজ্জ্বলতা প্রত্যাশিত ছিল।

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

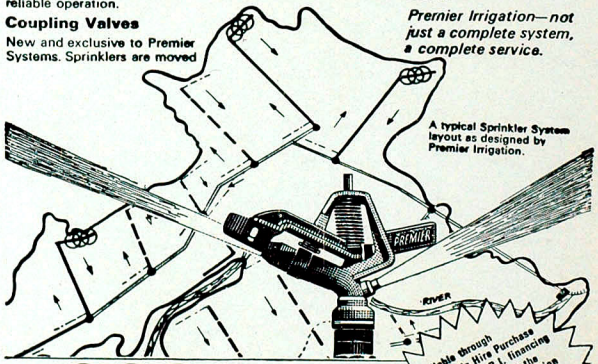

A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities in addition to the normal annual I.T. depreciation & deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PI PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel: 45-7455/7626/5302